University of Rajshahi **Rajshahi-6205** **Bangladesh.**

RUCL Institutional Repository **http://rulrepository.ru.ac.bd**

Department of Islamic History & Culture MPhil Thesis

2020-03

Intellectual Activties in Spain and Egypt under the Muslim Rule, 711-1517 A.D.

Khatun, Nadira

University of Rajshahi

http://rulrepository.ru.ac.bd/handle/123456789/1023

Copyright to the University of Rajshahi. All rights reserved. Downloaded from RUCL Institutional Repository.

মুসলিম শাসনামলে স্পেন ও মিসরে বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকান্ড, ৭১১-১৫১৭ খ্রি.

(Intellectual Activties in Spain and Egypt under the Muslim Rule, 711-1517 A.D.)

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

নাদিরা খাতুন
এম.ফিল গবেষক
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৫-১৬
রোল নং: ৬১২৪০৫৫০৪
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মো. শামসুজ্জোহা এছামী
প্রফেসর
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী, বাংলাদেশ

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

মুসলিম শাসনামলে স্পেন ও মিসরে বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকান্ড, ৭১১-১৫১৭ খ্রি.

(Intellectual Activties in Spain and Egypt under the Muslim Rule, 711-1517 A.D.)

এম.ফিল অভিসন্দর্ভ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

নাদিরা খাতুন

এম.ফিল গবেষক

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

মার্চ, ২০২০

Dr. Md. Shamsuzzoha Esami
Professor
Dept. of Islamic History & Culture
Phone: Office: 0721-750041-711144
Res: 0721-750512
Mob: 01716-143032

ড. মো: শামসুজ্জোহা এছামী
প্রফেসর
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
ফোন: অফিস: ০৭২১-৭১১১৪৪
বাসা: ০৭২১-৭৫০৫১২
মোবা: ০১৭১৬-১৪৩০৩২

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করছি যে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের নাদিরা খাতুন কর্তৃক এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য দাখিলকৃত *মুসলিম শাসনামলে স্পেন ও মিসরে বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকান্ড, ৭১১-১৫১৭ খ্রি. (Intellectual Activties in Spain and Egypt under the Muslim Rule, 711-1517 A.D.)* শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে। এটি কোন যুগ্ম গবেষণাকর্ম নয়, বরং এটি গবেষকের স্বকীয় কৃতিত্বে একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানা মতে, এ শিরোনামে কোন অভিসন্দর্ভ ইতোপূর্বে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রীর উদ্দেশ্য জমা দেয়া হয়নি।

আমি অভিসন্দর্ভটির চূড়ান্ত পান্ডুলিপির আদ্যপান্ত গভীরভাবে পাঠ করেছি এবং এর মৌলিকত্ব বিচার করে এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য এ বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল করার অনুমতি প্রদান করছি।

ড. মো. শামসুজ্জোহা এছামী
প্রফেসর
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ঘোষণা পত্র

এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, *মুসলিম শাসনামলে স্পেন ও মিসরে মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকান্ড, ৭১১-১৫১৭ খ্রি. (Intellectual Activties in Spain and Egypt under the Muslim Rule, 711-1517 A.D.)* শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি এম.ফিল.ডিগ্রীর জন্য লিখিত হয়েছে। এ গবেষণার বিষয়বস্তু পূর্ণ অথবা আংশিক আমি কোথাও প্রকাশ করিনি। এটি কোন যুগ্ম কর্ম নয়; বরং আমার একক মৌলিক গবেষণা কর্ম।

(নাদিরা খাতুন)
এম.ফিল. গবেষক
ব্যাচ-জুলাই ২০১৫
রোল নং: ৬১২৪০৫৫০৪
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী, বাংলাদেশ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পরম করুণাময় মহান আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন পূর্বক তাঁর রাসূলের (সা.) প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করছি। এরপর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি আমার এ গবেষণা অভিসন্দর্ভের সম্মানিত তত্ত্বাবধায়ক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রফেসর ড. মো. শামসুজ্জোহা এছামী, যার সার্বক্ষণিক নির্দেশনা ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় *মুসিলম শাসনামলে স্পেন ও মিসরে মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকান্ড, ৭১১-১৫১৭ খ্রি. (Intellectual Activties in Spain and Egypt under the Muslim Rule, 711-1517 A.D.)* শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনার কাজ সুসম্পন্ন করতে পেরেছি।

আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রফেসর ইমেরিটাস ড. এ.কে.এম ইয়াকুব আলী স্যার কে ও একই বিভাগের আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক প্রফেসর এ.বি.এম শাহজাহান স্যারকে। তাঁরা উভয়ই ব্যক্তিগত ভাবে আমার অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করা পর্যন্ত সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিমার্জনের পরামর্শ দিয়ে এটিকে মান সম্মত করে তুলতে সহায়তা প্রদান করেছেন। আমি বিশেষভাবে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রফেসর ড. মোঃ আজিজুল হক ও ড. সৈয়দা নূরে কাছেদা খাতুনকে যাঁরা ক্ষেত্র বিশেষে সমস্যার সমাধানে তাঁদের সুচিন্তিত অভিমত দিয়ে আমাকে উপকৃত করেছেন। সে জন্য আমি তাঁদের নিকট ঋণী।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডীন ও ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সভাপতি প্রফেসর ড. মো. ফজলুল হক এর প্রতি যিনি আমার গবেষণাকর্মের সমাপ্তকরণে উৎসাহ প্রদান এবং অগ্রগতির খোঁজ খবর নিয়ে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন।

আমার গবেষণাকর্মে বিভাগীয় সকল শিক্ষকের উৎসাহ প্রদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। যেসব শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আমার গবেষণাকর্ম সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহযোগিতা দান করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রফেসর এম.এ. বারী, প্রফেসর এ.বি.এম. শাহজাহান, প্রফেসর ড. কাজী মো. মোস্তাফিজুর রহমান, প্রফেসর ড. এম. ফায়েকউজ্জামান, প্রফেসর ড. মুন্সী মুঞ্জুরুল হক, প্রফেসর ড. দিলশাদ আরা বুলু, প্রফেসর ড. মো. ইমতিয়াজ আহমেদ, ড. শাহনাজ সুলতানা সোনিয়া, ড. যাহার-ই-তাশনীম এর নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁদের সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

এ অভিসন্দর্ভ দ্রুত সম্পাদনের জন্য যাদের প্রেরণা আমাকে উৎসাহিত করেছে তাঁদের মধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ড. মো. আব্দুল হামিদ, প্রফেসর ড. মো. শহীদুল্লাহ ,দর্শন বিভাগের প্রফেসর ড. মো. একরাম হোসেন এর নাম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয়।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সেমিনারে দায়িত্বরত মোসা. তাহেরা খাতুন, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সেমিনার সহযোগী মো. আবুল হোসেন এর প্রতি যারা তাদের সঠিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে যথা সময়ে আমাকে উপাত্ত সংগ্রহে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন। তাছাড়া রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, আই.বি.এস. লাইব্রেরী, রাজশাহী বিভাগীয় পাবলিক লাইব্রেরী, রাজশাহী বরেন্দ্র গবেষণা যাদুঘর লাইব্রেরী, রাজশাহী ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী, বাংলা একাডেমী লাইব্রেরী, ঢাকা এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরী সহ যে সকল প্রতিষ্ঠান থেকে আমি এ গবেষণা কর্মের উপাত্ত সংগ্রহ করেছি সে সকল প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীদের আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছি।

যে সমস্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, বন্ধু-বান্ধব ও শুভাকাঙ্ক্ষী নানাবিধ প্রতিকূলতার মাঝে এ গবেষণাকর্ম প্রণয়নে অসম সাহস যুগিয়েছেন তাদের সকলকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন পূর্বক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি শাকিক কম্পিউটার এবং ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহকারী রেজিস্টার মো. ছাইফুল ইসলাম প্রতি যাদের কঠোর পরিশ্রমে অভিসন্দর্ভের কম্পোজ ও মুদ্রণবিন্যাসের মান বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমি বিশেষভাবে স্মরণ করছি আমার শ্রদ্ধেয় বড় আপা মোছা. চামেলী খাতুন ও বড় দুলাভাই মো. দুলাল হোসেন, লুৎফুন্নেছা, শাশুড়ি মা ছমিরণ, ছোট ভাই রাসেল আহমেদ এবং ছোট বোন সাবিনা খাতুনকে যাঁরা এ গবেষণাকর্ম সম্পাদনে প্রতিনিয়ত আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন। পরিশেষে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা মো. লোকমান আলী ও মাতা মমেনা বিবিকে মূলত তাঁদের অনুপ্ররণায় আমি এ গবেষণাকর্ম শুরু করি। আমার স্বামী হাছানুর রহমান আমার চলার প্রত্যেকটি পদক্ষেপে এবং এ গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করতে আমাকে যেভাবে অনুপ্রাণিত ও সহায়তা দান করেছেন তা সত্যিই প্রশংসাযোগ্য। উপরন্তু আমার পরিবারের প্রতিটি সদস্যের দু'আ ও আন্তরিকতা আমার চলার পাথেয় হয়ে আছে।

আল্লাহ আমার এ শ্রম ও সাধনা সাফল্যের আনন্দে ভরিয়ে দিন এ আশাবাদ ব্যক্ত করে এখানে শেষ করছি।

নাদিরা খাতুন

সূচিপত্র

প্রত্যয়ন পত্র i

ঘোষণা পত্র ii

কৃতজ্ঞতা স্বীকার iii

সূচিপত্র v

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা ১

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে তথাকার জনগোষ্ঠী ও জীবনধারা ১০

তৃতীয় অধ্যায়

স্পেনে মুসলিম সভ্যতার উন্মেষে আমীরদের ভূমিকা ১৬

চতুর্থ অধ্যায়

বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাহিত্য কর্মের গবেষণা ও চর্চায় মধ্যযুগের স্পেনের মুসলমানগণ ৪০

পঞ্চম অধ্যায়

কর্ডোভা গ্রন্থাগার ও মুসলিম ঐতিহ্য ১৫২

ষষ্ঠ অধ্যায়

ফাতেমীয় আমলে মিসরে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের অগ্রগতি ১৬৮

সপ্তম অধ্যায়

আয়্যুবিয়দের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা ১৮৭

অষ্টম অধ্যায়

মামলুকদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সৃজনশীল কর্মকান্ড ১৯৫

নবম অধ্যায়

উপসংহার ২১০

গ্রন্থপঞ্জি ২১৩

প্রথম অধ্যায়
ভূমিকা

মধ্যযুগীয় ইউরোপের বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাসে স্পেন একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করে।[১] মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সৃজনশীল সাহিত্যকর্মের ঐশ্বর্যমণ্ডিত কেন্দ্র ছিল মুসলিম স্পেন। একথা বলা যায় যে, আট শতক থেকে পনের শতক পর্যন্ত (৭১১ খ্রিস্টাব্দ-১৪৯২ খ্রিস্টাব্দ) আরবিভাষী লোকেরাই পৃথিবীব্যাপী সংস্কৃতি ও সভ্যতার মশালবাহী ছিল (Bearers of torch of culture and civilization)।[২]

তমসাচ্ছন্ন ইউরোপে স্পেনই ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষাদীক্ষা, শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির আলোকবর্তিকা। দীর্ঘ সাতশত বছর ধরে স্পেন মুসলিম শাসনাধীনে ছিল। বুদ্ধিবৃত্তিক বিজ্ঞান, সুকুমার শিল্প ও সাহিত্যের অগ্রগতিতে মুসলিম শাসকদের অবদান অপরিসীম। তাঁরা পর্যবেক্ষণের এমন সকল নতুন পদ্ধতি প্রবর্তন করেন যা ইউরোপের উন্নততর বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির পথ সুগম করেছিল। মধ্যযুগে স্পেনের মুসলিম মনীষীগণ বুদ্ধিবৃত্তিক ও সৃজনশীল যে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তা পাশ্চাত্যকে জ্ঞান গরিমায় উদ্ভাসিত করে তুলেছিল। ইউরোপে পরবর্তীতে রেনেসাঁর সূত্রপাত করতে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

মুসলিম স্পেন যখন জ্ঞান বিজ্ঞান, শিল্প-সভ্যতা ও সংস্কৃতি চর্চায় নিয়োজিত তখন ইউরোপ সীমাহীন অজ্ঞতা ও বর্বরতায় নিমগ্ন। J.W. Draper বলেছেন, "ইউরোপীয়রা তখন বর্বর বন্য অবস্থা ছাড়িয়ে উঠেনি বলা চলে। তাদের দেহ অপরিচ্ছন্ন, হৃদয় তিমিরাচ্ছন্ন ছিল। হীন ধর্ম তত্ত্ব মর্যাদাশূন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষী পাদ্রীরা ক্ষমতার জন্য বিবাদে মত্ত ছিল। অধিবাসীরা পর্ণ কুটিরে বাস করত। মেঝে নল খাগড়ায় ঢেকে দেওয়ালে খড়ের মাদুর টাঙ্গিয়ে রাখতে পারলেই ঐশ্বর্যের চিহ্ন বলে বিবেচিত হত। সিম, কালাই, বৃক্ষমূল এমনকি ছাল খেয়ে অতি কষ্টে তারা জীবন ধারণ করত। অপরিষ্কৃত বা বড়জোর পরিষ্কৃত চামড়া দিয়ে তারা পোশাক তৈরি করত। এর উপর একখানা গো-যান থাকলেই রাজার আড়ম্বর পর্যাপ্ত পরিমাণে ও সন্তোষজনক রূপে প্রকাশ পেত। অন্তত দু'জোড়া গরুতে এই গাড়ি টানত। দ্রুতগামী ভূমিদাসেরা খড়ের আঁটিতে পা জড়িয়ে আঙ্গুল লাগিয়ে তাদের গতি বৃদ্ধি করত। সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের মিথ্যা দেহাবশেষে অলৌকিক ক্ষমতা সম্বন্ধে সর্বপ্রকার কাল্পনিক গল্পে লোকদের প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল।"[৩]

ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণের মতে, মধ্যযুগীয় ইউরোপের বর্বরতা, পশ্চাদপদতা, বুদ্ধিবৃত্তির স্থবিরতা এমনভাবে গ্রাস করেছিল যে, তা বর্ণনাতীত। মুসলিম স্পেনে ইসলাম প্রচার ও মুসলিম সভ্যতার বিকাশের প্রাক্কালে সমগ্র ইউরোপে শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞান চর্চার যে করুণ অবস্থা ছিল তা উল্লেখ করে

---

১ P.K. Hitti, *History of the Arabs* (London: Macmillan and Co. Ltd., 1970), P. 557.
২ *Ibid*, P. 557.
৩ John William Draper, *Intellectual Development in Europe*, Vol. II (London: G. Bell and Son, 1910), P. 25-30.

জনৈক ঐতিহাসিক বলেন, "তদানীন্তন অসভ্যতা ও মূর্খতার লীলাক্ষেত্র ইউরোপ তখন বিভিন্ন মতাবলম্বীগণের মতবিরোধ নিয়েই পরস্পর মারামারি-কাটাকাটি করে মরছিল। সাহিত্যাদি ও গণিত শাস্ত্রের সমাদর তো দূরের কথা জ্ঞান-চর্চা মাত্র তৎকালে রাজদ্রোহিতামূলক ইন্দ্রজাল বলে পরিগণিত হত। এমনকি জ্ঞান অন্বেষণে রত লোকদেরকে গুরুতর অপরাধে অপরাধী বলে গণ্য করা হত। প্রাচীন গ্রিক রাজাগণ কর্তৃক সংস্থাপিত পাঠাগারগুলো ভস্মীভূত ও বিলুপ্ত হবার সাথে সাথে শিক্ষা ও জ্ঞানের নির্মল জ্যোতি ইউরোপ থেকে সম্পর্ণূভাবে তিরোহিত হয়েছিল।"[৪]

তৎকালীন সময়ে ইউরোপে জ্ঞানের প্রচন্ড দুর্ভিক্ষ চলছিল। "তৎকালে বহু শতক পর্যন্ত ইউরোপে অধ্যয়নের উপযুক্ত কোন গ্রন্থাদি রচিত হয়নি। শাসক শক্তির দুর্বিষহ নির্যাতন ও অত্যাচার হতভাগ্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর প্রয়োগ করা হত। পৃথিবীর গোলত্বে কেউ আস্থা স্থাপন করলে তাকে ভীষণ অপরাধে অপরাধী বলে কঠিন শাস্তি দেওয়া হত। যে জ্ঞান পিপাসা মেটাতে গিয়ে আলেকজান্দ্রিয়ার ধর্মযাজকদের হাতে মহামতি হাইপেশিয়ার (Hypatia) পবিত্র দেহ শত সহস্র খণ্ডে বিখণ্ডিত হয়েছিল। অনুরূপ জ্ঞান পিপাসার অপরাধে অপরাধী গ্যালিলিওকেও রোমের ধর্ম যাজকদের আদেশে নিগৃহীত ও কারাবরণ করতে হয়েছিল। প্রচলিত মতবাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার অভিনব মতামত প্রকাশিত করলেই তার ধন, মান ও জীবন নিরাপদ থাকত না। ফলে ইউরোপে বহু শতক ব্যাপী প্রতিভাশালী আইনজ্ঞ, সূক্ষ্মদর্শী দার্শনিক ও সুচারুসম্পন্ন কবির আবির্ভাব হয়নি।"[৫]

প্রাচীন আরবের তমসাচ্ছন্ন যুগের মত মধ্যযুগীয় ইউরোপে যে অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ বিরাজ করত তার চিত্র অত্যন্ত ভয়াবহ। জনৈক খ্রিস্টান ঐতিহাসিক নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে বলেছেন, "স্বনামধন্য পোপ গ্রেগরী দি গ্রেট রোমক রাজ্য থেকে যাবতীয় পণ্ডিতদেরকে নির্বাসিত করেছিলেন। মহামতি অগাস্টাস সীজারের চেষ্টার ফলে যে দার্শনিক পুস্তকাগার স্থাপিত হয়েছিল তিনি সেই সুবিশাল লাইব্রেরীর দাহক্রিয়া মহাসমারোহে সুসম্পন্ন করে 'মূর্খতাই ধর্ম নিষ্টার প্রসূতি'- এরূপ প্রবাদ তৎকালে প্রচলিত করেন। তার কুশাসনে সমগ্র রাজ্য প্রাচীন গ্রিক ও রোমকে গ্রন্থাদি পাঠ সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। তৎকালীন ধর্মান্ধ খ্রিস্টানগণ দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্যাদি ললিত শাস্ত্রের উপর তীব্র অভিসম্পাত করে পুণ্য সঞ্চয়ের প্রচেষ্টা করতেন।"[৬] প্রখ্যাত দার্শনিক ও ঐতিহাসিক লেকি বলেন, "স্বাধীন চিন্তার অগ্রদূত মুসলিমগণই আট শতকে ইউরোপীয় শিক্ষার রুদ্ধ-দ্বার উন্মোচন করেন এবং তথায় ক্রমে ক্রমে উচ্চ শিক্ষার পথও সুগম করেন। প্রকৃত পক্ষে মুসলিমদের স্পেন অধিকারের পূর্বে জ্ঞান বিজ্ঞান নির্জীব অবস্থায় ও শঙ্কিতভাবে সমগ্র ইউরোপ থেকে বিদায় নিয়েছিল। ধর্ম যাজকদের মধ্যে সামান্য যেটুকু জ্ঞান চর্চার প্রচলন ছিল তাও

---

[৪] মুজাফফর আলী, *বিশ্ব সভ্যতায় মুসলিমদের দান* (ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ১৯৫৫), পৃ. ৩।

[৫] J.W. Draper, *Op. cit.*, P. 26-27.

[৬] মুজাফফর আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫।

আবার কেবলমাত্র কুসংস্কার বৃদ্ধির মানসে ব্যবহৃত হত। এভাবে মধ্যযুগে জ্ঞান চর্চার প্রথা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হলে অজ্ঞানতার গহীন অন্ধকারে সকল ইউরোপ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।"[৭]

স্পেনে যখন মূর সভ্যতার বিকাশ ঘটে তৎপূর্বে গ্রেট-ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি ও স্পেন কুসংস্কার, জ্ঞানার্জনে বিমুখতা ও নানাবিধ অনাচার দ্বারা বিপর্যস্ত ছিল। সে সময় অসভ্য ব্রিটেনে দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। মুজাফফর আলীর ভাষায়, "অসভ্য স্টক ও পিকট এবং লুণ্ঠন প্রিয় দিনেমারগণ ইংল্যান্ডে নানা প্রকার অশান্তির ভয়াবহ বিভীষিকা সৃষ্টি করত। তৎকালীন ব্রিটেনের অধিবাসীবৃন্দ ধর্মে কোনোরূপ বিশ্বাস রাখত না। উপাসনার নিমিত্তে কোনো গির্জা ছিলনা। তাদের ধারণা ছিল যে নিবিড় অরণ্যের মধ্যেই বিশ্বনিয়ন্তা অবস্থান করেন। তাদের অধিকাংশ লোক চাষী ও মৎসজীবী ছিল। মূর্খতা তখন পূর্ণমাত্রায় সর্বত্র বিরাজিত, জ্ঞানচর্চা তখনও ব্রিটেনবাসীদের নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল। রোমকগণের ব্রিটেন অধিকারের পর থেকেই সেখানে শিক্ষার সূচনা হয়।"[৮]

অনুরূপভাবে ফ্রান্স, জার্মানি ও স্পেনে সভ্যতার আলো প্রবেশ করতে পারেনি। স্পেনে পাঁচশত বছর ধরে পাশ্চাত্য খ্রিস্টান জগতের ধর্মনৈতিক শিক্ষার ভার ধর্মযাজক শ্রেণির উপর ন্যাস্ত ছিল। সেখানে পোপদের প্রভাবে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা ব্যাহত হয়। মধ্যযুগে বিশেষ করে আট শতকে সমগ্র ইউরোপ যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল, তখন আইবেরীয় উপদ্বীপে জ্ঞানের শিখা প্রজ্জ্বলিত হয়। সেদিক থেকে বিচার করলে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, মুসলমানদের স্পেন বিজয় ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূর প্রসারী। কৃষি শিল্প ও মানবিক উন্নতির ক্ষেত্রে আরবগণ তখন সমগ্র জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, মধ্যযুগীয় ইউরোপের স্পেনে যে সভ্যতার উন্মেষ হয় তা অপরাপর দেশের তুলনায় উন্নতমানের ছিল।

এস. লেনপুল বলেন, "মুসলিম স্পেনে শিল্পকলা, সাহিত্য ও বিজ্ঞান যেরূপ উৎকর্ষ লাভ করেছিল এরূপ ইউরোপের অন্য কোথাও তা পরিলক্ষিত হয়নি। শিক্ষার্থীগণ ফ্রান্স, জার্মানি, ইংল্যান্ড থেকে দলে দলে স্পেনের শহরগুলোতে ভিড় জমাত বিদ্যাশিক্ষার জন্য। আন্দালুসিয়ার চিকিৎসকগণ বিজ্ঞান সাধনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এমনকি মহিলাদের উচ্চ শিক্ষার জন্য অনুপ্রাণিত করা হত এবং কর্ডোভাতে অধিবাসীদের মধ্যে মহিলা চিকিৎসকের অভাব ছিলনা। একমাত্র স্পেনেই অঙ্ক শাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, ইতিহাস, দর্শন ও আইনশাস্ত্র বিষয়ে শিক্ষা দান করা হত। সংক্ষেপে বলতে গেলে যা দ্বারা সাম্রাজ্য মহান ও সর্বাঙ্গীন উন্নত হয় এবং যা দ্বারা পরিমার্জিত রুচি ও সভ্যতার পথ সুগম হত তা সমস্তই মুসলিম স্পেনে পাওয়া যেত। বহু শতক

[৭] Lecky William Edward Hartpole, *History of European Morals* (New York: D. Appleton and Co., 1955), উদ্ধৃত, মুজাফফর আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫-৬।

[৮] মুজাফফর আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬-৭।

ধরে স্পেন শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে চর্চা ও সাধনার জন্য সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র ছিল। সেজন্য ইউরোপের অন্যকোনো দেশ মূরদের জ্ঞান পিপাসার চারণ ভূমির সমতুল্য হতে পারেনি।"[৯] ("Muslim Art, Literature and science prospered as they then prospered nowhere else in Europe, students flocked from france, Germany, England to drink from the fountain of learning which flowed only in the cities of Moors. The Surgeons and Doctors Andalusia were in the van of sciences. Women were encouraged to devote themselves to serious study and lady doctor was not unknown among the people of cordova. Mathematics, Astronomy, Botany, History, Philosphy and Juris prudence was to mustered in spain and spain alone. In short, what so ever makes a kingdom great, prosperous what so ever tend to refinement and civilization, was found in Muslim spain for centuries spain had been the centre of civilization the seat of arts, science of learning and every form of refined enlightenment. No other country in Europe had so far approached the cultivated dominion of the Moors.")

ইউরোপে মুসলিম স্পেন বা মূরদের প্রভাব যে কি প্রচন্ড মাত্রায় অনুভূত হত; তার উল্লেখ করেন খ্রিস্টান ঐতিহাসিক। তৎকালে বহু শতক পর্যন্ত খ্রিস্টান ইউরোপে অধ্যয়নের উপযুক্ত কোনোরূপ সাহিত্য ছিল না। বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীদের উৎপীড়ন করা হত। অন্যদিকে তৃতীয় আব্দুর রহমান এবং দ্বিতীয় হাকামের শাসনামলে স্পেন ছিল জ্ঞানের আলোক বর্তিকা স্বরূপ।

ইউরোপে মানসিক বন্ধ্যাত্বের যুগে পাশ্চাত্যের রাজন্যবর্গের মধ্যে একমাত্র স্পেন ও সিসিলিতে মূর ভূপতিরাই দর্শন ও শিল্প বিজ্ঞানে পবিত্র আলো প্রজ্জ্বলিত রাখেন। কৃষি, শিল্প ও মানসিক উন্নতিতে আরবরা তখন সমগ্র জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ মূর শাসনামলে জ্ঞান সাধনা এমন এক পর্যায়ে পৌছায় যে তা প্রবাদ স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। মানসিক উৎকর্ষ ও বুদ্ধিবৃত্তির চরম বিকাশ ঘটলে এরূপ মন্তব্য করা হত যে স্পেনে দু' শ্রেণির মানুষ বসবাস করত (ক) ধনবান, (খ) বৈজ্ঞানিক বা বুদ্ধিজীবী।

আমিনুল ইসলাম বলেন, "ইউরোপে বিজ্ঞানের উদ্ভবের মূলে আরবদের বিশেষ অবদান রয়েছে। অজানাকে জানার এক নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা পর্যবেক্ষণের এমন সব নতুন পদ্ধতি প্রবর্তন করলেন যে সঠিকভাবে, সুনির্দিষ্টতা ও শৃঙ্খলা লক্ষণীয় তা কেবল অব্যাহত গবেষণা ও ধীরস্থির অনুসন্ধানের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব। আরবরা বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি প্রশংসনীয়ভাবে আয়ত্ব করেছিলেন এবং সে যুগের বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় অমূল্য অবদান রেখেছিলেন।"[১০]

---

[৯] Stanely Lanepoole, *The Moors in Spain* (London: United Limited, 1912), P.230.

[১০] আমিনুল ইসলাম, *মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯১), পৃ. ৭০।

স্পেনের উমাইয়া খলিফাদের ন্যায় মিসরের ফাতেমীয় খলিফাগণ (৯০৯ খ্রিস্টাব্দ-১১৭১ খ্রিস্টাব্দ) জ্ঞান বিজ্ঞানে ব্যাপক অবদান না রাখলেও এ যুগেও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছিল। শুধু খলিফা নয়, বরং উজিরগণও সংস্কৃতিমনা ছিলেন। ফাতেমীয় শাসনামলেও সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে স্কুল, কলেজ, পাঠাগার, বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। খলিফা আল আজীজ আজহার মসজিদকে আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে রুপান্তর করেন। উজির ইয়াকুব বিন কিল্লিস একটি উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এ যুগে চিকিৎসাবিদ্যা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানচর্চা, ঔষধ প্রস্তুত-করণবিদ্যা, কাব্যচর্চা, স্তুতিগাঁথা, পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি তৈরি, জ্যোতির্বিদ্যা, আলোকবিদ্যা, স্থাপত্যবিদ্যা, ইতিহাস, শিল্পকলা, সাহিত্যচর্চা প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানচর্চা হত এবং শিক্ষা দেওয়া হত।

ফাতেমীয় আমলেই চরমপন্থী শিয়া মতবাদ শিক্ষা ও প্রচারের জন্য খলিফা আল হাকিম ১০০৫ খ্রিস্টাব্দে 'দার আল হিকমা' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যার অপর নাম 'জ্ঞানবিজ্ঞানের গৃহ'। ফাতেমীয় আমলে এটি ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানে ইসলাম সংক্রান্ত বিষয় ছাড়াও জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসা শাস্ত্র পড়ানো হত।

খলিফা আল হাকিম জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন, তিনি একটি মানমন্দির নির্মাণ করেছিলেন। মিসরের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ আলী ইবনে ইউনুস এবং পদার্থবিদ ও চক্ষুচিকিৎসার ছাত্র আবু আলী আল হাসান ইবনে আল হাইসাম । ইবনে ইউনুস গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান জানার জন্য একটি ছক তৈরি করেছিলেন। ইবনে হাইসাম গণিত শাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, দর্শন এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের উপর শতাধিক পুস্তক রচনা করেন। চক্ষুচিকিৎসা সংক্রান্ত গ্রন্থ *কিতাব আল মানাযির* ছিল তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা। ফাতেমীয় আমলে রাজপ্রাসাদের পাঠাগার ছিল যাতে দুই লক্ষ পুস্তক ছিল। ১০৬৮ খ্রিস্টাব্দে লুটতরাজের সময় এই পাঠাগার তছনছ করে দেওয়া হয় এবং মূল্যবান গ্রন্থাদি উটের পিঠে করে নিয়ে যাওয়া হয়। যখন সালাহ্উদ্দিন আয়্যুবিয় রাজপ্রাসাদ দখল করেন তখনও লক্ষাধিক পুস্তক ছিল এ পাঠাগারে। ফাতেমীয় খলিফাগণ শিল্পকলা ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রাখেন। স্থাপত্যের অন্যতম নির্দশন হল আজহার মসজিদ যা আজও বিদ্যমান রয়েছে। এছাড়া ইসলামের ইতিহাসে বই বাধাইকরণের নমুনা সর্বপ্রথম মিসরে দেখা যায়।

আয়্যুবিয়দের শাসনামলে (১১৭১ খ্রিস্টাব্দ-১২৫০ খ্রিস্টাব্দ) বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছিল। বিশেষ করে নুর আল দীন ও সালাহ্উদ্দিন আয়্যুবিয়-এর সময়। দামেস্কের প্রাচীন ইলম-হাদিস শিক্ষাকেন্দ্র এ সময় প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময় সিরিয়ায় বহু মাদ্রাসা গড়ে উঠে। নুর আল দীন তাঁর নামানুসারে দামেস্কে হাসপাতাল তৈরি করেন। পরে এটি চিকিৎসাবিজ্ঞান গবেষণাগারে পরিণত হয় । সালাহ্উদ্দিনের সময় দামেস্ক বিদ্যালয় নগরী হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠে। আলেপ্পোর স্থাপত্য আয়্যুবিয়দের

হাতে জন্ম। সালাহ্উদ্দিন জেরুজালেম ও মিসরে মাদ্রাসার মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করেন। কায়রোর আল সালাহিয়্যাহ প্রতিষ্ঠান তাঁর নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ সময় জলচক্রের ব্যবহার শুরু হয়। জলপথ পরিবহণের জন্য যে দিকনির্ণয় যন্ত্র ব্যবহার হত তা খুব সম্ভবত এগার শতকেই প্রথম ব্যবহার শুরু হয় মুসলমানদের মধ্যে। এ সময় ধর্মযুদ্ধের কারণে ইসলামি সংস্কৃতির বন্ধ্যা অধ্যায় শুরু হয়েছিল।

মামলুক শাসনামলে (১২৫০ খ্রিস্টাব্দ-১৫১৭ খ্রিস্টাব্দ) জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চায় শিল্পকলা, সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নতি সাধিত হয়। আট শতক থেকে বুদ্ধিবৃত্তিকচর্চায় আরব বিশ্বে যে আধিপত্য বিরাজমান ছিল তের শতকের শুরুতে তা স্তিমিত হলেও নি:সন্দেহে বলা যায় তের শতকের মধ্যভাগ হতে আরবগণ জ্যোতিষশাস্ত্র, অঙ্কশাস্ত্র, ত্রিকোণমিতি, চিকিৎসাশাস্ত্র বিশেষ করে চক্ষুচিকিৎসার ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রাখেন। সিরীয়-মিসরীয় মামলুক রাজ্যে চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতির ইঙ্গিত পাওয়া যায় সুলতান কালাউনের প্রখ্যাত হাসপাতাল দেখে। চক্ষু চিকিৎসায় আরবরা সুদক্ষ হলেও মামলুক আমল থেকে তা বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে চালু হয়। মামলুক আমলে প্রধান অবদান ছিল জীবনীগ্রন্থ রচনা। ইবনে খাল্লিকানের রচিত জীবনীগ্রন্থ হল *ওয়াফায়াত আল আয়আন ওয়া আনবা আবনা আল যামান* যা ছিল সর্বকালের সেরা জীবনীগ্রন্থ। আরব মুলুকের গল্পগাঁথা বিশ্বের কাছে সুখপাঠ যার সূচনা হয়েছিল মামলুক আমলে। যেমন আন্তারা ও বের্বাসের প্রেমকাহিনী । তের শতকের শেষভাগে আরবি সাহিত্যে ছায়ানাট্যের আর্বিভাব হয়। এ সময় স্থাপত্যশিল্প ও চারুকলার অসাধারণ উন্মেষ ঘটেছিল।

গভীরভাবে পর্যালোচনা করার পূর্বে বিষয়ের সাথে পরিচিতি করার লক্ষ্যে অভিসন্দর্ভে উপস্থাপিত অধ্যায় সমূহের উপর একটি সমীক্ষা পেশ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। ভূমিকা ও উপসংহার সহ অভিসন্দর্ভটি নয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত।

প্রথম অধ্যায়ে **ভূমিকা**। এতে আরব মুসলমান কর্তৃক পাশ্চাত্য দেশ স্পেন বিজয়, স্পেনের বুকে ইসলামের আলো প্রজ্জ্বলিত পূর্বক জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা এবং তথায় মুসলিম শিল্প সাহিত্যের চর্চা ও প্রসার সম্পর্কে এবং মুসলিম মনীষীগণ পাশ্চাত্যকে যেভাবে জ্ঞান গরিমায় উদ্ভাসিত করে তুলেছিল; যা পরবর্তীতে ইউরোপীয় রেনেসাঁর সূত্রপাত ঘটাতে সহায়তা করেছিল তা আলোচিত হয়েছে। স্পেনের মুসলমানদের মিসরের ফাতেমীয়, আয়্যুবিয় ও মামলুক শাসনামলে তথায় মুসলিম শাসকদের জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চায় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান ও মনীষীদের জ্ঞান বিজ্ঞান, সুকুমার শিল্প সাহিত্য ও বৌদ্ধিক কর্মকাণ্ডে অবদান ও প্রসার আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও এ বিষয়ের উপর রচিত প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ পর্যালোচনা, গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষণার যৌক্তিকতা, তথ্যের অভিসর্ন্দভে উপস্থাপিত অধ্যায় সমূহের সার সংক্ষেপ আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে **মুসলমানদের স্পেন বিজয়ের প্রাক্কালে তথাকার জীবনধারা** শীর্ষক শিরোনাম। মুসলমানদের স্পেন বিজয়ের প্রাক্কালে তথাকার জীবনধারা তথা সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা ও ধর্মীয় ব্যবস্থা ছিল সংকটাপন্ন। সে সময় স্পেন ছিল গথিক রাজার দুঃশাসনের শিকার। আর তথায় রাজনৈতিক অরাজকতা বিরাজমান ছিল। অর্থনৈতিক বৈষম্য ও ধর্মীয় বিভেদ চরম আকার ধারণ করেছিল। শিক্ষা ব্যবস্থা বলতে তারা কুসংস্কারের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। স্পেনের শাসকগোষ্ঠী জনসাধারণের উপর শাসনের নামে সীমাহীন অত্যাচার ও নির্যাতন চালাত এবং ধর্মের নামে অধর্ম নীতি চাপিয়ে দিত। জনসাধারণ এসব নিপীড়ণ থেকে মুক্তি পাওয়ার অপেক্ষায় ছিল। এসব সূত্র ধরেই স্পেনে মুসলমানদের আগমন ঘটে। উপর্যুক্ত বিষয়গুলো দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে **স্পেনে মুসলিম সভ্যতার উন্মেষে আমীরদের ভূমিকা** নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। **৭১১** সালে আরব মুসলিম কর্তৃক স্পেন বিজয়ের পর তথায় পর্যায়ক্রমে বিদ্যোৎসাহী আমীরদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাহিত্যকর্মের গবেষণা ও চর্চায় তমসাচ্ছন্ন ইউরোপের বুকে স্পেন জ্ঞানের মশাল বাহক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং তিলোত্তমা নগরীতে পরিণত হয় কর্ডোভা। আমীর প্রথম আব্দুর রহমানের শাসনামলে জ্ঞানী-গুণীদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানপূর্বক তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ড এবং তিনি কর্ডোভা নগরীতে জ্ঞান বিজ্ঞানের যে সূত্রপাত করেন তা আমীর **১**ম হিশাম, ২য় আব্দুর রহমান, ৩য় আব্দুর রহমান এবং ২য় হাকামের শাসনামলে জ্ঞান বিজ্ঞানের শাখা প্রশাখা পুষ্প পত্রে কলেবরে বৃদ্ধি পেয়ে কর্ডোভা সমগ্র ইউরোপে একমাত্র নির্ভরযোগ্য বিদ্যানিকেতনে পরিণত হয় এবং যেভাবে সর্বাপেক্ষা সুসমৃদ্ধ ও জ্ঞান বিজ্ঞান, শিল্পকলায় সর্বোন্নত নগরীর মর্যাদা লাভ করে তা আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে **বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাহিত্যকর্মের গবেষণা ও চর্চায় স্পেনের মুসলমানগণ** শীর্ষক শিরোনামে স্পেনের শুধুমাত্র মুসলিম শাসকবর্গ নয়, বরং মুসলিম পণ্ডিতগণও বুদ্ধিবৃত্তিক সাহিত্যিক কর্মকাণ্ডের গবেষণা ও চর্চায় যে প্রভূত অবদান রেখেছেন তা বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। যেমনঃ স্পেনীয় মুসলমানগণ ধর্মতত্ত্ব বিস্তারে আগ্রহী হওয়ায় কুরআনের বিশুদ্ধ পঠন, তাফসীর ও গ্রন্থ রচনায় এবং হাদিস শাস্ত্রের অধ্যয়ন, গবেষণা ও গ্রন্থ রচনায় লিপ্ত হওয়া। ধর্মীয় ব্যাখ্যা প্রদানে ফকিহ্‌দের ভূমিকা। ভাষা ও সাহিত্যে স্পেনের মুসলিম মনীষীদের অবদান। কাব্যচর্চা, মুওয়াশশাহ্‌, দর্শনশাস্ত্র, ইতিহাসচর্চা, ভূগোলশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, উদ্ভিদবিদ্যা, রসায়নচর্চা প্রভৃতি প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে স্পেনে বসবাসরত মুসলিম মনীষীদের যে গবেষণা ও কর্মকাণ্ড তা আলোচিত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে **কর্ডোভা গ্রন্থাগার ও মুসলিম ঐতিহ্য** বিষয়ে আলোচনা উপস্থাপিত হবে। এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হল স্পেন বিজয়ের সূচনালগ্ন থেকেই সেখানে লাইব্রেরী গড়ে উঠে এবং মুসলিম দেশগুলো থেকে জ্ঞানপিপাসুরা স্পেনে এসে বসতি স্থাপন করে। মুসলিম শাসকবর্গ বই আমদানিতে উৎসাহিত করে

এবং সেগুলো সংগ্রহের জন্যই লাইব্রেরী স্থাপিত হয়। প্রথম এবং বিশ্ব বিখ্যাত লাইব্রেরী ছিল কর্ডোভা লাইব্রেরী যা রাজকীয় লাইব্রেরী নামে সমধিক পরিচিত ছিল। এই লাইব্রেরীর গ্রন্থপঞ্জী সংগ্রহ সম্পর্কে, গ্রন্থের তালিকা, গ্রন্থ সংখ্যা, কি ধরনের গ্রন্থ থাকত তা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মুসলিম শাসকদের অনবদ্য সাহায্য সহযোগিতায় তৎকালীন অন্ধকারময় ইউরোপে যেভাবে জ্ঞানের আলো ছড়াচ্ছিল কর্ডোভার লাইব্রেরীগুলো তা আলোচিত হয়েছে। শাসকবর্গের সহযোগিতা ছাড়াও শিক্ষিত ও অভিজাত ব্যক্তিবর্গও স্পেনে লাইব্রেরী গড়ে তুলেছিল সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে **ফাতেমীয় আমলে মিসরে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের অগ্রগতি** শীর্ষক শিরোনামে ফাতেমীয় শাসনামলে মিসরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়। এ সময় মিসরের বিখ্যাত আজহার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এছাড়া বিভিন্ন স্কুল, মাদ্রাসা, লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ফাতেমীয় আমলে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দার আল হিকমা। এর অপর নাম ছিল বিজ্ঞান ভবন। চিকিৎসা বিজ্ঞানে অবদান ছিল প্রভূত। এছাড়া গণিতশাস্ত্র, দর্শন, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানচর্চা, সাহিত্যচর্চা, ইতিহাসচর্চা প্রভৃতি জ্ঞানের প্রতিটি শাখায় ফাতেমীয় আমলে মনীষীদের বৌদ্ধিক কর্মকাণ্ড ছিল অতুলনীয়। এছাড়া মানমন্দির ও লাইব্রেরীও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল এসময়। উপর্যুক্ত বিষয়গুলো এ অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে **আয়্যুবিয়দের বুদ্ধিবৃত্তিকচর্চা** সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে আয়্যুবিয় শাসনামলে জ্ঞান বিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন: সিরিয়া কেন্দ্রিক উমাইয়া যুগের পর আয়্যুবিয় আমল ছিল মুসলিম ইতিহাসের স্বর্ণোজ্জ্বল যুগ। সে সময়কার শিক্ষা বিস্তারের নিদর্শন আজও বিদ্যমান। চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষা কেন্দ্র, বহু মাদ্রাসা স্থাপিত হয় এ সময়। তন্মধ্যে কায়রোর আল সালাহিয়্যাহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল উল্লেখযোগ্য। এছাড়া সে সময় কায়রোতে গড়ে উঠে চিকিৎসা কেন্দ্র। বিজ্ঞান ও দর্শনেও আয়্যুবিয়দের যথেষ্ট অবদান ছিল। সাহিত্য ক্ষেত্রে তাদের প্রভাব ছিল আরো পরিব্যাপ্ত। দুর্ভাগ্যের বিষয় এ সময় শুরু হয়েছিল ধর্মযুদ্ধ; যার ফলে মুসলিম সংস্কৃতি যথেষ্ট বাধাগ্রস্থ হয়ে পড়ে।

অষ্টম অধ্যায়ে **মামলুকদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ড** সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হলো জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চায় সাহিত্য, শিল্পকলা, চিকিৎসাবিজ্ঞান, ইতিহাস জ্যোতিষশাস্ত্র, অঙ্কশাস্ত্র, ত্রিকোণমিতি, চারুকলা প্রভৃতি বিষয়ে মামলুকদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ড। এছাড়া মামলুক আমলে বিজ্ঞান সম্মতভাবে চক্ষু চিকিৎসা চালু হয়। মামলুক আমলে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চায় প্রধান অবদান ছিল জীবনীগ্রন্থ রচনা এসব বিষয়াবলি এ অধ্যায়ে বিশদভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

নবম অধ্যায়ে **উপসংহার**। মুসলিম শাসনামলে স্পেন ও মিসরে বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকান্ড, ৭১১-১৫১৭ খ্রি. শীর্ষক অভিসন্দর্ভের যে সব নতুন তথ্য বেরিয়ে আসবে তা উপস্থাপন করা হবে। নতুন তথ্যের সংযোজন ও পুরাতন তথ্যের নতুন ব্যাখ্যা প্রদান করার যে প্রয়াস পাব তার সার সংক্ষেপ এ অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে।

বিষয়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

বিক্ষিপ্তভাবে লেখালেখি থাকলেও ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এ বিষয়ের উপর কোন গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়নি। উপরন্তু প্রাথমিক ও মৌলিক উৎস হতে উপাত্ত ও উপকরণ সংগ্রহ করে এ বিষয়ে সংযুক্তি সাধিত হলে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার অনেক অজানা দিক উন্মোচিত হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ের পাঠ্যসূচিতে মুসলিম শিক্ষার ক্রমবিকাশ ও গবেষণা অর্ন্তভুক্ত। সে কারণে *মুসলিম শাসনামলে স্পেন ও মিসরে বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকান্ড, ৭১১-১৫১৭ খ্রি.* বিষয়টির উপর গভীরভাবে অনুসন্ধান করার প্রয়োজন আছে। এতে করে সাধারণ, প্রাগ্রসর ছাত্র /ছাত্রী ও গবেষকরা উপকৃত হবেন এবং জ্ঞানকোষে নতুন তথ্য সংযোজিত হবে।

গবেষণা পদ্ধতি

মৌলিক গ্রন্থাদি অধ্যয়ন ও গভীরভাবে পর্যালোচনা করে উপাত্ত ও উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে এবং সেগুলো নির্মোহ ও বস্তুনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অভিসন্দর্ভের জন্য গৃহীত হয়েছে। এক্ষেত্রে Historical Methodology বা ইতিহাস নিরীক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
মুসিলম বিজয়ের প্রাক্কালে তথাকার জনগোষ্ঠী ও জীবনধারা

মুসলমানদের স্পেন বিজয়ের পূর্বে তথাকার জনগোষ্ঠী ও জীবনধারা ছিল বর্বর প্রকৃতির। সে সময় স্পেনের সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও শিক্ষা ব্যবস্থা এক চরম ক্রান্তিলগ্নে পৌঁছেছিল। প্রাক-মুসলিম যুগে স্পেন তিন শতক (৪০৯ খ্রিস্টাব্দ-৭১১ খ্রিস্টাব্দ) ধরে গথিক রাজাদের দু:শাসনের শিকার ছিল। গথিক শাসন ছিল ধ্বংসলীলা, গণহত্যা ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নির্দয়ভাবে দমন এবং আক্রমণকারী বার্বারদের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে পরিপূর্ণ। ভিজিগথ রাজতন্ত্র ছিল রোমান ইতিহাসের ব্যর্থতার প্রতীক। উঁচু নীচুর ব্যবধান, উত্তরাধিকারী নির্বাচনে সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর প্রতি নিম্নশ্রেণির অসন্তুষ্টি, সেনাদের মধ্যে আস্থাহীনতা, অর্থনৈতিক দূরবস্থা ও ইহুদিদের দুর্ভোগের ইতিহাস ভিজিগথ শাসনের ব্যর্থতার পরিচয় প্রদান করে। এখানে শাসক ও শাসিত নামে দুটি পৃথক শ্রেণি ছিল যাদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল প্রভু-ভৃত্য। শাসিতের মধ্যে অত্যাচারমূলক ব্যবধানের ফলে উন্নতির পথ ছিল সর্বদিক থেকে রুদ্ধ। রাজন্যবর্গ, অমাত্যবর্গ, ধর্মযাজক ও সামন্তশ্রেণির ক্রমাগত শোষণের ফলে ক্রীতদাস, সার্ফ, বর্গাকার ও ইহুদিদের মধ্যে সৃষ্টি হয় কোন্দল। এ সময় ইফ্রিকিয়া যখন মুসলিম শাসনাধীনে সহিষ্ণুতা ও সুবিচারের আশীর্বাদ পুষ্ট হয়ে পার্থিব উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত হয় তখন আইবেরিয়ান উপদ্বীপ ভিজি গথ শাসনের কঠোর ও কঠিন যাতাকলে নিস্পেষিত হচ্ছিল।[১]

প্রাক-মুসলিম যুগে স্পেনের রাজনৈতিক অরাজকতা অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং ধর্মীয় বিভেদ চরম আকার ধারণ করে। Louis Bertrand তাঁর *The History of Spain* গ্রন্থে বলেছেন, তাঁদের শাসন ছিল, "Full of devastution massacres, political assassinations intesting wars among the invading barbarians".[২]

প্রাক-মুসলিম যুগে স্পেনের সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। অত্যন্ত ঘৃন্য সমাজ ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। অর্থলোভী এবং অর্ধ-খ্রিস্টান বিশপগণ স্বার্থপর ও হৃদয়হীন ভূস্বামীরা স্পেনে সাধারণ জনগণকে শোষন করত এবং তাদেরকে মানুষ বলে কোন ধরনের মর্যাদা দেওয়া হত না। শাসক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল রাজা, ধর্মযাজক ও অভিজাত শ্রেণি। আর শাসিত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত বর্গাদার, ভূমিদাস (সার্ফ), ক্রীতদাস ও ইহুদিগণ।[৩] শাসক ও জনগণের মধ্যে প্রভু-ভৃত্যের মত সম্পর্ক ব্যবস্থা

---

১ Syeed Ameer Ali, *A Short History of the Saracens* (London: Macmillan & Co. Ltd., 1961), P.106 .

২ Louis Bertrand, *The History of Spain* (London: Eyre and Spottis woode, 1956), P. 18.

৩ এস.এম. ইমামুদ্দিন, *মুসলিম স্পেনের রাজনৈতিক ইতিহাস* (ঢাকা: খান ব্রার্দাস এন্ড কোম্পানী, ১৯৯৯), পৃ. ৩০।

ছিল মৃত প্রায়, আর ধর্মযাজকদের দেওয়া হত বিশেষ ক্ষমতা। ফলে তারা ধর্মীয় অনুশাসনের নামে অধর্মনীতি জনগণের উপর চাপিয়ে দিত। এমনকি রাজাদের উপর ও বেপরোয়া ভাবে প্রভাব বিস্তার করত। শাসক নির্বাচনের কাজটিও তারা মাঝে মাঝে করত। নিষ্ঠুরতা, নির্মম অত্যাচার এবং জীবনের বিনিময়ে অনেক সময় প্রজাদেরকে অধর্ম বিধি গ্রহণ করতে হত। রাজা ও প্রধান পুরোহিতের মধ্যে সখ্যতা বিদ্যমান থাকত এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা গির্জার কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত হত।

অভিজাত শ্রেণি ছিল ক্ষমতা লোভী ও বিলাস প্রিয়। যুবরাজ, অমাত্যবর্গ, জোতদার, জমিদার ও সামন্ত রাজাদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল অভিজাত শ্রেণি। তারা সুরম্য ও সুশোভিত রাজ প্রাসাদে বাস করতেন। জাঁকজমকপূর্ণ পোষাক ও অলঙ্কারে নিজেদেরকে মোহনীয়ভাবে সুসজ্জিত করে জুয়া, মদ, শিকার, ঘোড় দৌড়, বনভোজন এবং বিলাসিতার মধ্যে নিমজ্জিত থেকে জীবনকে উপভোগ করতেন। জনসাধারণের কল্যাণের প্রতি তাদের কোন দৃষ্টি দেওয়ার অবসর ছিল না। হতভাগ্যরা সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হত। নিপীড়িত, নির্যাতিত ও অবহেলিত সর্বহারা হিসেবে চিহ্নিত ছিল কৃষক, ক্রীতদাস ও ভূমিদাস। পশুর প্রতিও মানুষের দয়া হত কিন্তু গোপনীয় সমাজে এদের জন্য এতটুকু ও অনুগ্রহ ছিল না। এদের দেখলেই যেন অত্যাচারী শাসক অত্যাচার ও আঘাত করার জন্য লাফিয়ে উঠত।

বাজারে ক্রীতদাস ক্রয় বিক্রয় করা হত। ঐতিহাসিক ডোযি বলেন, “৪০০০ থেকে ৮০০০ ক্রীতদাস এক ব্যক্তির অধীনে থাকত, ক্রীতদাসদের অবস্থা এমন করুণ ছিল যে মরে গেলে তাদের কবরেও সূর্যের আলো পড়তে দিত না।”[৪] ভূমিদাসরা ভূমি চাষ করলেও ফসল নষ্ট হলে নিজের কাছে থেকে সেই ক্ষতিপূরণ দিতে হত। শাসক শ্রেণি বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন যে এদের সহযোগিতা আর আনুগত্যের উপরেই তাদের স্থায়ীত্ব। এই উপেক্ষা আর অবহেলার জন্যই শাসক শ্রেণিকে চরম মূল্য দিতে হয়। মানবতার প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ ও বৈধ জৈবিক চাহিদার প্রতি নির্মম প্রহসন স্পেনের শোষিত, বঞ্চিত ও হতভাগ্য শ্রেণির মধ্যে এক দারুন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তারা অকথ্য জুলুম সহ্য করে অপেক্ষায় ছিল এক চরম বিপ্লবের জন্য।

প্রাক-মুসলিম স্পেনের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল বিপর্যস্ত। স্পেনের জাতীয় অর্থনীতির মেরুদন্ড ছিল ইহুদীদের ব্যবসা বাণিজ্য। কিন্তু গথিক রাজার নির্যাতন এবং ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার কারণে তারা মিল, কারখানা, দোকান পাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ করে দেশ ত্যাগ করে।[৫] যার ফলে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। শাসক ও সুবিধা ভোগকারীদের কোন কর প্রদান করতে

---

৪ R. Dozy, *Spanish Islam: A History of the Moslems in Spain* (Trans. Francis Griffin Stokes) (London: Chatto and Windless, 1919), P. 217-18.

৫ এস.এম. ইমামুদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১।

হত না। করের বোঝা মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণির মানুষের প্রতি আরোপিত হত। ফলে মারাত্মক অর্থনৈতিক বৈষম্যের সৃষ্টি হয় এবং সাধারণ মানুষের জীবনে নেমে আসে আর্থিক বিপর্যয় ও দুর্ভোগ। নির্যাতন ও নিপীড়নমূলক করভার সহ্য করতে না পেরে কৃষকগণ ভূমি ছেড়ে পালিয়ে যেত।

S. Lanepoole প্রাক-মুসলিম স্পেনের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিশদ বিবরণ দেন। তিনি বলেন, "হতভাগ্য স্পেনে ধনবান লোকেরা সর্বদা ভোগ-বিলাস ও ইন্দ্রিয় পরায়নতায় মত্ত থাকত। জুয়াখেলায়, মদ্যপানে ও নানাবিধ উত্তেজনা পূর্ণ ক্রীড়া কৌতুকে তাদের সময় অতিবাহিত হত। জনসাধারণের হয়ে তাদের মনিবের আত্ম তুষ্টির জন্য চাষাবাদে কালাতিপাত করত। ভূমির মালিক পরিবর্তন হলেও চাষীদের বংশানুক্রমে সেই ভূমি চাষ করা ভিন্ন অন্য কোনো উপায় ছিল না। মধ্যবিত্ত লোকদের অবস্থা আরও শোচনীয় ছিল। রাজ্যের যাবতীয় খরচ তাদেরকে বহন করতে হত। এমনকি ধনবান লোকদের ভোগ-বিলাসের যাবতীয় ব্যয় তাদের কাঁধে চাপিয়ে দেয়া হত।"[৬]

শিল্প ক্ষেত্রেও চরম নৈরাজ্য বিরাজ করত। ফলে মিল কারখানায় উৎপাদন ব্যাহত হত এবং সেচ কার্যের অভাবে জমি অনাবাদী পড়ে থাকত। শিল্প ও কৃষির অবনতিতে দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে পতন নেমে আসে। অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থায় ভূমিকা থাকলেও গথিক রাজারা সেদিকে ভ্রুক্ষেপও করেননি। ফলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। বৈষম্যমূলক ধনসম্পদ বন্টন, উৎপাদনে পুঁজি বিনিয়োগের অভাব, কৃষি ক্ষেত্রে অব্যবস্থা, শ্রমিক অসন্তোষ, ইহুদিদের দেশ ত্যাগ, রাস্তা-ঘাটের সংস্কারের অভাব, ব্যবসা বাণিজ্যের অনগ্রসরতা, অতিরিক্ত করারোপ প্রভৃতি কারণে প্রাক-মুসলিম যুগে স্পেনের অর্থনীতি ছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত।

প্রাক-মুসলিম যুগে স্পেনের ধর্মীয় কোন স্বাধীনতা ছিল না। প্রাক-মুসলিম স্পেনে রাষ্ট্র ধর্ম ছিল খ্রিস্টান। ধর্মীয় প্রধান ছিলেন ধর্মযাজক। ধর্মযাজকগণ জনসাধারণের রক্ষকের পরিবর্তে জনগণের পীড়নের কারণ ও পরধর্মের প্রতি চরম অসহিষ্ণু ছিলেন। তারা ধর্মের সেবায় পরধর্মকে উচ্ছেদ ও উৎখাত করা ধর্মের কাজ বলে মনে করত। বিপুল সংখ্যক ইহুদি স্পেনে বসবাস করত এবং তাদেরকে খ্রিস্টানদের রোষানলের শিকার হতে হয়। রাজা, ধর্মযাজক ও অমাত্যদের নির্মম অত্যাচারে তারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। ৬১৬ খ্রিস্টাব্দে গথিক রাজা সিসিবুত ফরমান জারি করেন। ইহুদিরা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ না করলে তাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে। ৬১২ খ্রিস্টাব্দ-৬২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ১০০০ ইহুদিকে জোর করে খ্রিস্টধর্ম গ্রহনে বাধ্য করা হয়।

---

৬ Stanely Lanepoole, *The Moors in Spain* (London: United Limited, 1912), P.39.

ইউরোপ ধর্মীয় কুসংস্কার ও ঘৃণিত পাপাচারে পূর্ণ ছিল। অনেক পোপের জন্মবৃত্তান্ত ছিল অতি লজ্জাকর। সপ্তম স্টিফেন, সপ্তম বিনিফেস, সপ্তম গ্রেগরি এবং দশম, একাদশ ও দ্বাদশ জন ভদ্র বেশ্যার সন্তান। কেউ কেউ আবার আত্মীয়া সঙ্গমে অভ্যস্ত ছিলেন। বিখ্যাত ভদ্র বেশ্যা মারোজিয়া বুদ্ধি ও সৌন্দর্য দ্বারা পঁচিশ বছরে আটজন পোপের ভাগ্যের গতি নিয়ন্ত্রিত করে। পোপদের জ্ঞান চর্চায় অনীহা ছিল প্রবল। তারা ব্যভিচারে এমনভাবে লিপ্ত থাকত যে, বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় মনোনিবেশ করতে পারতনা। প্রথম ও নবম গ্রেগরি বিখ্যাত রোমীয় সাত খানা অনুলিপি অগ্নিতে দগ্ধ করেন। মুক্ত চিন্তার কোনো অবকাশ ছিলনা।

স্বাধীন ও প্রচলিত রীতি বিরুদ্ধ ধ্যান ধারণা ও চিন্তা-ভাবনার জন্য বুদ্ধিজীবীদের অপরাধী করা হত এবং তাদের কঠোর সাজা দেওয়া হত। নিরো বা ওমিটিয়ানের নির্মম ও বর্বরোচিত অত্যাচার মানব জাতির বুদ্ধিবৃত্তির ক্রমবিকাশে প্রচন্ড বাধাস্বরূপ ছিল। পাপাচার ও ব্যভিচার এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যে বিবেক বিচার-বুদ্ধির পরিপন্থী পোপেরা ইন্দ্রিয়-চর্চায় ব্যস্ত থাকত। বিশপ তৃতীয় হেনরীর পঁয়ষট্টিটি অবৈধ সন্তান ছিল এবং সান পেলাজের মঠাধ্যাক্ষের সত্তরটি উপপত্নী ছিল।

দাসপ্রথা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যে ভার্দুনের পাদ্রীরা খ্রিস্টান সন্তানদের খোজা করে ইহুদিদের মারফৎ কর্ডোভা ও সেভিলের বাজারে বিক্রয় করত। ইতালির পাদ্রীরা সুন্দরী বালিকাদের সিসিলি ও মৌরিতানিয়ায় মূল ব্যবসায়ীদের নিকট দাস হিসেবে বিক্রি করত। যেখানে পাঁচশত বছর ধরে পাশ্চাত্য খ্রিস্টান জগতের ধর্মনৈতিক শিক্ষার ভার এই ধর্মযাজক শ্রেণির উপর ন্যস্ত ছিল সেখানে এরূপ ব্যভিচার ও ইন্দ্রিয় পরায়ণতা সত্যই আশ্চর্যের বিষয়।[৭]

পোপদের প্রভাবে ইউরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ব্যাহত হয়। ধর্মের হানি এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের আঘাতস্বরূপ মনে করে তাদের প্রভাবেই বারো শতকে মন্টপিলারের বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন ও পদার্থবিদ্যার পাঠদান নিষিদ্ধ করা হয়। জ্ঞানচর্চার প্রতি প্রচন্ড অনীহা সমগ্র ইউরোপকে এমনকি বাইজান্টাইন আমলেও গ্রাস করেছিল।

আট শতকে কনস্টান্টিনোপলে 'অষ্টভূজ' নামে এক পুস্তকালয় ও চতুষ্পদী ছিল। জেনোর সময় অগ্নিকান্ডে দগ্ধ হয়ে এক লক্ষ বিশ হাজার গ্রন্থের মধ্যে যা বাকী ছিল তা সম্রাট লিঁওর আদেশে পুড়িয়ে ফেলা হয়। বাইজান্টাইন আমলে ইউরোপের জ্ঞান-চর্চা যে বাধাগ্রস্থ হয় তার কারণেই গ্রিক দর্শন, বিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তি ব্যাহত হয়। এ কারণে E. Gibbon আক্ষেপ করে বলেছেন, "In the revolution

---

৭ ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *স্পেন ও উত্তর আফ্রিকার মুসলিম শাসনের ইতিহাস* (ঢাকা: উত্তরণ প্রকাশন, বাংলা বাজার, ২০০৫), পৃ. ১১৪।

of ten centuries not a single discovery was made of exault the dignity or increase the happiness of mankind."[৮]

দাসত্ব প্রথার ভয়াবহ রূপ ইউরোপে দেখা দেয়। জায়গীরদারী প্রথার মারাত্মক কুফল হিসেবে ভূ-দাসত্ব প্রথার আবির্ভাব ঘটে এবং ভূমিদাসদের কোনো ব্যক্তি স্বাধীনতা ছিল না।[৯] এমন এক ঘৃণ্য প্রথা প্রচলিত ছিল যে, কোনো দাস বিবাহ করলে ফুল সজ্জার রাতে ভূ-স্বামীর শয্যাশায়িনী হতে হত। জার্মানিতে একে 'বিটশন্ট', 'ফ্লান্ডার্সে', 'বেডনুড', ইতালিতে 'কার্জ্জাজিয়ো', ফ্রান্সে 'কুইসেজ', ও ইংল্যান্ডে 'রেস্ট' বা 'নারীকর' বলা হত। মধ্যযুগীয় ইউরোপে বিচারের জন্য কোনো ন্যায়ানুমোদিত আইন বলবৎ ছিল না। এর ফলে নিম্নশ্রেণিভুক্ত লোকেরা নিপীড়িত হত। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক S. P Scott বলেন, "The existence of the people of Europe without distinction of rank and resources was a purely animal one" অর্থ্যাৎ "মধ্যযুগের অধিকাংশ ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে ইউরোপের লোকেরা অবিমিশ্র পশুবৎ জীবন যাপন করত।"[১০]

অত্যাচারে জর্জরিত, মর্মাহত ও বিক্ষুব্ধ ইহুদিগণ ছিল স্পেনের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ। অথচ সামাজিক মর্যাদা ও ধর্মীয় স্বাধীনতার নীতিকে জলাঞ্জলি দিয়ে অত্যাচারী শাসক, পুরোহিতবর্গ ইহুদি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপর অকথ্য নির্যাতন চালাত। কাউন্সিলের বৈঠকে ইহুদি নির্যাতনের নীলনকশা প্রণীত হত এবং সে অনুযায়ী ইহুদিদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হত। ৬৯৪ খ্রিস্টাব্দে ইহুদিরা ধর্মীয় অনাচার ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে কিন্তু তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ফলাফল স্বরূপ হত্যাযজ্ঞ সংঘঠিত হয় যা থেকে শিশু, মহিলা, বৃদ্ধ ব্যক্তিগণও রেহাই পায়নি। নিপীড়িত, উৎপীড়িত ও নির্যাতিত ইহুদি সম্প্রদায় এক অনাগত ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করত।[১১]

প্রাক-মুসলিম স্পেনে রাজনৈতিক অবস্থা ছিল সংকটাপন্ন। আইবেরীয় উপদ্বীপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা ছিল খুবই দুর্বল। ফলে প্রদেশ গুলো ছিল প্রায়ই স্বাধীন এবং নৈরাজ্য সমগ্র দেশকে গ্রাস করেছিল। এছাড়া স্পেনের সিংহাসনকে কেন্দ্র করে সেখানে এক মারাত্মক রাজনৈতিক সংকট দেখা দেয়। রাজপরিবার গুলোর মধ্যে গোত্রীয় এবং ব্যক্তিগত কলহ ও বিরোধ পরিস্থিতি চরম আকার ধারণ করেছিল। এছাড়া সেনাবাহিনী ছিল খুবই দুর্বল। দাসদেরকে জোর করে

---

৮ Edward Gibbon, *Decline and Fall of the Roman Empire*, Vol.VII (London: Strahan and Cadell, 1776), P.116.

৯ ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৪।

১০ Samuel Parsons Scoot, *History of the Moorish Empire in Europe*, Vol.I (Philadelphia and London: J.B. Lippincott Co., 1904), P.204.

১১ ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯।

সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করা হত। ফলে তারা রাজাদের উপর অসন্তুষ্ট ছিল। সামন্তপ্রথা রাজনৈতিক জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল।

মূলত স্পেনের গথিক রাজতন্ত্র খুবই দুর্বল ছিল। ক্ষমতা ও প্রভাবশালী যাজকগোষ্ঠী দ্বারা রাজা নির্বাচিত হত। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার স্থলাভিষিক্ত হত প্রভাব খাটিয়ে। ফলে পরবর্তী শাসক হত দুর্বল ও অযোগ্য। প্রাসাদ ষড়যন্ত্র, ব্যক্তিগত স্বার্থ ও কোন্দল ভিসিগথিক রাজবংশকে মলিন করে দিয়েছিল। কেন্দ্রীয় শাসনের শিথিলতার কারণে প্রাদেশিক উচ্চাভিলাষী গর্ভনরগণ ক্ষমতাভোগী হয়ে উঠে। সেনাবাহিনীর শক্তিহীনতা এই গভর্নরদের আরও উৎসাহিত করত।

এছাড়া গথিক রাজারা জনগণের উপর প্রচন্ড নির্যাতন চালাত। ফলে প্রজাসাধারণ মুক্তির প্রহর গুণছিল। নিপীড়িত, রিক্ত ও নিঃস্ব নাগরিক, অত্যাচারিত দুর্দশাগ্রস্থ ক্রীতদাস, অসহায় সার্ফ এবং নির্মমভাবে নিগৃহীত ইহুদি সকলেই কায়মনোবাক্যে কামনা করছিল কিভাবে কখন তারা এ শাসন ও শোষণ হতে মুক্তি পাবে।[১২] সামাজিক বৈষম্য, অর্থনৈতিক দুর্গতি, ধর্মীয় কলুষতা, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং সামরিক শক্তির দুর্বলতার সুযোগে এমন সময় উত্তর আফ্রিকার শাসনকর্তা ও খ্যাতনামা মুসলিম সেনাপতি মুসা বিন নুসাইর ও তারিক বিন যিয়াদ **৭১১** খ্রিস্টাব্দে স্পেন বিজয়ের অভিযান পরিচালনা করেন এবং শেষ পর্যন্ত গথিক রাজা রডারিককে পর্যুদস্ত করে ইউরোপের বুকে ইসলামের পতাকা উড্ডয়ন করে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এই প্রতীয়মান হয় যে, মুসলিম বিজয়ের আগে স্পেনের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। জনগণের কোনো আধিকার ছিলনা। তারা রাজা কর্তৃক নির্যাতিত ছিল। দারিদ্র্যক্লিষ্ট জনসাধারণ, দুঃখী ক্রীতদাস, দুর্ভাগা ভূমিদাস এবং উৎপীড়িত ইহুদিগণ সকলে সমবেতভাবে একজন ত্রানকর্তার অপেক্ষা করছিলো। তারা সবাই এর থেকে পরিত্রানের পথ খুঁজছিল। ঠিক এসময় ভিজিগথ অভিজাত সম্প্রদায় ও রাজপরিবারের সদস্যদের মধ্যে মতবিরোধের ফলে রাজ্যে বিবাদ ও বিশৃংখলা দেখা দেয। এদিকে কাউন্ট জুলিয়ান ও মুসা বিন নুসাইরকে স্পেন আক্রমণের আমন্ত্রণ জানান। অপরদিকে ভিজিগথ সেনাবাহিনীর মধ্যে ভীষণ বিশৃঙ্খলা ও দুর্বলতার সৃষ্টি হয়। যার ফলাফল স্বরূপ এক ক্ষুদ্র মুসলিমবাহিনী ভিজিগথ শাসনকে প্রথম আঘাতেই সমূলে উৎখাত করে। অতএব দেখা যায় যে, মুসলিম বিজয়ের পূর্বে স্পেনের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয় এবং আটশতকের শুরুতে স্পেন ছিল সম্পূর্ণ মুসলিম বিজয়ের অনুকূলে।

---

[১২] মাহবুবুর রহমান, *স্পেনে মুসলমানদের ইতিহাস* (৭১০ খ্রি.-১৪৯২খ্রি.) (ঢাকা: চয়নিকা প্রকাশন, ২০১২),পৃ. ১৮।

তৃতীয় অধ্যায়
স্পেনে মুসলিম সভ্যতার উন্মেষে আমীরদের ভূমিকা

মুসলিম বিজয়ের পর স্পেনে এক নব সভ্যতার উন্মেষ ঘটে। আরব মুসলিম বার্বার ও আদি স্পেনীয়দের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় স্পেন এক নতুন পরিচিতি নিয়ে ইউরোপ ভূ-খন্ডে স্থান করে নেয়। স্পেনে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা প্রদান ও পরিস্থিতির স্থিতিশীলতা দেখা দিলে উমাইয়া আমলে স্পেনের সমাজ ব্যবস্থায় উন্নয়নের এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে জাবের যুদ্ধে আব্বাসিয়দের হাতে দ্বিতীয় মারওয়ানের পরাজয়ের মধ্যে দিয়ে উমাইয়া খিলাফতের অবসান ঘটে। আব্বাসিয়রা খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়ে উমাইয়া বংশীয়দের প্রতি নির্মম অত্যাচার শুরু করে। কিছু সংখ্যক উমাইয়া আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়। এদের মধ্যে খলিফা হিশামের পৌত্র এবং মুয়াবিয়ার পুত্র আব্দুর রহমান ছিলেন অন্যতম।

আব্দুর রহমান (৭৫৬ খ্রিস্টাব্দ-৭৮৯ খ্রিস্টাব্দ) দামেস্কে উমাইয়াদের পতনের ছয় বছর পর স্পেনে উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা করেন। সুশাসক ও সাংগঠনিক ক্ষমতার অধিকারী আব্দুর রহমান স্পেনের অভ্যন্তরীন কোন্দল নির্মূল করে শান্তি শৃঙ্খলা কায়েম করতে সক্ষম হন। প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে সুবিন্যাস্ত করে তিনি জনকল্যাণকর কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নয়নের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় এই জন নন্দিত আমীরের শাসনামলে। তিনি ছিলেন জ্ঞানী, বিচক্ষন ও কৃতবিদ্যা এবং সংস্কৃতমনা শাসক। তিনি জ্ঞানী, গুণী ও পণ্ডিতগণকে যথেষ্ট সমাদর ও শ্রদ্ধা করতেন। তিনি তাঁর দরবারে জ্ঞানী গুণীদের আমন্ত্রণ জানাতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করতেন।

আব্দুর রহমানের রাজত্বের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কবি আবু আল মুতাহসামাহ, আইনজ্ঞ শেখ আবু মুসা হাওয়ারী, ধর্মতাত্ত্বিক শেখ গাজী বিন কাসেম, ইসা বিন দিনার, ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, সাদ বিন হাসান সাহিত্যিক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। এ সময়ই শেখ গাজী বিন কাসেম মালিক বিন আনাস এর *আল মুওয়াত্তা* স্পেনে নিয়ে আসেন। তার প্রিয় গায়িকা ছিল আফজা; যিনি ভাল গান গাইতেন এবং উদ (সেতার) বাজাতে পারতেন।[১] অর্থ্যাৎ আমীর প্রথম আব্দুর রহমান সেই বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, যার মধ্যে দিয়ে নয় থেকে এগার

---

১ এস.এম. ইমামুদ্দিন, *মুসলিম স্পেনের রাজনৈতিক ইতিহাস* (ঢাকা: খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানী, ১৯৯৯), পৃ. ৮৫।

শতকের মধ্যে স্পেন বিশ্ব সংস্কৃতির দুটি কেন্দ্রের একটিতে পরিণত হয়েছিল।[২] আব্দুর রহমান ছিলেন বীর, বিচক্ষন ও ভাগ্যান্বেষী। প্রাণ হাতে করে তিনি ভাগ্যেন্বেষনে বহির্গমন করেন এবং সাগর অতিক্রম করে উমাইয়া বংশের জন্য একটি রাষ্ট্র স্থাপন করে কর্ডোভা নগরীতে তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনার যে সূত্রপাত করেন তা পরবর্তী কালে পুষ্প পত্রে কলেবরে বৃদ্ধি করে সমগ্র ইউরোপের একমাত্র নির্ভরযোগ্য বিদ্যা নিকেতনে পরিণত হয়।

তিনি নাগরিকদের সুবিধার্থে একটি জলাধার (aqueduct) নির্মাণ করেন। তাঁর নবনির্মিত মুনাওয়াত আল রুসাফায় সুস্বাদু ও পরিষ্কার পানি সরবরাহের জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।[৩] তিনি প্রকৃতি প্রেমিক ছিলেন এবং প্রাসাদের চারিদিকে নানা রকম গাছপালা রোপন করে মনোরোম উদ্যান প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সিরিয়া, ইরাক ও মিসর থেকে গাছের বীজ ও চারা নিয়ে এসে তাঁর উদ্যানে বপন করেন। এ সমস্ত গাছের মধ্যে তালগাছ, লিচু ও ডালিম ফল উল্লেখযোগ্য।[৪] শিল্পকলার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। তিনিই বিশ্ববিখ্যাত কর্ডোভা মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা। ৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি সেন্ট ভিনসেন্ট গির্জার অর্ধেক ১,০০,০০০ দীনারে ক্রয় করে এই মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু করেন। ১২১ ফুট × ২৪১ ফুট পরিমাপের কর্ডোভা মসজিদের লিওয়ান দশটি খিলান রাজি দ্বারা এগারোটি আইলে বিভক্ত ছিল। স্তম্ভগুলো মার্বেলের এবং এগুলোতে করিন্থিয় ক্যাপিটাল দেখা যাবে। এগারোটি অশ্বখুরাকৃতি খিলান কাঠের ঢালু ছাদকে রক্ষা করেছে। এই মসজিদে একটি সাহান ছিল; কিন্তু কোনো রিওয়াক ছিলনা। কিবলার দিক ব্যতীত অন্য তিন দিকে প্রবেশ তোরণ ছিল। পরবর্তীকালে আব্দুর রহমান এই মসজিদটিকে সম্প্রসারিত ও অলংকৃত করেন। কারণ আব্দুর রহমান কর্ডোভা শহরকে তিলোত্তমা নগরীতে পরিণত করেন। এই নগরীর পুরাতন প্রাচীর পুন:নির্মিত হয় এবং সাতটি ফটকের সংস্কার করা হয়। অসংখ্য মসজিদ, হাম্মাম, দূর্গ, পুল নির্মাণ করে তিনি অক্ষয় কীর্তি রেখে গেছেন।[৫]

আমীর প্রথম হিশাম (৭৮৮ খ্রিস্টাব্দ-৭৯৬ খ্রিস্টাব্দ) জ্ঞানী ব্যক্তিদের যথাযোগ্য মর্যাদা দিতেন এবং তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি ছিলেন উদার ও অকৃপণ।[৬] তিনি নিজে একজন স্বনামধন্য কবি ছিলেন এবং আরবি কবিতার ভক্ত ছিলেন। তিনি শিক্ষা বিস্তারের জন্য মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং স্পেনের ধর্ম

---

২ পি.কে.হিট্টি, *আরব জাতির ইতিহাস* (অনুবাদ: জয়ন্ত সিং, সেঁজুতি ভট্টাচার্য, সৌমিত্র সেন গুপ্ত) (কলকাতা: মল্লিক ব্রার্দাস, ২০০৫), পৃ. ৪৯৮।

৩ খন্দকার মাশহুদ-উল-হাছান, *আরবের ইতিহাস* (ঢাকা: জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, বাংলা বাজার, ২০০৩), পৃ. ৩৮০।

৪ এস.এম. ইমামুদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪।

৫ ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *স্পেন ও উত্তর আফ্রিকার মুসলিম শাসনের ইতিহাস* (ঢাকা: উত্তরণ প্রকাশন, বাংলা বাজার, ২০০৫), পৃ. ৪৭।

৬ এ,এইচ,এম, শামসুর রহমান, *স্পেনে মুসলমানদের ইতিহাস* (ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৩৮১বঙ্গাব্দ),পৃ. ৬৫।

শাস্ত্রের মুসলিম ছাত্রদেরকে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য মদিনা গমনে উৎসাহিত করেন। তাঁর দরবারে বিখ্যাত সভা কবিদের মধ্যে যাদের তিনি পৃষ্ঠপোষকতা করতেন; তারা হলেন আমর ইবনে আলী গাফফার, ইসা বিন দিনার, আব্দুল মালিক বিন হাবিব, ইয়াহিয়া বিন ইয়াহিয়া, সাঈদ বিন হামাস এবং ইবনে আবু হিন্দু। ঐতিহাসিক S. Lanepoole বলেছেন, "যৌবনে তার প্রাসাদ বিজ্ঞানী, কবি ও ধর্মশাস্ত্রবিদগণের দ্বারা অলংকৃত থাকত।"[৭]

আমীর হিশাম জ্ঞান বিজ্ঞান ছাড়াও তিনি জনকল্যাণ ও যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে গুয়াডাল কুইভার নদীর উপর একটি সেতু নির্মাণ করেন। রাজধানীর সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য একটি ফোয়ারা নির্মিত হয়। তিনি নতুন প্রাসাদ নির্মাণ করেন এবং পুরাতন প্রাসাদগুলো সংস্কার করেন। তাঁর পিতা প্রথম আব্দুর রহমান কর্তৃক স্থাপিত কর্ডোভা মসজিদটি তিনি সংস্কার করেন।[৮]

আরব ঐতিহাসিকের মতে, হিশাম কর্ডোভা মসজিদে একটি মিনার সংযোজন করেন। এ মিনারটির উচ্চতা ছিল ১৪০ ফুট। এছাড়া তিনি মসজিদের অন্যান্য অংশের নির্মাণকাজ সম্পন্ন করেন। তিনি মসজিদের সম্প্রসারণ ও সংস্কার কাজে ১,৬০,০০০ দীনার ব্যয় করেছিলেন।[৯] হিশাম স্পেনে কতিপয় মসজিদ নির্মাণ করে স্থাপত্যবিদ্যায় তাঁর অনুরাগ প্রকাশ করেন। তিনি প্রজাবৎসল ছিলেন এবং গুপ্তচর পাঠিয়ে প্রজাদের অবস্থার কথা জানতেন। তিনি হারুন অর রশীদের মত রাতে ছদ্মবেশে শহর পরিভ্রমণ করতেন। তিনি স্বৈরাচারী শাসক ছিলেন না এবং বয়ঃজ্যেষ্ঠদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। এজন্য তিনি খোলাফায়ে রাশেদীনের মতো মজলিস-ই-শূরা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আরবি ভাষা শিক্ষার উপর সুনজর দিতেন। তিনি মালেকী মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং মালিক ইবনে আনাসের মাজহাব প্রচারের জন্য পৃষ্ঠপোষকতা করেন। সঙ্গীতের প্রতি তাঁর অনীহা ছিল। এ কারণে তাঁর রাজত্বকালে সঙ্গীত নিষিদ্ধ ছিল। এর প্রধান কারণ গোঁড়া মালিকী মতবাদের প্রভাব।[১০]

আমীর প্রথম হাকাম (৭৯৬ খ্রিস্টাব্দ-৮২২ খ্রিস্টাব্দ) শিল্পকলা ও সাহিত্যের উৎকর্ষে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তিনি কবি ছিলেন এবং সঙ্গীতের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল। তাঁর সভায় কবি, সাহিত্যিক ও সঙ্গীত বিশারদদের বিশেষভাবে সম্মানিত করা হত। গায়কদের মধ্যে এ সময়ে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন আব্বাস

---

৭ Stanely Lanepoole, *The Moors in spain* (London: United Ltd.,1912), P. 71.

৮ ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১।

৯ এস.এম. ইমামুদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১।

১০ ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২।

বিন আল নাসাই, মনসুর, আলুন এবং জারকুন। মনসুর ছিলেন একজন ইহুদি গায়ক, যিনি দ্বিতীয় আব্দুর রহমানের সভায় প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ জিরয়াবকে পরিচয় করিয়ে দেন।[১১]

দ্বিতীয় আব্দুর রহমান (৮২২ খ্রিস্টাব্দ-৮৫২ খ্রিস্টাব্দ) জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসারের প্রতি বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন। তিনি সুদূর প্রাচ্য হতে সভ্যতার বিভিন্ন উপাদান ও উপকরণ আমদানি করে স্পেনকে সুশোভিত করে তোলেন। তিনি নিজ প্রচেষ্টায় মানুষের দৈনন্দিন আচার আচরণে আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসেন। তাঁর শাসনামলে প্রাচ্যের সুর সম্রাট জিরয়াবের আগমনের ফলে স্পেনের সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক জীবনের চরম উৎকর্ষতা লাভ করে। খাবার টেবিলের সাজগোজ হতে শুরু করে দরবারের কার্পেট বিছানো পর্যন্ত তাঁর রীতি অনুসরণ করা হত।

জিরয়াব একাধারে শিল্পী, কবি, সাহিত্যানুরাগী, ভূগোল বিশারদ এবং জ্যোতির্বিদ ছিলেন। তিনি ছিলেন রুচিবান ব্যক্তি। তিনি চাল চলন, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং খাদ্যাভাসে বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভাবন করেন। তিনি সুন্দর সুন্দর পোশাক পরিধান, উপাদেয় খাদ্য আহার এবং সুগন্ধি ও সৌখিন দ্রব্যাদির ব্যবহার প্রচলিত করেন। বহু রাজকীয় পোশাক শুধুমাত্র গোলাপ পানি দ্বারা ধৌত করা হত। জিরয়াব এই গোলাপ পানিতে সামান্য লবণ ব্যবহারের পরামর্শ দেন। তিনি বিভিন্ন ধরনের খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতের ক্ষেত্রে উৎসাহ দিতেন। তিনি নিজেও ভোজন বিলাসী ছিলেন এবং গোস্তের গোলাকার কুপ্তা ও ত্রিকোণাকার পিঠার প্রচলন করেন। যা 'আল-তাফায়া' বা 'তাকাল্লিয়া ই জিরয়াব' নামে পরিচিত ছিল। অ্যাসপ্যারাগস নামক সবজি তাঁর সময়ে বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি করে। তাঁর সময় সোনা-রূপার পাত্রের স্থলে স্ফটিক ও কাঁচের তৈজসপত্রের ব্যবহার শুরু হয়।[১২]

জিরয়াব সৌখিন ছিলেন এবং তৎকালীন সময়ে বিভিন্ন ধরনের পোশাক পরিচ্ছদ এবং প্রসাধনের প্রচলন করেন। তিনি গরমের সময় সাদা পোশাকের স্থলে, রঙ্গীন সিল্কের জোব্বার ব্যবহার প্রচলিত করেন। মহিলারা পূর্বে তাদের চুল মাথার মধ্যভাগে সিঁথি করতেন, কিন্তু জিরয়াবের সময় থেকে সৌখিন মহিলাগণ তাঁদের চুল সামনের দিকে কপালে রেখে আধুনিকতার ছাপ রাখতে শুরু করেন। দ্বিতীয় আব্দুর রহমানের রাজত্বে জিরয়াব সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশিষ্ট অবদান রাখেন।[১৩] S.M. Imamuddin বলেন, "আমীর জীবনের কোনো দিকই অবজ্ঞা করতেন না। পোশাক পরিচ্ছদ এবং

---

১১ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬।

১২ ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২।

১৩ P.K. Hitti, *History of the Arabs* (London: Macmillan and Co. Ltd., 1970), P.515-16.

জীবনযাত্রার প্রণালীতে নানা ধরনের বৈচিত্র আনা হয়।"[১৪] ("No aspect of life was ignored by the Amir. Reforms were introduced in dress and the mode of living.")

ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণ হয় এবং কারিগরি বিজ্ঞান প্রয়োগে কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। কর্ডোভায় তিরাজ তৈরির কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। তিরাজ হচ্ছে এক ধরনের সিল্ক, যার উপর নক্শা থাকতো এবং এমব্রয়ডারী করে মালিকের নাম লিখা থাকতো।

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বাগদাদ থেকে ওষুধ আমদানি করা হত। চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতির মূলে ছিল গ্রিক ও পারস্য চিকিৎসাশাস্ত্র থেকে আরবিতে অনূদিত গ্রন্থাবলি। এসমস্ত গ্রন্থ চিকিৎসকদের ব্যবহারিক জ্ঞান-লাভেই সহায়তা করেনি, বরং শিক্ষার্থীদের চিকিৎসা বিজ্ঞানে গভীর জ্ঞান অর্জনে সম্ভবপর হয়। মূলত এ সময় থেকে স্পেনের কৃষ্টি কালচারে আধুনিকতার ছাপ লক্ষ্য করা যায়। স্পেন পরিণত হয়ে উঠে এক স্বপ্নপুরীতে। যার ফলে প্রাচ্যের বিভিন্ন অঞ্চল হতে লোকজন এসে স্পেনে বসবাস শুরু করে।

নতুন এবং দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থসমূহ সংগ্রহের জন্য তার প্রতিনিধিরা প্রাচ্যের শহরগুলো ভ্রমণ করত। বিজ্ঞানের উপর লিখিত গ্রিক ও ফার্সি ভাষার গ্রন্থগুলোর আরবি অনুবাদ সংগ্রহের জন্য আব্বাস ইবনে নাসীহ মেসোপটেমিয়ায় বিশেষ করে বাগদাদের লাইব্রেরীগুলো তন্ন তন্ন করে খুঁজেন।[১৫] এ সমস্ত গ্রন্থ কর্ডোভার উমাইয়া গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধ করে এবং এভাবে তাঁর শাসনামলে কর্ডোভা লাইব্রেরী মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ভাণ্ডারে পরিণত হয়। তিনি নিজে একজন উচ্চাঙ্গের কবি ছিলেন এবং তাঁর দরবারে কবিদের সমাবেশ ঘটে হাবিব বিন হাউস কর্তৃক লিখিত কবিতা গুচ্ছ ইবনে মুসান্না (৮৮৬ খ্রিস্টাব্দ-৮৮৭ খ্রিস্টাব্দ) স্পেনে নিয়ে আসেন। মুসান্না এক সময় আমীর দ্বিতীয় আব্দুর রহমানের গৃহশিক্ষক ছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে তার দুই পুত্র মুহম্মদ এবং উমরের গৃহ শিক্ষক নিযুক্ত হন। তাঁর সভাকবি ওবায়দুল্লাহ বিন চার্লমান বিন বদর এবং আব্দুর রহমান বিন শিমর এর রচিত কবিতা তিনি শ্রবণ করতেন।[১৬]

ইয়াহিয়া ইবনুল হাকাম ওরফে আল গাজ্জাল (মৃ. ৮৬৪ খ্রিস্টাব্দ) অন্য একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। তিনি মরমী ও ব্যঙ্গ কাব্য রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি কর্ডোভায় একটি অনুবাদ সংসদ স্থাপন করেন। সেখান থেকে গ্রিক ভাষায় লিখিত দর্শন ও বিজ্ঞানের গ্রন্থগুলো আরবিতে অনুবাদ করা হত। অন্যান্য

---

[১৪] S.M. Imamuddin, *A Political History of Muslim Spain* (Dacca: Najmah Sons, 1969), P.108.

[১৫] মাহবুবুর রহমান, *স্পেনে মুসলমানদের ইতিহাস* (৭১০ খ্রি.-১৪৯২খ্রি.) (ঢাকা: চয়নিকা প্রকাশন, ২০১২),পৃ. ১১৭।

[১৬] মাহবুবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ১১৭।

বিষয়ের বই প্রাচ্যের দেশগুলো থেকে আমদানি করা হত। এই অনূদিত বইগুলো মেডিক্যাল স্কুলগুলোতে ব্যবহার করা হত। শিক্ষার বিস্তারের জন্য প্রত্যেক শহরে মাদ্রাসা ও পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারি অর্থে পরিচালিত হত। বিখ্যাত সঙ্গীত বিশারদ জিরয়াব ললিতকলা ও সঙ্গীত চর্চায় জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক কৌতুহল সৃষ্টি করেন। তাদের জীবনের সাথে চিত্ত বিনোদন ও বিলাসিতা জড়িয়ে পড়ে। তারা নিজেদের শহর বন্দরগুলোও জাঁকজমকপূর্ণ করে গড়ে তোলে। আল হামরা প্রাসাদ আজও স্পেনের জনগণের বিলাসবহুল জীবন যাত্রার এক অনুপম নিদর্শন হয়ে আছে।

শিল্পকলা ও সাহিত্যের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক হিসেবে দ্বিতীয় আব্দুর রহমান বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেন। তিনি রাজ্যের বিভিন্ন শহরে প্রাসাদ, দফতর, উদ্যান নির্মাণ করেন। রাস্তা-ঘাট মার্বেল পাথর দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়। যাতায়াত ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয় এবং রাজ্যব্যাপী রাস্তা নির্মিত হয়। এর ফলে গুপ্তচরদের মাধ্যমে তিনি খবরাখবর পেতেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি বিদ্রোহ দমন করতে পারতেন। রাজ্যের সর্বত্র মসজিদ, মাদ্রাসা, সরাইখানা ও সেতু নির্মিত হয়। তিনি স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষের জন্য বহু স্থপতি ও কারিগর নিযুক্ত করেন।[১৭]

জেন (Jaen) এবং সেভিলে অপূর্ব নক্শা খচিত মসজিদ নির্মিত হয়। স্থাপত্যকলায় তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান রয়েছে প্রথম আব্দুর রহমান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কর্ডোভার জামে মসজিদের সম্প্রসারণে। ক্রেসওয়েল বলেন যে, দ্বিতীয় আব্দুর রহমান দশটি খিলান সারি এবং এগারোটি আইল বিশিষ্ট লিওয়ানটি দক্ষিণ দিকে অর্থ্যাৎ কিবলার দিকে সম্প্রসারিত করেন। ইবনে-আজহারীর মতে, সম্প্রসারিত অংশের পরিমাপ ১৫০ হাত প্রশস্ত এবং ৫০ হাত গভীর। এ অংশে ৮০টি স্তম্ভ ছিল। প্রথম আব্দুর রহমানের নির্মিত দশটি সারি সম্প্রসারিত করে প্রতি সারিতে আটটি স্তম্ভ সংযোজন করেন লিওয়ানটির আয়তন বৃদ্ধি করা হয় (৮×১০=৮০)। দ্বিতীয় আব্দুর রহমান প্রথম হিশাম কর্তৃক স্থাপিত মিনারে একটি কিয়স্ক বা চূড়া এবং উপরে উঠার সিঁড়ি নির্মাণ করেন।[১৮]

বিলাসপ্রিয় আমীর দ্বিতীয় আব্দুর রহমান অত্যন্ত জাঁকজমক পছন্দ করতেন। তাঁর দরবারে পারস্য-আরব রীতিতে অনুষ্ঠানাদি পরিচালিত হত। খাদ্যাভাসে, পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-অনুষ্ঠান পালন প্রভৃতি অত্যন্ত পরিপাটির সাথে করা হত। ডোজী বলেন, "দ্বিতীয় আব্দুর রহমানের শাসনামলের মত

---

[১৭] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬।
[১৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬।

স্পেনের অপর কোনো সুলতানের রাজদরবার এত ঐশ্বর্যপূর্ণ ছিল না।"[১৯] ("Never had the court of the sultans of Spain been so brilliant as it become under the rule of Abdur Rahman.") তিনি খলিফা হারুন আল রশীদের মতো ঐশ্বর্য, বৈভব, জাঁকজমক, বিলাসিতা পছন্দ করতেন এবং তাঁর দরবারকে সেভাবে গঠন করেন। তিনি সৌখিন ছিলেন এবং অবসর বিনোদনের জন্য দাবা খেলতেন। হারেমে তার সম্রাজ্ঞী তারুবা ছাড়াও অপর যে প্রভাবশালী ও সুন্দরী মহিলা ছিলেন তাঁর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন মদিনাবাসী ফাদাল, যিনি একাধারে ছিলেন কবি ও গায়িকা। ফাদাল হারুনের রাজদরবারে ছিলেন এবং তার কন্যার সঙ্গী ছিলেন। দ্বিতীয় জন ছিলেন নাভারীয় (Nevarrese) মহিলা কালাম।[২০] আব্দুর রহমানের রাজত্বকালে বস্ত্র শিল্পের উন্নতি হয় এবং বিভিন্ন ধরনের কাপড় উৎপাদিত হয় এবং আমদানি করা হত। S. Lanepoole বলেন, "তাঁর রুচি ছিল মার্জিত এবং প্রকৃতি ছিল ভদ্র ও শিষ্টাচারমন্ডিত"।[২১] দ্বিতীয় আব্দুর রহমান জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নয়নে যে পৃষ্ঠপোষকতা করেন তার ফলেই পরবর্তীকালে তৃতীয় আব্দুর রহমান ও দ্বিতীয় হিশামের সময় মূরদের স্বর্ণযুগের সূত্রপাত হয়।

আমীর প্রথম মুহম্মদ (৮৫২ খ্রিস্টাব্দ-৮৮৬ খ্রিস্টাব্দ) ছিলেন শিল্প ও সাহিত্যের উদার পৃষ্ঠপোষক। তিনি নিজে কবি, সাহিত্যিক ও বাগ্মী ছিলেন। তিনি পণ্ডিত ব্যক্তিদের সমাদর করতেন। কর্ডোভার জামে মসজিদে তিনি প্রায়ই ধর্মীয় উপদেশ দিতেন। কোরআন ও হাদিসের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। হাদিস সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট পড়াশুনা করেন। *কিতাবুল হাইয়ান* গ্রন্থের রচয়িতা মুতাজিলা মতবাদের সমর্থক জাহিজের (মৃ.৮৬৯ খ্রিস্টাব্দ) গ্রন্থাবলি তাঁর সময়ে স্পেনে আনা হয়।[২২]

শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমানের সময় (৯১২ খ্রিস্টাব্দ-৯৬১ খ্রিস্টাব্দ) স্পেনে এক নবজাগরণের সূচনা হয়। তিনি রাজ্যের সর্বত্র স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। রাজধানী কর্ডোভাতেই ছিল সর্বোচ্চ শিক্ষাক্ষেত্র কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়। ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা হতে অসংখ্য ছাত্র তীব্র জ্ঞান পিপাসা নিবৃত্ত করার জন্য এখানে সমবেত হতেন। তাঁর সময়ে বিখ্যাত পণ্ডিতবর্গের মধ্যে দার্শনিক ইবনে মাসারাহ (মৃ.৯৩১ খ্রিস্টাব্দ), ঐতিহাসিক ইবনুল আহমর (মৃ. ৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ), জ্যোতির্বিদ আহমদ কাসিম (মৃ.৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ) এবং চিকিৎসক আবির বিন সাইদ ও ইয়াহইয়া বিন ইসহাক অসামান্য খ্যাতি অর্জন করেন।

---

[১৯] R.Dozy, *Spanish Islam: A History of the Moslems in Spain* (Trans. Francis Griffin Stokes) (London: Chatto and Windless, 1919), P.260.

[২০] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭।

[২১] S.Lanepoole, *Op.Cit*., P.52.

[২২] মাহবুবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ৭০।

তাঁর সময়ে ইহুদীগণ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখেন। বিখ্যাত কূটনীতিবিদ ও চিকিৎসক হাসদাই ইবনে সাপরুত; তিনি অর্থমন্ত্রী ও রাজস্ব সচিব হিসেবে কাজ করেন। তিনি ছিলেন গ্রিক বিজ্ঞানের সমঝদার। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় এবং হাসদাই ইবনে সাপরুতের সহযোগিতায় গ্রিক পণ্ডিত নিকোলাস *ডাইসকোরাইডস* আরবিতে অনুবাদ করেন। গ্রন্থটি মুসলিম স্পেনে গ্রিক বিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে মূল গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়।

তাঁর সময় বহু বিদেশী পন্ডিতের সমাগম হয়। আন্দালুসিয়া তখন ইউরোপের Intellectual capital অর্থ্যাৎ জ্ঞান চর্চার প্রধান কেন্দ্র এবং এখানে মুসলমান ও অমুসলমান জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিগণ জ্ঞান চর্চার জন্য আসতেন। বিখ্যাত ভৌগোলিক ইবনে হাউকল তার সময় ফাতেমীয় রাজ্য থেকে স্পেনে আসেন। এ সময় ইবনে মাসাররাহ স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন এবং দর্শন শাস্ত্রে বিশেষ করে সুফিবাদের উপর বিশেষ অবদান রাখেন। এস.এম. ইমামুদ্দিন তাকে আন্দালুসিয়ার '*অতীন্দ্রিয়বাদের প্রবর্তক*' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। ইবনুল আহমার মিসর, ইরাক ও ভারতবর্ষে দীর্ঘ ভ্রমণের পর স্পেনের রাজকীয় লাইব্রেরীতে যোগদান করে তৃতীয় আব্দুর রহমানের *ঐতিহাসিক জীবন রচিত* রচনা করেন।

ইফতিহাহুল আন্দালুস গ্রন্থের রচয়িতা ও বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনুল কুতিয়াহ তাঁর সময়েই সুখ্যাতি অর্জন করেন। আহমদ আল রাজী নামে এক ঐতিহাসিক স্পেনের একটি ইতিহাস রচনা করেন। *Cronica del moro Rasis* নামে এই গ্রন্থটি স্পেনের দলিল হিসেবে পরিচিত। গণিতবিদ আবু গালিব হাব্বার, ইবনে উবদা, এবং মাসলামাহ আল মাজরিতি জ্যামিতি বিশারদ এবং আবু আইয়ুব ছিলেন তাঁর সময়ের দুই বিখ্যাত পণ্ডিত। তিনি বাগদাদের বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ আবু আব্দুল কাব কে ৯৪১ খ্রিস্টাব্দে স্পেনে আগমনের আমন্ত্রণ জানান। তাঁর সময় লাইব্রেরীর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায়। ইবনে আব্দুর রাবিহী (৮৬০ খ্রিস্টাব্দ-৯৪০ খ্রিস্টাব্দ) খলিফার সামরিক গৌরবের কথা প্রশংসামূলক কবিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেন যা *উরজুয়া* নামে পরিচিত ছিল। মহিলা সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে বিশেষভাবে খ্যাতি অর্জন করেন মুতো। তিনি তাঁর কবিতা ও গান পরিবেশন করে খলিফার মনতুষ্টি করতেন।

তৃতীয় আব্দুর রহমানের দরবারে যে সংগীতজ্ঞ ছিলেন, তিনি দুর্লভ কৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ। জ্যোতির্বিজ্ঞান ও ইতিহাসে পণ্ডিত এই ব্যক্তি শাহী বেতন পেতেন এবং শাহী আড়ম্বরের মধ্যে বাস করতেন। ডোযি বলেন, "কর্ডোভার সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞ যে একই সাথে ঐতিহাসিক ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন এবং সব দেশের গৌরবময় বস্তুগুলোর বর্ণনা দিতে পারতেন তা কোন দৈবিক ব্যাপার ছিলনা; কারণ

সর্বপ্রকার আমোদসহ কর্ডোভা ছিল প্রধানতঃ জ্ঞান কেন্দ্র এবং সে দিক দিয়ে ছিল পাশ্চাত্যের বাগদাদ। যারা ধর্ম শাস্ত্র এবং আইন শাস্ত্র নিয়ে ব্যাপৃত ছিলেন, তাঁদের (তথাকথিত ফকিহ্) সংখ্যা ছিল অগনিত"।[২৩] স্পেনীয় সাহিত্যে এটি এক অতীব দুর্লভ ও বিরল সংযোজন। তাঁর সময় ইবনে হানী

(মৃ. ৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ) কে প্রাচ্যের মুতানাব্বী বলা হত।[২৪] খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমান শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতি সাধনের জন্য প্রতিবছর রাজকোষের এক তৃতীয়াংশ ব্যয় করতেন।

খলিফা আব্দুর রহমান নিজেও সুপণ্ডিত ছিলেন এবং দরবারে জ্ঞানী গুণীদের সমাদর করতেন। তিনি সাহিত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, স্থাপত্য, কারুশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। সমগ্র রাজ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় নিম্ন ও উচ্চশিক্ষার জন্য বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তাঁর সময়ে কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় জগৎ বিখ্যাত ছিল।

S.P.Scott বলেন, "আইবেরিয়ার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যায়ে উন্নীত হয়। কর্ডোভায় সর্বসাধারণের জন্য ৮০০টি স্কুল ছিল। মুসলমান, ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ছাত্ররা সেখানে পড়াশুনা করত। এটি খলিফার ধর্ম নিরপেক্ষতা ও উদারতার চরম প্রদর্শন। কর্ডোভা, গ্রানাডা ও অন্যান্য প্রধান নগরীর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকদের প্রায়ই ইহুদি ছিলেন। জ্ঞান চর্চার জন্য কর্ডোভায় বিশাল গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। এখানে বিদ্যার্জনের জন্য ইতালি, জার্মানি, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড থেকে শিক্ষার্থীগণও আসতেন। সাহিত্য, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, ইতিহাস, চিকিৎসাশাস্ত্র, রসায়ন, ফলিত বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, ইতিহাস, চিকিৎসাশাস্ত্র, রসায়ন, ফলিত বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল।"[২৫]

মহামান্য তৃতীয় আব্দুর রহমানকে উপহার দেওয়ার জন্য বাইজান্টাইন সম্রাট ডাইসকোরাইডসের সুদৃশ্য এক কপি ভেষজ বিদ্যা (Pharmaceutics of Dioscoridies) ছাড়া আর কিছুই বেশি উপযোগী বিবেচনা করতে পারে নি এবং সেই সময়ে কর্ডোভায় গ্রিক জানা কোন ও লোক না থাকায় শিক্ষিত মঠাধিকারী নিকলাসকে সাথে পাঠান হয় বইটি আরবিতে অনুবাদ করার জন্য।[২৬]

তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে কর্ডোভা নগরী ইউরোপের বাতিঘর হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। মূল সভ্যতায় তাঁর অসামান্য অবদান রাখছে।

---

২৩ R.Dozy, *Op.Cit.*, P. 242-249.

২৪ S.M. Imamuddin, *Op.Cit.*, P.162.

২৫ Samuel Parsons Scott, *History of the Moorish Empire in Europe*, Vol.I (Philadelphia and London: J.B. Lippincott, Co., 1904), P.518.

২৬ যোশেফ হেল (অনু: মোজাম্মেল হক), *আরব সভ্যতা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, বর্ধমান হাউস, চৈত্র: ১৩৭৫), পৃ. ১৪৬।

তিলোত্তমা নগরী কর্ডোভায় খলিফা আব্দুর রহমানের অতুলনীয় ইমারত স্থাপত্যের চরম উৎকর্ষ লাভ করে। এগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য মদিনাতুজ জাহ্‌রা এবং কর্ডোভা মসজিদের সম্প্রসারণ ও অলঙ্করণে এর সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। এ ছাড়া তিনি স্নানাগার, বিশ্ববিদ্যালয়, উদ্যান প্রভৃতি স্থাপন করে যশস্বী হয়েছেন।

জাহ্‌রা প্রাসাদ সম্বন্ধে এস এম ইমামুদ্দীন বলেন, এ প্রাসাদে ৭৫০টি কারুকার্য খচিত কাঠের দরজা ছিল এবং সর্বমোট ৪৩১৬টি স্তম্ভের সাহায্যে পাথর ও ইট দিয়ে এ অতুলনীয় রাজ প্রাসাদটি নির্মিত হয়। শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে খলিফা আব্দুর রহমান ইবনে আল উরুস পাহাড়ের পাদদেশে এই প্রাসাদটি নির্মাণ করেন এবং দীর্ঘ পনের বছর পর প্রাসাদের মূল অংশটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়। কিন্তু আরও পঁচিশ বছর ধরে এ প্রাসাদের নির্মাণ কাজ অব্যাহত থাকে। তাঁর উত্তরাধিকারীদের শাসনামল অর্থ্যাৎ ৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে দ্বিতীয় হাকামের রাজত্বে ৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জাহ্‌রা প্রাসাদ নির্মিত হয়। দশ হাজার শ্রমিক কারিগর নিয়োগ করে বার্ষিক ২,০০,০০০ দীনার ব্যয়ে এ প্রাসাদাটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়।[২৭]

জাহ্‌রা প্রাসাদটি তিন স্তরে নির্মিত হয়; সর্বোচ্চ অংশে রাজপ্রাসাদ ও হারেম, মধ্যবর্তী অংশে বাগান, খেলার মাঠ, ঝর্ণা এবং সর্বনিম্ন অংশে দাস-দাসী, রাজকর্মচারীদের আবাসস্থল। ৯৪১ খ্রিস্টাব্দে এ প্রাসাদে একটি মসজিদ নির্মিত হয় এবং প্রধান কাজী আবু আব্দুল্লাহ বিন আবি ইলা প্রথম নামাজ পরিচালনা করেন। এ প্রাসাদের নির্মাণে কার্থেজ, বাইজান্টাইন, উটিকা, টেরাগোনা থেকে নির্মাণ সামগ্রী সংগৃহিত হয়। দুটি অপূর্ব সুন্দর ফোয়ারা পরিবেশকে মধুর করে রাখত। এর একটি সিরিয়া এবং অপরটি বাইজান্টাইন থেকে আনা হয়। খলিফার শাসনামলে কর্ডোভা শহর পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল এবং প্রতিটি মহল্লায় একটি করে মসজিদ, বাজার, স্নানাগার ছিল। সুউচ্চ দূর্গ বা আল কাজার শহরের মধ্যবর্তী স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৮]

এছাড়াও তাঁর সময় শিল্পের ও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। সমস্ত স্পেনে বিভিন্ন ধরনের কল-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সমস্ত কারখানায় রেশম, কার্পাস, পশম, চামড়া, ধাতুর দ্রব্যাদি উৎপাদিত হত। সিল্কের কাপড় উৎপাদিত হত ভ্যালেনসীয়া এবং এলভিরায়। অস্ত্রসস্ত্র তৈরি হত টলেডোতে। কার্পেট তৈরি হত Cuenca শহরে। Calatayud নগরীর মৃৎপাত্র নির্মাণের জন্য সুখ্যাতি ছিল। চামড়া প্রস্তুত হত সারাগোসায়। কাপড় এবং পুস্তক প্রণীত করা হত কর্ডোভা শহরে। কমপক্ষে ৬০,০০০ গ্রন্থ প্রণীত

---

[২৭] এস.এম. ইমামুদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬০।

[২৮] *তদেব*।

হত বছরে রাজধানী কর্ডোভায়। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ নিলামে বিক্রি হত। বিদেশী প্রসাধনী দ্রব্য আলমেরিয়ার নিকটস্থ Pechira বন্দরে আমদানি করা হত।[২৯]

আল-জাহ্রা প্রাসাদের স্থাপতিক অলঙ্করণ চমৎকার ছিল। মনিমুক্তা খচিত সম্পদরাজিও অপূর্ব নক্শা সম্বলিত কাঠের বীম, মার্বেল ও স্ফটিক পাথরে নির্মিত স্তম্ভের উপর বৃত্তাকার গম্বুজ, চৌবাচ্চা-ঝর্ণা, গজদন্ত ও আবলুস কাঠের গবাক্ষ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। এ গবাক্ষ পথ দিয়ে সূর্যরশ্মি যখন পারদ চৌবাচ্চায় পড়ত তখন তার বিকিরিত রশ্মি সমগ্র কক্ষগুলোকে আলোয় উদ্ভাসিত করত এবং এক রোমাঞ্চকর পরিবেশের সৃষ্টি করত। এই প্রাসাদের ফটকে সম্রাজ্ঞী জোহ্রার একটি ভাস্কর্য মূর্তি ছিল এবং ব্রোঞ্জের ঝর্ণাটি মানুষের আকৃতিতে তৈরি করা হয়।

খলিফা আব্দুর রহমান স্থাপত্যকলা, অলঙ্করণ ও কারুশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। প্রথম আব্দুর রহমান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কর্ডোভার জামে মসজিদটির তিনি সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন। তিনি মসজিদের সম্মুখভাগ পুনর্নির্মাণ করেন। একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, এ পুনর্নির্মাণ ৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে করা হয়েছিল। খলিফার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব ছিল হিশামের মিনারটি ভেঙ্গে তার উপর সুউচ্চ চতুষ্কোণাকার মিনারটি নির্মাণ। এর উচ্চতা ৭০ হাত এবং পূর্ব ও পশ্চিম দিকে সিঁড়ি রয়েছে। মিনারের উপর একটি গম্বুজ ছিল এবং গম্বুজের শীর্ষ দন্ডটি সোনা ও রূপার তৈরি একটি পদ্ম এবং আপেল দ্বারা সজ্জিত ছিল।

বয়ন শিল্পের এরূপ প্রসার ঘটে যে একমাত্র কর্ডোভা শহরেই ১৩,০০০ তাঁতী বসবাস করত। পরবর্তীকালে বয়ন শিল্প সেভিল এবং আলবিয়া কর্ডোভাকে ছাড়িয়ে যায়। ইবনে হাউকল মন্তব্য করেন যে, দিবাজ (Dibaz) নামে এক প্রকার সূক্ষ্ম ও মোলায়েম রেশমী কাপড় স্পেনে প্রস্তুত করা হত। এছাড়া বিভিন্ন দেশ থেকে চারাগাছ, বীজ প্রভৃতি সংগ্রহ করা হত। জীবজন্তুও আমদানি করা হত যাতে ভূমিকর্ষণ ও সেচ ব্যবস্থা কোনো প্রকার বাধাগ্রস্থ না হয়। দশম শতকের মধ্যে স্পেনে প্রানীজ ও উদ্ভিজ বিজ্ঞানের কেন্দ্রে পরিণত হয়। বহু চিড়িয়াখানা ও উদ্যান প্রতিষ্ঠিত হলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ঘটে।[৩০]

---

[২৯] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২।

[৩০] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৩।

S. Lanepoole বলেন, "তাঁর সময় কর্ডোভা যেরুপ সমৃদ্ধ ও সম্পদশালী হয় আর কখনও সেরুপ হয়নি; আন্দালুসিয়া কখন ও এত উৎকৃষ্টরূপে কর্ষিত বা প্রকৃতির দানে এত পরিপূর্ণ হয় নি; মানবের যত্ন ও কৌশলের এরূপ বিজয় হয়নি, আইনের ক্ষমতা কখনও এত ব্যাপক রূপে অনুভূত বা সম্মানিত হয়নি।"[৩১]

দ্বিতীয় হাকাম (৯৬১ খ্রিস্টাব্দ-৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ) এর সময় স্পেনে মুসলমানগণ জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় স্বর্ণ শিখরে আরোহন করে। তিনি (হাকাম) স্পেনের সংস্কৃতির বিকাশ সাধন করেন যার ফলে তমসাচ্ছন্ন ইউরোপের বুকে কর্ডোভা নগরী একটি প্রদীপাধারে পরিণত হয়। তিনি ছিলেন জ্ঞান তাপস খলিফা। তিনি রাজ্য জয় অপেক্ষা জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চায় বেশি মনোযোগ দিতেন। তিনি জ্ঞানীগুণীদের সমাদর করতেন। তিনি সাহিত্য ও বিজ্ঞান ভালবাসতেন এবং বিদ্বান ও জ্ঞানীদিগকে যথাযথ সম্মান করতেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় শিক্ষাদীক্ষা ও জ্ঞানচর্চায় নবদিগন্তের উন্মোচন হয়।

শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রধান প্রধান শহরে মালাগা, সেভিল, সারাগোসা, তলেদো ও জায়েনে শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করেন। জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোয় দেশের প্রতিটি অঞ্চল আলোকিত করার জন্য তিনি একটি স্বতন্ত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সময় কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়াতে রূপকথার ন্যায় বিস্তার লাভ করে। কায়রোর আল আজহার ও বাগদাদের নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠে। খ্রিস্টান, ইহুদি ও মুসলিম ছাত্রগণ শিক্ষা অর্জন করার জন্য এখানে আসত। এখানে শুধু স্পেনের ছাত্ররাই শিক্ষা লাভ করত না বরং ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা থেকে শিক্ষার্থীরা আসত। কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য, ইতিহাস, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞান সম্পর্কে যে জ্ঞান গর্ভ আলোচনা হত তাতে অংশ গ্রহণ ও শ্রবণের জন্য ইতালি, জার্মানি, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশ হতে জ্ঞান পিপাসু বিদ্যার্থীগণ সমবেত হতেন।[৩২]

দ্বিতীয় হাকামের সময় জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসারতা ছিল অভাবনীয়। বিদ্যাচর্চার উল্লেখ করে ডোযি বলেন, "স্পেনে প্রায় সকলেই লিখতে পড়তে পারত। অন্য পক্ষে খ্রিস্টানগণ কর্তৃক অধিকৃত ইউরোপের পুরোহিত ব্যতীত সকলেই এমনকি উচ্চ শ্রেণির লোকেরা সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিল।"[৩৩] দ্বিতীয় হাকামের রাজত্বকালে আন্দালুসিয়ার সাংস্কৃতিক জীবন ছিল খুবই উচ্চাঙ্গের ও পরিশীলিত ।

---

৩১ S.Lanepoole, *Op.Cit.*, P.118-19.

৩২ এস.এম. ইমামুদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭১।

৩৩ R. Dozy, *Op.Cit.*, P. 455.

ঐতিহাসিক S.P Scott বলেন, "যদি কেউ একজন কৃষককেও কিছু কবিতার পংক্তি রচনা করতে বলত তবে সে ফরমায়েস মোতাবেক যেকোন বিষয়ের উপর কবিতার পংক্তি রচনা করে দিতে পারত।"[৩৪] কথিত আছে ইউরোপে কর্ডোভার স্থান ছিল মানবদেহের মস্তকের ন্যায়। ইউরোপবাসী কর্ডোভা হতেই অধিকাংশ জ্ঞান বিজ্ঞানের শিক্ষাগ্রহণ করেন। হাকাম স্পেনীয় সভ্যতাকে এমন উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করেন যে তৎকালীন অন্ধকার সময়ে ইউরোপে কর্ডোভা আলোর দিশারী হিসেবে কাজ করে।

দশ শতকের জার্মান নারী কবি গ্যান্ডার শেইমের হরৎসভিথা কর্ডোভাকে বিশ্বের আভরণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।[৩৫] তাঁর শাসনামলের বিখ্যাত পন্ডিত ছিলেন ইবনে কুতিয়াহ আবু আলী আল কালী, প্রাসাদ চিকিৎসক আবু আব্দুল্লাহ মুহম্মদ ইবনে আব্দুল উবারী, আবু বকর আল জুবাইদী, আবু ইব্রাহিম, আবু বকর ইবনে মুয়াবিয়াহ প্রমূখ বিশ্ববিখ্যাত পন্ডিত। এছাড়াও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মিসরের ইবনে শাবান, বাগদাদের ইয়াকুব আল কিন্দি প্রমুখ। খলিফার মন জয় করার জন্য অনেক পন্ডিত পুস্তক রচনা করে তা খলিফার নামে উৎসর্গ করতেন।

খলিফা হাকাম নতুন প্রকাশনাকে উৎসাহিত করার জন্য লেখক ও সংকলকদের প্রচুর পরিমান অর্থ দিতেন।[৩৬] তাঁর সময়েই মৌলিক গ্রন্থ রচনা ও অনুবাদের কাজ সমানভাবে চলতে থাকে। গ্রিক ভাষায় লিখিত দর্শনের পুস্তক সমূহ অনুবাদ করানো হয়। ইউক্লিড ও এরিস্টটল এর গ্রন্থাবলি অনুবাদের জন্য অনুবাদ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ভূ-তৃত্ত্বের উপর অনেক গ্রন্থ রচিত হয়। উদ্ভিদ বিজ্ঞান সম্পর্কে গ্রন্থ রচিত হয় এবং বৃক্ষের রোগ ও পুষ্টির ওপর পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হত। একটি কৃষি মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণা ও ঔষধের উপর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচিত হয়; তার মধ্যে অন্যতম আবুল কাসেমের অস্ত্রোপচার সম্পর্কে '*আল তাসরিফ*'। গ্রিক চিকিৎসা বিজ্ঞান স্পেনে উন্নতি লাভ করে।

সৈয়দ আমীর আলী বলেন, "হাকাম বিশ্বাস করতেন যে, জ্ঞান কখন ও অতি বিস্তারক্ষম নয় এবং দরিদ্র শ্রেণির প্রতি তাঁর উদার মনোভাবের ফলে তিনি রাজধানীতে অনেক স্কুল স্থাপন করেন; সেখানে সঙ্গতিবিহীন পিতা-মাতার সন্তানগন বিনামূল্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত হত; এমনকি বইপত্র ও সরকার হতে প্রদত্ত

[৩৪] S.P.Scott, *Op.Cit.*,P. 468.
[৩৫] এস.এম. ইমামুদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭১।
[৩৬] মাহবুবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ৯১।

হত”।[৩৭] সৈয়দ আমীর আলী আরো বলেন, “অন্যপক্ষে কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অন্যতম ছিল এবং তা কায়রোর আজহারিয়া ও বাগদাদের নিজামিয়ার সমকক্ষ ছিল”।[৩৮]

কর্ডোভার ২৭টি অবৈতনিক বিদ্যালয় ছাড়াও কর্ডোভা মসজিদের পাশ্ববর্তী এলাকায় তিনটি ও কর্ডোভার শহরতলীতে অবৈতনিক শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে চব্বিশটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এগুলোর ব্যয় নির্বাহ হত কর্ডোভা বাজারের জিন নির্মাতাদের নিকট হতে সংগৃহীত শুল্কের দ্বারা। বাগদাদের খলিফা মামুনের ন্যায় খলিফা হাকামও চিন্তাবিদ ও পন্ডিত ছিলেন বিধায় তাকে স্পেনের মামুন বলা হয়। তিনি নিজে যেমন পণ্ডিত ছিলেন; তেমনি জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিদের সমাদরও করতেন। আব্দুর রহমানের দিগ্বীজয়ী অসি সমগ্র ইউরোপে আলোড়ন সৃষ্টি করে আর তৎপুত্র হাকামের মসি আলোর প্রবাহ সৃষ্টি করে তমসাবৃত ইউরোপে নবযুগের সূচনা সৃষ্টি করে।

হাজীব আল মনসুর স্পেনে আরব সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নতি সাধন করেন। বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখার উন্নতিকল্পে সাহায্য করেন।[৩৯] তিনি তাঁর দরবার কে পণ্ডিত ও মনীষীদের দ্বারা অলংকৃত করেন। তিনি কবিদেরকে পর্যাপ্ত ভাতা ও উপঢৌকন দ্বারা খুশি রাখতেন। কাতালোনিয়ার অভিযানে তাঁর সাথে এক চল্লিশজন কবি ও ঐতিহাসিক ছিলেন। অর্থ্যাৎ জ্ঞানীগুণীদের সেবায় তিনি প্রচুর আত্মতৃপ্তি লাভ করতেন। তিনি নিজেও একজন বিদ্বান ছিলেন। তাঁর প্রাসাদে একটি বিশাল গ্রন্থাগার ছিল। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় কর্ডোভায় একটি ভাষা একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানে কবি, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণাপূর্ণ আলোচনা করতেন। মাঝে মাঝে তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে গিয়ে ছাত্র-শিক্ষকদের অভাব অভিযোগ শ্রবণ করতেন। শিক্ষাকে জনপ্রিয় করার জন্য তিনি সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। শিক্ষক, ছাত্র, কবি, সাহিত্যিকদের মাঝে পুরস্কারের ব্যবস্থা করতেন। বিখ্যাত কবি ও গ্রন্থকারেরা তাঁর নিকট থেকে বৃত্তিলাভ করতেন।

তাঁর দরবারের জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ছিলেন কবি উবাদা বিন আব্দুল্লাহ বিন মাসুমী, আবু বকরী, আব্দুল ওয়ারিস বিন সুফিয়ান, সাঈদ বিন উসমান বিন মারওয়ান আল কোরেশী, সাঈদ বিন হাসান, আল রেবাই মৌসুলী, ধর্মশাস্ত্রবিদ সাঈদ বিন রাজিন্দ্র, ভাষা একাডেমীর প্রধান ইব্রাহিম বিন নাজর, ঐতিহাসিক আব্দুল ওয়াহিদ ইবনে মা’মার, জ্যোতির্বিদ আব্দুল কাসিম মাসলামা,

---

৩৭ সৈয়দ আমীর আলী (অনুবাদঃ শেখ রেয়াজউদ্দিন আহম্মদ), *আরব জাতির ইতিহাস* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী , বর্ধমান হাউস, ১৯১০), পৃ. ৪৪৭।

৩৮ সৈয়দ আমীর আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯৩।

৩৯ এস.এম. ইমামুদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৮।

চিকিৎসক আব্দুর রহমান ইছাহাক বিন হাইসাম প্রভৃতি অন্যতম। তাঁর সুখ্যাতি শুনে ইতালি, ফ্রান্স, ইরাক, মিসর, সিরিয়া, পারস্য প্রভৃতি দেশ থেকেও বহু সুধীজন কর্ডোভায় আসতো। ঐতিহাসিক ডোজি বলেন, "আল মনসুর মুসলিম স্পেনে যে শক্তি ও সমৃদ্ধি আনেন মহামতী তৃতীয় আব্দুর রহমানের পক্ষেও তা সম্ভবপর হয়নি।"[৪০] তাঁর বিচক্ষণতার জন্য তাকে দশ শতকের 'বিসমার্ক' বলা হয়।

অপরিসীম ব্যক্তিত্ব অসাধারণ সামরিক মেধা ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হাযিব আল মনসুর তাঁর অসামান্য কীর্তির জন্য স্পেনের ইতিহাসে ভাস্কর হয়ে রয়েছেন। অতি সামান্য অবস্থা থেকে তিনি স্বীয় মেধা, দৃঢ় সংকল্প ও প্রতিভা এবং অধ্যাবসায়ের ফলে প্রধানমন্ত্রীর পদ অলংকৃত করেন। সাংগঠনিক ক্ষমতা, রণকুশলতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা, কটূনৈতিক কৌশল, প্রজা মঙ্গল প্রভৃতির জন্য তিনি খ্যাতি অর্জন করেন।[৪১] দশ-এগারো শতকে ইউরোপেও তাঁর মতো দৌর্দন্ড প্রতাপ ও সমরকুশলী নেতা ছিলনা। তৃতীয় আব্দুর রহমানের পর তিনি খ্রিস্টান ইউরোপের জন্য ছিলেন বিভীষিকা। তিনি কেন্দ্রীয় ক্ষমতা ও শাসন সুদৃঢ়রূপে পরিচালিত করতেন। তাঁর সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা-দীক্ষা, যোগাযোগ, প্রশাসন, কৃষি ব্যবস্থা, সামরিক বাহিনী, স্থাপত্য, শিল্পকলা, প্রভৃতির উন্নতি সাধিত হয়। তিনি নতুন নতুন সড়ক নির্মাণ করেন এবং গুয়াডাল কুইভার নদীর উপর সেতু নির্মাণ করেন, যাতে ব্যয় হয় ৪০,০০০ দীনার।

স্থাপত্য শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতার নিদর্শন বহন করছে কর্ডোভার মসজিদ ও মদিনাতুল জাহিরা নামের এক অনিন্দ্য সুন্দর প্রাসাদ। কর্ডোভা মসজিদটিকে সম্প্রসারিত করা হয় এবং বিভিন্ন রঙের মার্বেল দ্বারা কারুকার্য করার ফলে এটি আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠে। তৃতীয় আব্দুর রহমান কর্তৃক নির্মিত আজ জাহ্‌রা প্রাসাদের সমতুল্য মদিনাতুজ্ জাহিরা স্থাপত্য শিল্পের এক অনবদ্য সৃষ্টি। হাযিব এই প্রাসাদ হতেই শাসনকার্য পরিচালনা ও জ্ঞানী-গুণীর সমাদর করা হত। কবি, সাহিত্যিক, গায়ক, মনীষী, ধর্মবেত্তা, বিজ্ঞানীর সমাবেশ হত এই প্রাসাদে।[৪২]

মধ্যযুগে বিশেষ করে আট শতকে সমগ্র ইউরোপ যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল, তখন আইবেরীয় উপদ্বীপে জ্ঞানের শিখা প্রজ্জ্বলিত হয়। সেদিক থেকে বিচার করলে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, মুসলমানদের স্পেন বিজয় ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূর প্রসারী। স্পেন বিজয়ের ফলে শুধুমাত্র মুসলিম আধিপত্যই

---

[৪০] R. Dozy, *Op.Cit.,* P. 373-374.

[৪১] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০।

[৪২] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২১।

বিস্তার লাভ করেনি, বরং মুসলিম রাজ্য সম্প্রসারণের ফলে ইউরোপে ইসলামের ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভাব সুদূর প্রসারী হয়। কর্ডোভার মূরগণের বিস্ময়কর সংগঠন মধ্যযুগের একটি অলৌকিক ঘটনা। সমগ্র ইউরোপ যখন বর্বরোচিত অজ্ঞানতা ও দ্বন্দ্বে নিমজ্জিত তখন কর্ডোভা দুনিয়ার সামনে শিক্ষা ও সভ্যতার উজ্জ্বল ও প্রদীপ্ত মশাল বহন করে। বলাই বাহুল্য যে, প্রথম আব্দুর রহমান কর্তৃক স্থাপিত ও পরবর্তীকালে তার উত্তরাধিকারীদের দ্বারা সুসমৃদ্ধ কর্ডোভা ছিল তৎকালীন যুগের (Jewel of the world) জগৎমনি।

অনুপম সৌন্দর্যমন্ডিত ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী শহর কর্ডোভা মূর সভ্যতার প্রাণ কেন্দ্রে পরিণত হয়। বৈভব, সম্পদ, ঐশ্বর্য ও গৌরবের দিক থেকে কর্ডোভা নগরী ছিল তৎকালীন বিশ্বের সেরা শহর। S. Lanepoole বলেন, "আমরা দশ শতকের কর্ডোভার গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলোর কথা এমন সময় স্মরণ করি যখন স্যাক্সন (ইংল্যান্ড) পূর্ব পুরুষেরা কাঠের কুটিরে বাস করত এবং নোংরা পথে চলাফেরা করত। যখন ইংরেজি ভাষার প্রচলন হয়নি এবং যখন লেখা-পড়ার মতো গুণাবলি কেবল যাজক সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তখনই আমরা মূরদের অভূতপূর্ব সভ্যতার কথা কিছুটা উপলব্ধি করতে পারি।"[৪৩] অর্থ্যাৎ "When we remember that the glories of Cordova, relate to the tenth century, when our saxon ancestors dwelt in wooden hovels and trod upon dirty straw, when our language was unformed and such accomplishments as reading and writing were almost confined to a few monks. We can to some extent realise the extraordinary civilization of the moors."

এস. লেনপুল আরও বলেন যে, "যখন সমগ্র ইউরোপ বর্বরোচিত অজ্ঞতা ও অসভ্য আচার–আচরণে নিমগ্ন এবং যখন কেবল কনস্টান্টিনোপল ও ইতালির কিয়দংশে মার্জিত রুচির কিছু নির্দশন পাওয়া যায়, তখনই আইবেরীয় উপদ্বীপের বিধর্মী মূরেরা তাদের প্রতিভালোকে নিখিল বিশ্ব আলোচিত করে।"[৪৪] অর্থ্যাৎ "And when it is further recollected that all Europe was then plunged in barbarie ignorance and savage manners and that only in constantinople and some parts of Italy, were they and traces of refinement, the wonderful contrast afforded by the capital of Andalusia will be better aprecaiated."

স্পেনে উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম আব্দুর রহমান কর্ডোভাকে তার সাম্রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত করেন ৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে । পরবর্তী পর্যায়ে কর্ডোভা উমাইয়া আমিরদের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি তিলোত্তমা

---

৪৩ S.Lanepole, *Op.Cit.*, P.130.

৪৪ *Ibid,* P.130.

নগরীতে রূপান্তরিত হয়। পি.কে. হিট্টি যথার্থই বলেন যে, তৃতীয় আব্দুর রহমান (৯১২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৯২৯ খ্রিস্টাব্দ, ৯২৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৯৬১ খ্রিস্টাব্দ), দ্বিতীয় হাকাম (৯৬১ খ্রিস্টাব্দ- ৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ) এবং হাযিব আল মনসুরের (৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ-১০০২ খ্রিস্টাব্দ) সময়ে কর্ডোভা কনস্টান্টিনোপল ও বাগদাদের পাশাপাশি ইউরোপের সর্বাপেক্ষা সুসমৃদ্ধ ও জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলায় সর্বোন্নত নগরীর মর্যাদা লাভ করে। তিনি বলেন, "ইতোপূর্বে এত উন্নত এবং রাষ্ট্র এত সাফল্য অর্জন করতে পারেনি।"[৪৫] অর্থ্যাৎ "Never before was cordova so prosperous, al-Andalus so rich and the state so triumphant."

কর্ডোভা ইউরোপীয় মহাদেশের একটি সুপরিকল্পিত ও সুসমৃদ্ধ নগরী ছিল। বসফরাসের পশ্চিমে কনস্টান্টিনোপল ব্যতীত অপর কোনো নগরকে কর্ডোভার সাথে তুলনা করা যায়না। প্রস্তর নির্মিত বাসভবন, মর্মর প্রস্রবণ, প্রস্ফুটিত পুস্পোদ্যান, বড় বড় পান্থশালা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, বিশালাকার প্রাসাদসমূহ; যেমন- আল জাহিরা, আজ জাহ্‌রা, জামে মসজিদসহ অসংখ্য মসজিদ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সড়ক, সেতু কর্ডোভাকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগরী হিসেবে মর্যাদা লাভ করে।

এই তিলোত্তমা নগরীতে ৮৪০০০ বিপণী, ৩৮০০ মসজিদ, ৯০০ স্নানাগার ছিল। এগুলো জনসাধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় ও ধর্মীয় প্রয়োজন মেটাত। উল্লেখ্য যে, মধ্যযুগে স্নানকে ইউরোপ যখন কুসংস্কার হিসেবে চিহ্নিত করে তখন একমাত্র কর্ডোভাতে ৯০০ স্নানাগার নির্মিত হয়। কথিত আছে যে, অশচি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যে, একজন সন্ন্যাসিনী সুদীর্ঘ আট বছর পর্যন্ত কোনো স্নান বা দেহের কোনো অংশ ধৌত না করে কেবল আঙ্গুলের অগ্রভাগ পানি দিয়ে ধুয়ে বাইবেল পাঠের জন্য প্রয়োজনীয় পবিত্রতা রক্ষা করেন।

এছাড়া চিকিৎসা ব্যবস্থা এতই উন্নত ছিল যে একমাত্র কর্ডোভায় ৫০টি হাসপাতাল ছিল। এছাড়া গ্রানাডা, সেভিল এবং অন্যান্য শহরেও হাসপাতাল নির্মিত হয়। কর্ডোভায় মূর সভ্যতার অসংখ্য দর্শন পর্যটকদের আকর্ষিত করে। P. K. Hitti বলেন, "এক লক্ষ ত্রিশ হাজার ঘরবাড়ি, একুশটি শহরতলী, সত্তরটি পাঠাগার এবং অসংখ্য বিপণী, মসজিদ এবং প্রাসাদ সম্বলিত কর্ডোভা নগরী আন্তর্জাতিক খ্যাতিই অর্জন করেনি, বরং পর্যটকদের মনে একই সাথে প্রশংসা ও ভীতির সঞ্চার করে।"[৪৬] অর্থ্যাৎ "With its one hundred and thirty thousand houses, twenty-one suburbs, seventy

---

[৪৫] P.K.Hitti, *Op.Cit.*, P.525.

[৪৬] *Ibid*, P.526

libraries and numerous book shops, mosques and palace it acquired international fame and inspired awe and admiration in the hearts of the travellers.”

সুচিতা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে মূরগণ তৎকালীন ইউরোপীয়দের তুলনায় অনেক উন্নত জীবনযাত্রা নির্বাহ করত। মূরদের নগরীগুলো ছিল সুপরিকল্পিত, প্রশস্ত রাস্তা ছিল, যাতে শকট ও যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন না ঘটে। রাস্তায় ভিড় হতনা এবং যানবাহন ও পথচারীদের নিয়ন্ত্রণের জন্য ট্রাফিক পুলিশের ব্যবস্থা ছিল। প্রত্যেক নগর সুস্বাস্থ্যকর ছিল এবং পয়:প্রণালীর ব্যবস্থা ছিল। স্বাস্থ্যরক্ষার সকল প্রকার আইন কানুন মেনে চলা হত এবং পরিষ্কার ও নিখুঁত নর্দমার ব্যবস্থা থাকায় জনজীবন বিপর্যস্ত হত না। ভ্যালেনসিয়ার কয়েকটি ভূগর্ভস্থ নর্দমা এত বৃহৎ ছিল যে তার মধ্যে অনায়াসে গরুর গাড়ি প্রবেশ করতে পারত। আবর্জনা নিয়মিত পরিষ্কার করা হত।

ড্রেপার কর্ডোভার সাথে গ্রেট ব্রিটেনের তুলনা করে বলেছেন যে, সমগ্র গ্রেট ব্রিটেনে যেখানে অর্ধকোটির বাস ছিল সেখানে একমাত্র কর্ডোভা শহরে দু'লক্ষ লোকের বসবাস ছিল। তুলনামুলকভাবে মূরগন ব্রিটেনবাসীদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত স্বাচ্ছন্দ্যময়, আনন্দ ও বৈভবের সাথে বসবাস করত। ইউরোপের অন্যান্য রাজধানী শহরে যখন স্বাস্থ্য রক্ষার কোনো ব্যবস্থা ছিলনা তখন কর্ডোভায় সুশোভিত, সুশৃঙ্খলিত ও পরিপাটির সাথে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা যেত। ড্রেপার বলেন যে, ইউরোপের লোকেরা খুবই নিম্নমানের জীবনযাপন করত, উন্নত মানের গৃহ ছিলনা, মটর, কলাই, উদ্ভিদের মূল ও গাছের ছাল খেত। খড়ের গাদায় শুয়ে কাঠের টুকরায় মাথা রেখে রাত্রি যাপন করত। বিছানাপত্র ও কাপড় চোপড়ে ছারপোকা চরে বেড়াত। রাস্তাঘাট নিরাপদ ছিল না।

স্কটের ভাষায়, “The streets were kept in a state of cleanliness unknown to the best regulated municipalities of modern Europe.”[৪৭] কর্ডোভার সামগ্রিক সমৃদ্ধি নির্ভর করেছিল খলিফাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন অট্টালিকা নির্মাণে। এ সমস্ত প্রাসাদ বাসভবন, স্নানাগার, মসজিদ, মিনার সুসভ্য জাতি হিসেবে মূরদের খ্যাতি সম্প্রসারিত করে। রাজ প্রাসাদ মহাড়ম্বরে সুশোভিত থাকত। ফ্রান্স, র্জামানি ও ইংল্যান্ডের রাজ প্রসাদের তুলনায় মূরদের স্থাপত্যিক সৌন্দর্য ছিল বিস্ময়কর। খ্রিস্টান বাসগৃহগুলো ছিল খুবই স্বল্প পরিসর এবং তাতে মাত্র একটি ছিদ্র থাকত ছাদে এবং এর ফলে বাড়িঘরগুলো হত অন্ধকারাচ্ছন্ন। ড্রেপার বলেন, “Those sovereigns (Moors) might lok down with supercillious contempt on the dwellings of the rulers of Germany. France and England, which were scarcely better than stable chimneyless,

---

[৪৭] S.P.Scott, *Op.Cit.*, P.304.

windowless and with a hole in the roof for the smoke to escape, like the wigwams of certain Indians."[৪৮]

কর্ডোভা ছিল তৎকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। খলিফার দরবার ছিল জাঁকজমকপূর্ণ, মার্জিত, রুচিসম্পন্ন ও বিলাসবহুল আসবাবপত্র দ্বারা সুসজ্জিত। Myers বলেন, "The court of the Caliphs prsented in culture and Luxury a striking contrast to the rude and barbarous courts of the kings and princes of western christendom" অর্থ্যাৎ " পশ্চিমা খ্রিস্টান জগতের অসভ্য ও বর্বরোচিত দরবারের তুলনায় খলিফাদের রাজদরবার ছিল সুসভ্য, সুরুচিপূর্ণ ও বিলাস দ্রব্যাদি দ্বারা ভরপুর।"[৪৯]

ইউরোপের সাধারণ গৃহগুলো যেখানে নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী কাঠ, খড় ইত্যাদি দিয়ে নির্মিত হত সেখানে মূরদের বাসভবন গুলো ইট ও পাথরের তৈরি হত। বাইরে নিরাড়ম্বর হলেও ভিতরে কারুকার্য শোভিত থাকত এবং সমস্ত সৌন্দর্যমন্ডিত ভবনগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল উদ্যান। বেশির ভাগ গৃহের সম্মুখে বিভিন্ন ধরণের ফুলের বাগান এবং সেই সাথে পাথরের ঝর্ণা থাকত।

সূর্যের প্রখর তাপ থেকে বাঁচার জন্য মূরেরা গ্রীষ্মকালে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি পর্যন্ত চাঁদোয়া টাঙ্গিয়ে রাখত। রাজা, সভাসদ ও রাজকর্মচারীদের বহু সংখ্যক প্রাসাদ ছাড়াও সাধারণ লোকদের এক লক্ষ তের হাজার অট্টালিকা ছিল। রাতে রাস্তা আলোকিত করত রাস্তার পাশের ঘরবাড়ি থেকে আসা প্রদীপের আলো। ড্রেপার বলেন, "অসংখ্য বাতির আলোকে একজন মানুষ সুর্যাস্তের পর একাদিক্রমে দশ মাইল পথ সরল রেখার মতো হেঁটে যেতে পারত। এবং এর সাতশত বছর পরেও লন্ডনে কোনো সরকারি বাতি ছিল না।"[৫০] অর্থ্যাৎ "After sunset, a man might walk through it in a straight line for ten miles by the light of the public lamps; seven hundred years after this time there was not so much as one public lamp in london." একথার প্রতিধ্বনি করে P. K. Hitti বলেন, "প্যারিসে বহু শতক পরেও যে কেউ বর্ষাকালে তার দরজার বাইরে গেলে তার পা হাঁটু পর্যন্ত কর্দমাক্ত হয়ে যেত।"[৫১]

নিরাপত্তার জন্য কর্ডোভা নগরীকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। এর মধ্যে দুভাগে বসবাস করত খ্রিস্টান ও ইহুদি সম্প্রদায়। এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় যেতে সাতটি বড় ফটক পার হতে

---

[৪৮] John William Draper, *Intelectual Development in Europe*, Vol.II (London: G.Bell and Son, 1910), P.31.

[৪৯] Philip Van ness Myers, *Medival and Modern History* (Boston: Ginnand Co.,1902), P.34.

[৫০] Drapper, *Op.Cit.*, P.31.

[৫১] P.K.Hitti, *Op.Cit.*, P.526.

হত। প্রত্যেকটি ফটক থেকে একটি বড় রাস্তা বের হয়ে গেছে। এ সমস্ত রাস্তা দিয়ে মালাগা, মেরিয়া, টলেডো, অস্টোর্গাট্যালনভেরা, বাদাজোজ, সারাগোসা প্রভৃতি সীমান্ত শহরে যাওয়া যেত। আল কাজার রাজ প্রাসাদ থেকে প্রশস্ত একটি রাজপথ গোয়াডাল কুইভার নদীর উপর নির্মিত হয়। এর দৈর্ঘ্য বারশত ফুট এবং প্রস্থ ত্রিশ ফুট। এ সুপরিকল্পিত সেতুটি মূরদের নির্মাণ কৌশলের অপূর্ব দক্ষতার স্বাক্ষর দেয়। পরবর্তী কালে এটি পুন:নির্মিত হয়েছে। হিট্টি বলেন, "কর্ডোভা ছিল তৎকালীন সময়ের একটি আকর্ষণীয় রাজনৈতিক প্রাণকেন্দ্র। তৃতীয় আব্দুর রহমানের দরবার ছিল জৌলুষপূর্ণ।"[৫২] ঐশ্বর্য, বৈভব, প্রাচুর্য ও আড়ম্বর রাজদরবারের প্রতিটি অনুষ্ঠানকে হৃদয়গ্রাহী করে রাখত।

S.P Scott বলেন, "জার্মানির অরণ্য ও পিরেনীজ পর্বতের বর্বর জাতি ঘৃণ্য অবিশ্বাসীদের সভ্যতা এবং সমৃদ্ধির যে চিত্র লাভ করে তা দেখে তারা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে।"[৫৩] অর্থ্যাৎ "The gorgeous picture imparted to the bewildered barbarians of the German forests and Pyrenean mountains a startling impression of the civilization and resources of the destested infidles." কর্ডোভা জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা, শিক্ষা-দীক্ষা, সঙ্গীত, শিল্পকলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমানের কাব্যানুরাগ সর্বজনবিদিত ছিল। তিনি মজলিশে বসে জ্ঞানীগুণীদের সাথে অবসর সময় কাটাতেন। P. K Hitti বলেন, লিঁও, নাভোরে অথবা বার্সেলোনার শাসকগণ যখন শল্য চিকিৎসক, স্থপতি, শ্রেষ্ঠ গায়ক অথবা পোশাক প্রস্তুতকারীর প্রয়োজন হত তখন তারা কর্ডোভায় দূত পাঠাতেন। হিট্টির ভাষায়, "The fame of the moslem capital penetrated distant Germany where saxon nun styled it, Jewel of the World."[৫৪]

মূর সভ্যতার প্রতীক তিলোত্তমা নগরী কর্ডোভা ব্যতিত মুসলিম যুগে স্পেনের বিভিন্ন প্রাদেশিক রাজধানী এবং পরবর্তীকালে স্বাধীন রাজ্যের রাজধানী গুলোতে সমভাবে ঐশ্বর্যমন্ডিত ছিল। স্থাপত্যে ও শিক্ষা সভ্যতায় প্রাদেশিক রাজধানীগুলো কর্ডোভার নিতান্ত পশ্চাৎবর্তী ছিলনা। কর্ডোভার টলেডো বনু জুনুনু (১০৩২ খ্রিস্টাব্দ ১০৮৫ খ্রিস্টাব্দ) গোষ্ঠীর রাজত্বকালে খুবই সমৃদ্ধশালী নগরী ছিল। এই বংশের আমীর কর্তৃক নির্মিত সৌধের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল ঘন্টা প্রাসাদ। অতুলনীয় সৌন্দর্যবোধ ও স্থাপত্যিক চাকচিক্যের দ্বারা এ সমস্ত সুরম্য প্রাসাদ সুশোভিত করা হত। বেশির ভাগ ইমারতে পাথর ব্যবহৃত হত। ঝর্ণা সৃষ্টি করে পরিবেশ শীতল রাখা হত। ঝর্ণার সাথে কখনও কখনও

---

৫২ *Ibid*, P.595.

৫৩ S.P.Scott, *Op.Cit.*, P.629.

৫৪ P.K.Hitti, *Op.Cit.*, P.527.

জল ঘড়ি স্থাপন করা হত। টলেডোয় স্থাপিত জলঘড়ি খুবই জনপ্রিয় ছিল। P. K. Hitti বলেন, “বিখ্যাত প্রকৌশলী ও জ্যোতির্বিদ আল-জারকালি এ ধরনের জল ঘড়ির আবিষ্কারক। সৌখিন মূরেরা কর্ডোভা ও অন্যান্য শহরের মতো টলেডোতে প্রমোদোদ্যান স্থাপন করেন। এই সমস্ত বিলাস বহুল উদ্যানের মধ্যভাগে থাকত একটি প্রমোদ ভবন, যার ছাদ ও দেয়াল রঙ্গীন কাঠ ও সোনা রূপার প্রলেপে অলঙ্কৃত ছিল। প্রচন্ড গরমে ভূগর্ভস্থ একটি পথ দিয়ে আমীর এই প্রমোদভবনে আসতেন এবং স্নিগ্ধ ও শীতল পরিবেশে তিনি অবসর বিনোদন করতেন।”[৫৫]

কর্ডোভা ও টলেডোর মতো মুসলিম স্পেনের অন্যতম প্রধান আকর্ষণীয় শহর ছিল সেভিল। শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার অন্যতম সভ্য ভূমি হিসেবে সেভিল পাশ্চাত্য জগতে বিশেষ আকর্ষণ লাভ করে। এই শহরের গৌরবময় ঐতিহ্যের সূত্রপাত হয় আল মুয়াহ্হিদুনদের রাজত্বকালে। আল মুয়াহ্হিদুন শাসন ১১৪৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২৬৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কায়েম ছিল। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল মুমীন বিন আলী। স্পেন ও উত্তর আফ্রিকার অধিপতি আব্দুল মুমিনের সুযোগ্য পুত্র আবু ইউসুফ ইয়াকুব আল মনসুর (১১৮১ খ্রিস্টাব্দ-১১৯১ খ্রিস্টাব্দ) সিংহাসন লাভ করে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা, শিল্পকলা ও স্থাপত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখেন। তাঁর আমলে সেভিল একটি সুরম্য সুসজ্জিত ও সমৃদ্ধশালী নগরীতে পরিণত হয়। তিনি স্পেনে অনেক সেতু, স্নানাগার, প্রাসাদ, মিনার, মসজিদ নির্মাণ করে তাঁর অসামান্য কীর্তির স্বাক্ষর রেখেছেন।

আল-মনসুরের বদ্যান্যতা, পৃষ্ঠপোষকতা ও অসামান্য প্রতিভার প্রমাণ পাওয়া যায় সেভিলের অতুলনীয় মিনার বা ‘Giralda’ নির্মাণে। মিনার সম্বলিত এই মসজিদটি স্থাপত্যরীতির অনুপম নিদর্শন। আল মনসুর কর্তৃক নির্মিত জিরাল্ডা ছিল তৎকালীন সময়ের স্থাপত্যিক বিষয়। P. K. Hitti বলেন, “The exisiting architectural monuments of Al-Mansur are among the most remarkable in either Morocco or Spain. In Ceville to which the Muwahids transferred their capital in 1170, his accession was marked by teh erection of the tower, now known as the Giralda in connection with the great Mosque.”[৫৬]

জিরাল্ডা মিনার এক সময় সৌন্দর্য ও অঙ্গ-সৌষ্ঠবের অতুলনীয় আদর্শ বলে বিবেচিত হত। আল মনসুর রোমান পয়:প্রণালীর সংস্কার ও পরিবর্ধন করেন। আজও তা সেভিলের নাগরিকদের বিশুদ্ধ জল সরবরাহ করে থাকে। ইমারত সমূহের বিশালতা প্রসঙ্গে S. P. Scott বলেন, “এগুলোর

---

[৫৫] *Ibid*, P.548-49.
[৫৬] *Ibid*, P.548.

বিশালতা আধুনিক প্রকৌশলের বিস্ময় বলা চলে।"[৫৭] ("Their stupendous dimensions are now the wonder of the modern engineer.") জিরাল্ডা শুধুমাত্র মিনার ছিল না, মানমন্দির হিসেবেও ব্যবহৃত হত। বলাই বাহুল্য যে, মুয়াহিদুনদের আমলে সেভিল মূর সভ্যতার একটি আকর্ষণীয় প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। জ্ঞান চর্চা সঙ্গীত, স্থাপত্য, বিজ্ঞান ও চারু ও কারুকলার অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে সেভিল ইউরোপের বিশেষ পরিচিতি ছিল।

স্পেনের দক্ষিণে ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত আল মেরিয়া ছিল মূল সভ্যতার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। আল-মেরিয়ার শাসক গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় এই নগরী সভ্যতার পাদপীঠে পরিণত হয়। উমর বিন আব্বাস অত্যন্ত শিল্পমনা ছিলেন এবং তাঁর প্রচেষ্টায় এই নগরী শিল্পী, সাহিত্যিক, দার্শনিক ও সঙ্গীত বিশারদদের আকর্ষণীয় কেন্দ্রে পরিণত হয়। ইবনে আব্বাস ছিলেন কবি ও সাহিত্যিক এবং তাঁর রাজদরবার জ্ঞানী গুণীদের দ্বারা সমাদৃত ছিল। কথিত আছে তিনি সঙ্গীত প্রেমিক ছিলেন এবং চিত্তবিনোদনের জন্য পাঁচশ গায়িকা তাঁর দরবারকে মর্যাদা দান করত। কথিত আছে যে, তাঁর গ্রন্থাগারে চারলক্ষ গ্রন্থ ছিল এবং তিনি অধিক সময়ে জ্ঞান অর্জনে ব্যস্ত থাকতেন।

আল মেরিয়ার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল অসংখ্য কল-কারখানা, সেখানে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কারিগর কাজ করত। বস্ত্র শিল্পের প্রভূত উন্নতি হয়। রেশম, পশম, কার্পাস এমনকি স্পেনের জরির উৎকৃষ্টমানের কাপড় তৈরি হত আল মেরিয়ায়। আল মেরিয়ার কুম্ভকারের তৈরি মৃৎপাত্র ছিল খুবই উজ্জ্বল ও উন্নতমানের। এ সমস্ত মৃৎপাত্র ধাতব পাত্রের মতো চকচক করত। জনগোষ্ঠী সুরক্ষিত প্রাচীর বেষ্টিত নগরীতে বসবাস করত। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা পৃথক পৃথক ভাবে বসবাস করত। মুসলিম, খ্রিস্টান ও ইহুদি সম্প্রদায়েরর মধ্যে সদ্ভাব ছিল। আল-মোরিয়ার প্রধান আকর্ষণ ছিল 'অতারা জানা' বা জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতের জন্য নির্মিত ডক। এর সাথেই ছিল অস্ত্রাগার। আঠার হাজার বর্গফুটের বিশাল ডকটিতে অসংখ্য শ্রমিক কাজ করত। এর প্রবেশ পথ ছিল খিলানযুক্ত তোরণ। এই ডকে জাহাজ নির্মাণের সকল প্রকার সরঞ্জাম মওজুদ থাকত। অস্ত্র শস্ত্র সম্বলিত অস্ত্রাগার যুদ্ধের সমস্ত প্রয়োজন মিটাত।

গ্রানাডাকে স্পেনের মুসলিম ইতিহাসের সর্বশেষ ও সর্বাপেক্ষা বিয়োগান্ত নাটকের পরিসমাপ্তি বলা যেতে পারে। এই শহরটি শুধু সমৃদ্ধই ছিল না। স্পেনের মুসলিম শাসন কায়েম রাখার সর্বশেষ প্রচেষ্টাও এখান থেকে হয়েছিল। মূলত গ্রানাডাই ছিল মূর সভ্যতার সর্বশেষ আশ্রয় (last post)। কিন্তু

---

[৫৭] S.P.Scott, *Op.Cit.*, P.301.

নাসির (১২৩২ খ্রিস্টাব্দ-১৪৯২ খ্রিস্টাব্দ) পরিবার আড়াই শত বছর ধরে স্পেনে মুসলিম রাজত্বকে অক্ষুন্নই রাখেননি বরং মূর সভ্যতা ও কৃষ্টির প্রায় নিষ্প্রভ প্রদীপ জালিয়ে রেখেছিলেন। অসামান্য শৌর্য, বৈভব, গৌরব ও সমৃদ্ধির সাথে শাসনকালে তারা গ্রানাডাকে একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পকলা, জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের একটি প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। গ্রানাডার প্রাচুর্য ও বৈভব দেখে সমগ্র স্পেন থেকে অবিভক্ত প্রকৌশলী, দক্ষশিল্পী ও কারিগর, বুদ্ধিজীবী পন্ডিতবর্গ ইবনে আহমারের দরবারে ছুটে আসেন। পি.কে. হিট্টি বলেন, "প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে গ্রানাডা নগরী অবস্থিত ছিল এবং এর গৌরব ও সুনাম জগৎব্যাপী বিস্তার লাভ করে।"[৫৮]

স্থাপত্যকলার দিক বিচার করলে অতুলনীয় প্রাসাদ আল হামরা ইউরোপের যে কোনো প্রাসাদের তুলনায় স্থাপত্যিক সৌকর্য ও অলঙ্কার বৈশিষ্ট্যে শ্রেষ্ঠ ছিল। পি.কে.হিট্টি বলেন, "এথেন্সের এ্যাক্রোপলিসের মতো পার্শ্ববর্তী উপত্যকায় প্রহরীর মতো দন্ডায়মান অসাধারণভাবে অলঙ্কৃত এবং অ্যারাবেস্ক নক্শা দ্বারা সুশোভিত এই দূর্গ প্রাসাদটি এখনও সার্বজনীন সুখ্যাতির দাবিদার।"[৫৯] ("Standing sentinel over the surrounding plain like the Acropolis of Athens, this citadel palace with its superb decorations and arabesque moulding. Still excites universal admiration.") আর্নেস্ট কুহনেল বলেন, "মূর প্রাসাদের প্রাচীনতম দৃষ্টান্ত হচ্ছে ১৪ শতকের নির্মিত বিশ্ববিখ্যাত আল হামরা । আল-হামরা প্রাসাদ স্পেনের মুসলিম বিদ্বেষী আরাগনের গোঁড়া খ্রিস্টান রাজা ফার্ডিনান্ড ও ক্যাসটাইলের রাণী ইসাবেলা কর্তৃক বিধ্বস্ত হয়। এতদসত্ত্বেও আল হামরা প্রাসাদের সৌন্দর্য অম্লান রয়েছে।"[৬০]

মূর সভ্যতার সর্বশেষ প্রদীপের শিখা গ্রানাডায় এমনভাবে সুসজ্জিত ও প্রজ্জ্বলিত ছিল যে ইউরোপের বর্বর সমাজে হিংসার উদ্রেক করত। নগরের রাস্তাঘাট সুসজ্জিত ও পরিচ্ছন্ন থাকত। বিভিন্ন ধরনের প্রচুর ফল পাওয়া যেত এবং বিপণীগুলো দ্রব্য সম্ভারে সজ্জিত ছিল। উদ্ভিদবিদ্যার চর্চার ব্যাপকতার সাথে সাথে উদ্যান কর্ষণবিদ্যা (horticulture) এর প্রসারতা হয়। জলসেচের ব্যবস্থা ছিল এবং পয়:প্রণালীর ব্যবহার সুদূর প্রসারী হয়।

সুচিতার নিদর্শন স্বরূপ অসংখ্য স্নানাগার নির্মিত হয়। পাথরের তৈরি এ সমস্ত স্নানাগার খুবই জনপ্রিয় মনে করত। মূরেরা হাম্মাম নির্মাণে ও তার সৌন্দর্য বিধান ধর্মের অঙ্গ বলে মনে করত। মূর সভ্যতার

---

[৫৮] P.K.Hitti, *Op.Cit.*, P.549-51.

[৫৯] *Ibid*, P.550.

[৬০] আর্নেস্ট কুহনেল, *ইসলামী শিল্পকলা ও স্থাপত্য*, মূল: *Islamic Art and Architecture*, By E. Kuhnel (New York: Cornell University Press, 1967), বঙ্গানুবাদ: বুলবন উসমান, চট্টগ্রাম, ১৯৭৮, পৃ. ১২০।

একটি বিশেষ অবদান ছিল রোমানদের পর তাঁরাই শীত ঋতুতে স্নানাগারে পানি গরম করার পদ্ধতি জানত। এই পদ্ধতিকে বলে hypocaust বা মাটির নলের সাহায্যে উষ্ণপানি স্নানাগারে পাঠিয়ে দেয়া। অপরদিকে প্রচন্ড গরমকালে বাষ্প নি:সারী নল দিয়ে গরম বাতাস বের করে বাসভবন ঠান্ডা রাখা হত। এ ধরনের শীতাতপ নিয়ন্ত্রন তৎকালীন সময়ে বিস্ময়কর। গ্রানাডা শহর সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে তিন হাজার ফুট উঁচুতে অবস্থিত। সিয়েরা নেভাদা উপত্যকায় অবস্থিত গ্রানাডার আবহাওয়া ছিল স্বাস্থ্যের জন্য অনুকূল।

আল হামরা প্রাসাদ ছাড়া আরও সাতটি উপশহর ছিল। প্রত্যেক শহরে মসজিদ, মিনার, উদ্যান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান; পয়:প্রণালী চৌবাচ্চা ও ঝর্ণা ছিল।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এই প্রতীয়মান হয় যে, স্পেনে মুসলিম সভ্যতার উন্মেষে আমীরদের ভূমিকা ছিল ব্যাপক। আমীর প্রথম আব্দুর রহমান থেকে শুর করে প্রায় প্রতিটি শাসক বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ড চর্চায় ব্যাপক অবদান রেখেছেন। আমীর প্রথম আব্দুর রহমান অরাজকতাপূর্ণ স্পেনে একটি স্বাধীন বংশ স্থাপন করেও তিনি জ্ঞানবিজ্ঞানের উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এছাড়া আমীর প্রথম হিশাম, প্রথম হাকাম ও দ্বিতীয় আব্দুর রহমান অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা দমন করে, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করে, জ্ঞান বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা করে স্পেনের বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছেন। খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহামনের সময় শিক্ষা সভ্যতায় স্পেনে নবজাগরণের সূচনা হয়। এ সময় স্পেনের সর্বত্র স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বহু জ্ঞানী, গুণী ও পণ্ডিত ব্যক্তির সমাগম হয়। এ সময়ই কর্ডোভা ইউরোপের বাতিঘর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। খলিফা দ্বিতীয় হাকামের রাজত্বকালকে স্পেনে মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ বল হয়। তিনি নিজে যেমন পণ্ডিত ছিলেন তেমনি পণ্ডিত ব্যক্তিদের সমাদর করতেন। তাঁর সময়ে শিক্ষা সংস্কৃতি, সভ্যতার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। এজন্য তাঁর রাজত্বকালকে স্পেনের ইতিহাসে অগাস্টান যুগ বলা হয়। তিনি নিজে যেমন পণ্ডিত ছিলেন, তেমনি জ্ঞানবিজ্ঞানে উৎসাহ দিতেন। স্পেনের শাসকবৃন্দের পৃষ্ঠপোষকতা না থাকলে বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডে তৎকালীন বিশ্বে সভ্যতা ও সংস্কৃতির চরমশিখরে আরোহন করা অকল্পণীয় ছিল।

চতুর্থ অধ্যায়
বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাহিত্য কর্মের গবেষণা ও চর্চায় মধ্যযুগের স্পেনের মুসলমানগণ

বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাহিত্যকর্মের গবেষণা ও চর্চায় মধ্যযুগের স্পেনের মুসলমানগণ ছিল সমগ্র বিশ্বের জ্ঞানলোকের দিশারী। স্পেনের মুসলমানদের নিকট থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ইউরোপে গৃহীত হয় এবং ইউরোপে রেনেসাঁর সৃষ্টি হয়। তৎকালীন সময় কর্ডোভা, মালাগা, সেভিল ও গ্রানাডার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিশ্বখ্যাত। বিশেষ করে কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। এ কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথমে একটি জামে মসজিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন উমাইয়া আমীর প্রথম আব্দুর রহমান। ৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে প্রধান গির্জার ২য় অংশ ১,০০,০০০ দীনারে খরিদ করেন। গির্জার প্রথম অংশ পূর্ববর্তী মুসলমানগণ মসজিদে পরিণত করেছিলেন ৭৪৮ খ্রিস্টাব্দে এবং ক্ষতিপূরণ হিসেবে ধ্বংসপ্রাপ্ত কয়েকটি পুরনো গির্জা পুন:নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

অনুপম সৌন্দর্যে অদ্বিতীয় কর্ডোভা মসজিদের জন্য প্রথম আব্দুর রহমান ৮০,০০০ দীনার ব্যয় করেন। এ মসজিদ সংলগ্ন একটি মাদ্রাসা নির্মাণ করা হয়েছিল, সেটি কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। খলিফা দ্বিতীয় হাকামের সময় এ বিশ্ববিদ্যালয়টি বিশ্বের শিক্ষায়তনের মধ্যে খ্যাতির শীর্ষে আরোহন করেছিল। এটি কায়রোর আল আজহার, বাগদাদের নিযামিয়া মাদ্রাসা অপেক্ষা উন্নত বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়েছিল। কেবলমাত্র স্পেনের জ্ঞান পিপাসু শিক্ষার্থীরাই এখানে জ্ঞান লাভ করত তা নয়, বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের শিক্ষার্থীদের মিলনকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়। যে মসজিদে বিশ্ববিদ্যালয়টি অবস্থিত ছিল আল হাকাম তার পরিসর বৃদ্ধি করেন এবং এটিকে অলংকৃত করে এর শোভা বর্ধন করেন। সীসার পাইপের সাহায্যে শিক্ষায়তনের পানি সরবরাহের সুব্যবস্থা করা হয় এবং বাইজান্টাইন শিল্পীদের দ্বারা মোজাইক পাথর দিয়ে এর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ২,৬১,৫৩৭ দীনার ব্যয় করা হয়।[১]

---

১ পি.কে.হিট্টি, *আরব জাতির ইতিহাস* (অনুবাদ: জয়ন্ত সিং, সেঁজুতি ভট্টাচার্য, সৌমিত্র সেন গুপ্ত) (কলকাতা: মল্লিক ব্রার্দাস, ২০০৫), পৃ. ৫১৮।

প্রাচ্যের দেশসমূহ হতে খ্যাতনামা পন্ডিতদের আমন্ত্রণ জানানো হত এ বিশ্ববিদ্যালয়ে। জ্ঞানী-গুণী অধ্যাপকদের উচ্চহারে বেতন প্রদান করা হত। অধ্যাপকদের বেতনের জন্য একটি পৃথক তহবিল গঠন করা হয়েছিল। এছাড়াও তাদেরকে বেতনের বিনিময়ে জায়গীর প্রদান করা হত।[২]

এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের মধ্যে ছিলেন ঐতিহাসিক ইবনে আল কুতাইয়াহ; যিনি ব্যাকরণ ও ইতিহাস শিক্ষাদান করতেন। আবু আলী আল কালী (মৃ. ৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ) যিনি ভাষা, কবিতা ও উপাখ্যানবিদ ছিলেন। তিনি শিক্ষা দিতেন প্রবাদ বাক্য, ভাষা, সাহিত্য, কাব্য ও প্রাচীন আরবদের কৌতুহলোদ্দীপক জীবন কাহিনী। তাঁর রচিত *আমালী* গ্রন্থটি আরবভূখন্ডে এখনো পঠিত হয়।[৩] ফিকহ্ শাস্ত্রবিদ আবু ইব্রাহিম ও কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। আবু বকর ইবনে মুয়াবিয়া হাদিস, ধর্মতত্ত্ব, কোরআনী আইন, শিষ্টাচার ও প্রাচ্য বিজ্ঞানের উপর বক্তৃতা দান করতেন। মুনযির ইবনে সাঈদ ছিলেন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন স্বনামধন্য প্রথিতযশা অধ্যাপক। খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমান আল নাসিরের উদ্যোগে বাইজান্টাইন দূতদের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে মুনসির ইবনে সাঈদ স্বত:স্ফূর্তভাবে এক অসাধারণ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তার এ বক্তৃতাটি আল মাক্কারী এর বইতে ছন্দাবদ্ধ গদ্যে লিখিত রয়েছে। চিকিৎসক আল জাহরাভী ও ইবনে যুহরী প্রখ্যাত বিদ্বান ও আরবি অভিধান *কিতাবুল আইন* প্রণেতা মুহম্মদ ইবনে আবু বকর আল জুবাইদী কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানের আলো প্রজ্জ্বলিত করেন।

আল কুরআনের ব্যাখ্যা, ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, আরবি ব্যাকরণ, কাব্য ও অভিধান, ইতিহাস ও ভূগোলের উপর ভিত্তি করেই উচ্চ শিক্ষা গড়ে উঠেছিল তৎকালীন মুসলিম স্পেনে।[৪] কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য, ইতিহাস, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন, ধর্ম ও চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্পর্কে পাঠদান করা হত এবং এখানে গভীর গবেষণা পূর্ণ উচ্চশাস্ত্রের আলোচনা করা হতো। কর্ডোভা নগরীর বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের পন্ডিত ও মনীষীদের সাধনা ও গবেষণাগারে পরিণত হয়। তারা সৃজনশীল প্রতিভার ফসলে সমৃদ্ধ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি শাখা। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০০০ এর বেশি শিক্ষার্থী পড়াশোনা করত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ পত্র শিক্ষা জগতে লোভনীয় পদের সুযোগ করে দিত।[৫]

গ্রানাডার অধিপতিগণ জ্ঞান ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং সাধারণ হিতকরী জমকালো, কার্যসম্পাদনে কর্ডোভার খলিফাদের সাথে প্রতিযোগিতা করতেন। তাঁদের উদার ও সু-শাসনে গ্রানাডা প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, খ্যাতনামা কবি, গুণান্বিত বীর পুরুষ প্রমুখ প্রতি বিষয়ে আদর্শ স্থানীয় পুরুষদের

---

২ পি.কে.হিট্টি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১৮।

৩ পি.কে.হিট্টি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১৯।

৪ খন্দকার মাশহুদ-উল-হাছান, *আরবের ইতিহাস* (ঢাকা: জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, বাংলা বাজার, ২০০৩), পৃ. ৪১৯।

৫ সৈয়দ আমীর আলী (অনু: শেখ রেয়াজউদ্দিন আহম্মদ), *আরব জাতির ইতিহাস* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, বর্ধমান হাউস, ১৯১০), পৃ. ৪৪৬।

আবাসস্থল ও জন্মস্থানে পরিণত হয়। গ্রানাডার রমনীগণ ও সাহিত্যে কম খ্যাতি অর্জন করেননি। আবু বকর আল-গাসসানীর কন্যা নাজহুন সু-কবি এবং ইতিহাস ও সাহিত্যে পারদর্শী ছিলেন। তিনি ষষ্ঠ হিজরি শতকের শেষভাগে প্রসিদ্ধ লাভ করেন। যয়নব ও হামদা পুস্তক বিক্রেতা যিয়াদের কন্যা ছিলেন। তাঁরা গ্রানাডার সন্নিকটে ওয়াদিউল হামা নামক স্থানে বাস করতেন।[৬]

ইবনুল আব্বার তাঁর তুহুফাতুল কাদীম গ্রন্থে বলেন, তাঁরা উভয়েই শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল শাখায় বুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। তাঁরা সুন্দরী, ধনবতী, শিষ্ঠাচারিনী ও বিনয়নী ছিলেন। তাঁদের জ্ঞানানুরাগ তাঁদেরকে পণ্ডিত লোকদের সংস্পর্শে নিয়ে আসে। তাঁরা এদের সাথে ধৈর্য্য ও মর্যাদার সাথে পূর্ণ সমতার ভিত্তিতে মেলামেশা করতেন। কেউই তাঁদের সম্পর্কে শালীনতার নীতি বিস্মৃতির অভিযোগ আনতে পারেনি। হাফ্‌সা ও কালাইয়া গ্রানাডার অধিবাসী ছিলেন।[৭]

সাফিয়া সেভিলের বাসিন্দা ছিলেন। বাগ্মিতা ও কবিত্বের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা ছাড়া হস্তলিপিবিদ্যায় তিনি সকলকে অতিক্রম করেছিলেন। তাঁর লিপি কৌশল সর্বাপেক্ষা সুদক্ষ লিপিকারের জন্য একাধারে বিস্ময় ও আদর্শ স্বরুপ ছিল। আবু ইয়াকুব আল ফয়সুলীর কন্যা মারিয়াকে আরবদের করিনা (Corina খ্রি. পূ. ৪৭০ অব্দে আবির্ভূত গ্রিক স্ত্রী-কবি) বলা হয়। তিনি ও তাঁর বিদ্যাবেত্তা ও পান্ডিত্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন।[৮] গ্রানাডার আরব রাজাগণ কেবল সু-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতাই করেননি ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, জ্যোতিষ, সাধারণ ভাবে প্রকৃতবিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও সঙ্গীত সমান আগ্রহ সহমাত্র চর্চা করতেন। প্রত্যেক শিক্ষায়তনের শাসনভার অধ্যক্ষের হাতে ন্যস্ত হত। তিনি সর্বাপেক্ষা প্রথিতযশা পণ্ডিত ব্যক্তিগণের মধ্য হতে নির্বাচিত হতেন।

স্পেনের আরবীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বাৎসরিক স্মৃতি সম্মিলনী ও সাময়িক সভা আহবান করার রীতি ছিল। এ সকল সভায় জনসাধারণও নিমন্ত্রিত হত।[৯] এই উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ বক্তিগণ কবিতা আবৃতি ও বক্তৃতা প্রদান করতেন। কর্ডোভার পতনের পর গ্রানাডা শৌর্য বীর্যের উপযুক্ত আবাসস্থল হয়। এখানে জ্ঞান বিজ্ঞান এমনকি সবকিছুর সমাধিক উন্নতি লাভ ঘটে। খলিফাদের রাজধানীতে স্ত্রীলোকগণ উচ্চ স্থান অধিকার করে; তারা পুরুষদের সমাজে অবাধ মেলামেশা করত। আনন্দোৎসব, মল্লযুদ্ধ ও নিত্যনৈমিত্তিক যে সকল দৃশ্য পরস্পর গ্রানাডাবাসীদেরকে

---

৬ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯৩।

৭ সৈয়দ আমীর আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯৪।

৮ *তদেব*।

৯ *তদেব*।

আনন্দ দান করত তাতে মহিলাদের উপস্থিতি নতুন প্রাণের সঞ্চার করত। যে বীরত্ব ও সাহসিকতার জন্য গ্রানাডার সারাসিনগণ প্রসিদ্ধ লাভ করেছিল তা নি:সন্দেহে মহিলাদের মহান প্রভাবের ফলেই হয়েছিল।

আরব অশ্বারোহীগণ তাদের বাহুতে বর্শা ফলক বিদ্ধ অন্ত:করণ বা জাহাজে নির্দেশদানকারী তারকা বা প্রণয়িনীর নামের আদ্য অক্ষর সমন্বিত একটি নক্‌শা অঙ্কিত করে সৈন্য শ্রেণিভুক্ত হত বা যুদ্ধে যোগদান করত। বীর পুরুষগণ সাহসিকতার পুরস্কার অর্জন করার জন্য প্রকাশ্যে স্ত্রীর সামনে যুদ্ধ করত। কথিত আছে, মহিলাগণ সুশ্রী, প্রায়ই মধ্যমাকৃত্তি, কৌতুক প্রিয় এবং আলাপে চটুল ছিল। সুক্ষতম শন, রেশম বা সূতার তৈরী মূলবান জামা, কটিবন্ধ ও মস্তকাবরণ তাদের পোষাক ছিল। ঐতিহাসিক ইবনুল খতীব তাদের পোষাকের বিলাসিতাকে বাতুলতা বলে উল্লেখ করেছেন। অত্যধিক পরিমানে সুগন্ধি ব্যবহৃত হত এবং মহিলাগণ বিশেষ করে উচ্চ পদস্থ মহিলা গণ স্বর্ণ ও মূল্যবান পাথরের অলঙ্কারের সাথে হায়াসিনথমনি, পীত পাথর ও পান্না দ্বারা নিজেদেরকে সুশোভিত করতে অত্যন্ত ভালবাসতেন। মসজিদে তাদের উপস্থিতি এত বৈচিত্যপূর্ণ সৌন্দর্যের সৃষ্টি করত যে তাদেরকে 'সুন্দর মাঠে বাসন্তী ফুল' এর সাথে তুলনা করা হয়েছিল।[১০]

কর্ডোভা ছাড়াও ৭ম নাসিরীয় সুলতান ইউসুফ আবু আল হাজ্জাজ (১৩৩৪-৫৪ খ্রিস্টাব্দে) গ্রানাডা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। তাঁর প্রশাসনকে মর্যাদাময় করে তুলেছিলেন লিসান আল দ্বীন ইবনে আল খাতিব। বিশ্ববিদ্যালয়টির দরজায় প্রহরীর ভূমিকায় ছিল দুটি পাথরের সিংহ। এছাড়াও এ বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় একটি জনপ্রিয় বাণী খোদাই করা ছিল। বাণীটি হলো "বিশ্ব জগত কেবলমাত্র ৪টি বাণীর উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। যথা (১) জ্ঞানীদের শিক্ষা, (২) মানুষের ন্যায়বিচার, (৩) ধার্মিক ব্যক্তিদের প্রার্থনা, (৪) সাহসী ব্যক্তিদের বীরত্ব।"[১১] এখানে ধর্মতত্ত্ব, বিচার শাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, রসায়ন, দর্শন, কোরআন, হাদিস, গণিত শিক্ষা দেওয়া হত। এখানে ক্যাস্ট্রিল ও অন্যান্য দেশের ছাত্ররা পড়তে আসত। গ্রানাডা এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথাগত ভাবে মাঝে মাঝে জনসভা ও স্মৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত হত। সেখানে তারা স্বরচিত কবিতা পাঠ করতেন এবং বক্তব্য রাখতেন।

[১০] সৈয়দ আমীর আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯৫।
[১১] খন্দকার মাশহুদ-উল-হাছান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১৯।

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতায় এবং ব্যয়বহুল জনহিতকর কার্য সম্পাদনে গ্রানাডার রাষ্ট্রপ্রধানগণ কর্ডোভার খলিফাদের সাথে প্রতিযোগিতা করতেন। তাদের উদার ও সুশাসনে গ্রানাডা হয়ে উঠেছিল প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিকদের আদর্শ স্থানীয় পুরুষদের আবাসস্থল ও উৎসস্থল। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ প্রথিতযশা পন্ডিতবর্গের মধ্য থেকে নির্বাচিত হতেন। খ্রিস্টীয় তের শতকের মধ্যভাগে সিরাজউদ্দিন আবু জাফর উমর আল হাকামী এ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এসব নিযুক্তির ব্যাপারে কোন ধর্মীয় পার্থক্য করা হত না এবং শিক্ষিত ইহুদি ও খ্রিস্টানরা প্রায়শই অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হতেন। আরবদের মতে, বিদ্বানের ধর্মমত অপেক্ষা প্রকৃত জ্ঞানের মূল্য অনেক বেশি ছিল।

মূর সভ্যতার অন্যতম পাদপীঠ হিসেবে সেভিলের বিদ্যাপীঠ পাশ্চাত্য জগতে বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল। আবু ইউসুফ ইয়াকুব আল মনসুর (১১৮১ খ্রিস্টাব্দ-৯১ খ্রিস্টাব্দ) এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা, সঙ্গীত, স্থাপত্য, সাহিত্য, চারু ও কারুকলার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র হিসেবে সেভিল ইউরোপে বিশেষ পরিচিতি ছিল।

যখন গৃহযুদ্ধ পণ্ডিতগণকে সন্ত্রস্ত ও কর্ডোভা হতে অনান্য শহর যথা: সেভিল, গ্রানাডা, টলেডো প্রভৃতি স্থানে চলে যেতে বাধ্য করে। অল্প সময়ের জন্য সেভিলে যথেষ্ট পরিমানে বাহ্যিক সমৃদ্ধির অধিকারী হয়। আনন্দ ও উল্লাস বিতরনের শহর হিসেবে স্পেনে বরাবর তার যে ভূমিকা ছিল, সেই ভূমিকাই পালন করে। বলা হত, এমন কি, কর্ডোভার জাঁকজমকের দিনেও কর্ডোভাই ছিল বইয়ের আর সেভিল ছিল গীত ও বাদ্যযন্ত্রের সবচাইতে ভাল বাজার। প্রকৃত পক্ষে সেভিলে ছিল গীত ও বাদ্যের এবং আন্দালুসয়িার শ্যামল সমতল ভূমিতে মূরদের সাথে আমরা যে আনন্দ-উল্লাসকে সংযুক্ত করি, তারই কেন্দ্র। এটি ছিল অত্যন্ত মনোরম উদ্যানবলীর নগরী এবং তৎবিধায় স্থানীয়ভাবে এর পুষ্প-প্রদর্শনী ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সেভিল শহরে মূর কবিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রতিভাশালী যিনি বাস করতেন তিনি স্বয়ং রাজা মুতামিদ ছাড়া আর কেউ নন।[১২] এভাবে সেভিলে যখন হালকা মনে জীবনের আনন্দ উল্লাসে নিজেকে ছেড়ে দেয়, তখন টলেডো হয়ে পড়ে প্রাচ্যের জ্ঞানভান্ডার।

মধ্যযুগের স্পেনীয় মুসলমানগণ ধর্মবিস্তারে সর্বাপেক্ষা বেশি উৎসাহী ছিলেন। আল কুরআন মুসলিম জীবনাদর্শের প্রধান উৎস হওয়ায় স্পেনীয় মুসলিম ধর্মবেত্তাগণ আল কুরআনের বিশুদ্ধ পঠন, তাফসীর

[১২] যোশেফ হেল (অনু: মোজাম্মেল হক), *আরব সভ্যতা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, বর্ধমান হাউস, চৈত্র: ১৩৭৫), পৃ. ১৪৬।

বা ব্যাখ্যা প্রদান ও গবেষণায় নিজেদের শ্রম, অর্থ ও সময় ব্যয় করতেন এবং বিশেষ তৎপরতা প্রদর্শন করতেন। এ সময় আল কুরআনকে অবিকৃত ভাবে তিলাওয়াত ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে একদল হাফিজে কুরআন সৃষ্টি হয়। কুরআনকে বুঝার জন্য বড় বড় ধর্মীয় পন্ডিতবর্গ অনুবাদ ও তাফসীরের কাজ করেন। তাফসীরকারকদের মধ্যে যিনি বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন তিনি হলেন বাকী ইবনে মাখলাদ (মৃ. ৮৮৯ খ্রিস্টাব্দ)। তিনি সর্বপ্রথম তাফসীর গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তার তাফসীরটি গ্রানাডার আবু মোহাম্মদ বিন আতিয়া সংক্ষিপ্ত করেন এবং সেটা প্রসিদ্ধ অর্জন করে। তবে কর্ডোভার মুহম্মদ বিন আহমদ বিন ফারাহ আল কুরতুবী (মৃ. ১২৭৩ খ্রিস্টাব্দ) তাফসীরকারকদের মধ্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। তাঁর একটি তাফসীর গ্রন্থের নাম *তাফসীরে কুরতুবী*।[১৩]

কুরআনের উপর বহু গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করেন আবূ আমর উসমান ইবনে সাঈদ আল দানী (মৃ. ১০৫৩ খ্রিস্টাব্দ)। তাঁর রচিত *কিতাব আল তায়সীর* কুরআনের সপ্ত পাঠরীতি সম্পর্কে এক অনবদ্য সৃষ্টি। এছাড়া ক্বারীদের মধ্যে অন্যতম আল মুজাহিদ (মৃ. ১০৪৪ খ্রিস্টাব্দ)। তাঁর যোগ্য উত্তরসূরী হলেন আবুল কাসিম ফিররুহ (মৃ. ১১৯৪ খ্রিস্টাব্দ)।

স্পেনের মুসলিম বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় মনীষীগণ কোরআন চর্চার পরেই হাদিস শাস্ত্রের অধ্যয়ন, গবেষণা ও গ্রন্থ রচনার কাজে লিপ্ত হন। তৃতীয় ও চতুর্থ হিজরি শতকে ইউরোপের মুসলিম স্পেন হাদিস ও মুহাদ্দিসগণের খনিজ ভান্ডারে পরিণত হয়েছিল। এদের সংখ্যা অনেক। তবে মুহম্মদ বিন ওয়াদ্দাহ (মৃ. ৯০০ খ্রিস্টাব্দ), কাসিম বিন আসবাগ (মৃ. ৯৫১ খ্রিস্টাব্দ), ইবনে ফুতাইস (মৃ. ১০১১ খ্রিস্টাব্দ), আবু আবদুল্লাহ আল দাওলানী (মৃ. ১০৭৫ খ্রিস্টাব্দ) এবং ইউসুফ ইবনে আবদ আল বার (মৃ. ১০৭০ খ্রিস্টাব্দ) উল্লেখযোগ্য। *তামহীদ* হাদিস শাস্ত্রটি ইউসুফ ইবনে আবদ আল বার রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। এছাড়া হাদিস বেত্তাদের উপর ইমাম মালিক ইবনে আনাস এর (মৃ. ৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ) প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি।[১৪]

বার্বার সম্প্রদায়ের প্রখ্যাত ধর্মতত্ত্ববিদ ইয়াহইয়া (মৃ.৮৪৭ খ্রিস্টাব্দ), আমীর প্রথম হিশামের (৭৮৮ খ্রিস্টাব্দ -৭৯৬ খ্রিস্টাব্দ) রাজত্বকালে মদিনায় গমন করে ইমাম মালিকের (রা:) শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং স্পেনে ফিরে এসে তাঁর শিক্ষকের আদর্শ প্রচার ও প্রসারে নিজেকে গভীরভাবে নিয়োজিত করেন। তাঁর প্রভাব আমীর প্রথম আল হাকাম (৭৯৬ খ্রিস্টাব্দ-৮২২ খ্রিস্টাব্দ), আমীর দ্বিতীয় আব্দুর

---

[১৩] এ,এইচ,এম, শামসুর রহমান, *স্পেনে মুসলমানদের ইতিহাস* (ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৩৮১বঙ্গাব্দ),পৃ. ২০৯।
[১৪] এ,এইচ,এম, শামসুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৯।

রহমানের (৮২২ খ্রিস্টাব্দ-৮৫২ খ্রিস্টাব্দ) রাজত্বকাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। সে সময় এবং পরবর্তী সময়ে বহু ক্ষনজন্মা পুরুষ হাদিস শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন এবং স্পেনের বৌদ্ধিক সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ইবনে হাবীব (মৃ. ১০২৯ খ্রিস্টাব্দ), আবুল ওয়ালীদ আল বাকী (মৃ. ১০৮১ খ্রিস্টাব্দ), আবুল ওয়ালিদ বিন রুশদ (১১২৬ খ্রিস্টাব্দ-১১২৮ খ্রিস্টাব্দ) প্রমূখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১৫]

ধর্মীয় ব্যাখ্যা দাতা গবেষণার দর্শনতত্ত্বের নতুন তথ্যের আবিষ্কারক ইবনে মাসাররাহ (মৃ. ৯৩১ খ্রিস্টাব্দ) প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি বহু পুস্তক রচনা করেছেন। ধর্মশাস্ত্রবিদ ও দার্শনিক হিসেবে চিন্তার জগতে তিনি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। বাকী বিন মাযলাদও ছিলেন একজন প্রতিভাসম্পন্ন ফকিহ্ এবং হাদিস বিশারদ । তিনি ইমাম আল শাফী (রহ:) এর ভক্ত ছিলেন। ফকিহ্‌বিদদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ইয়াহিয়া বিন ইয়াহিয়া বার্বার (মৃ. ৮৪৭ খ্রিস্টাব্দ), আবু ওয়ালিদ আল বাকী (মৃ. ১০৮১ খ্রিস্টাব্দ), ঈসা বিন দীনার (মৃ. ৮২৭ খ্রিস্টাব্দ), আবু মূসা হাওয়ারী। ধর্মীয় ভিন্ন মতবাদ প্রকাশের জন্য কুরআন, হাদিস এবং দর্শনে বিপুল অভিজ্ঞতা ও পান্ডিত্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও গোঁড়ামী ও তকলীদের জন্য যাঁরা নিপীড়িত হয়েছেন এবং নিগৃহীত হওয়ার পরও যাদের খ্যাতি চূড়ান্তে তাদের মধ্যে ইমাম ইবনে হাযম (৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ-১০৬৪ খ্রিস্টাব্দ), ইবনে রুশদ, ইবনে মায়মুন অন্যতম।

স্পেনের চিন্তা জগতে কুরআন এবং হাদিসে যিনি অতন্ত্র প্রহরীর ন্যায় কলম ধরেছেন, কিতাব রচনা করেছেন, এই বহুমূখী প্রতিভাধর মনীষী হলেন আবু মুহম্মদ আলী ইবনে সাঈদ; যিনি ইবনে হাযম নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। জীবনের সমস্ত চড়াই উৎড়াই পেরিয়ে লেখাপড়া ও জ্ঞানার্জনে তাঁর প্রবল আগ্রহই সর্বদা বিজয়ী হয়ে তিনি জ্ঞানীদের তালিকায় স্থান করে নিয়েছিলেন। তিনি কয়েকবার কারাবরণও করেন।[১৬] শাস্ত্রবিদ, মুহাদ্দিস, ফকিহ্, দার্শনিক হিসেবে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর *কিতাব আল মুহাল্লা* বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর সর্বাপেক্ষা মূল্যবান গ্রন্থ *আল ফাসল ফী আল মিলাল ওয়া আল আহওয়া ওয়া আল নিহাল*। কুরআন এবং বিশুদ্ধ হাদিসের আলোকে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সমালোচনামূলক বর্ণনা এই গ্রন্থে সবিস্তারে উল্লেখ আছে। এ বইটি তাঁকে তুলনামূলক

[১৫] *তদেব*।

[১৬] এ,এইচ,এম, শামসুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১০।

ধর্মের ক্ষেত্রে প্রথম পণ্ডিতের সম্মান এনে দেয়। এই রচনায় তিনি বাইবেল সংক্রান্ত বর্ণনার অসুবিধা গুলো উল্লেখ করেন।

তৃতীয় হিজরি শতকে স্পেনের ধর্মীয় অঙ্গনে মুতাজিলা মতবাদের অনুসারী কিছু লোকের আগমন ঘটে। তাঁরা *আহলে আল সুন্নাহ ওয়া আল জামায়াত* এর আকিদা বিরোধী দর্শন তথা মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতা, কুরআনের নব সৃষ্টতা, আল্লাহর উপর জনকল্যাণ সাধনের অপরিহার্যতা প্রভৃতি চিন্তাধারা ছড়িয়ে দিতে থাকেন। ইবনে মাসারাহ (মৃ. ৯৩১ খ্রিস্টাব্দ) নামক এক মুতাযিলী ইমাম এক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করলেও মালিকী মাযহাবের অনুসারীদের প্রবল বাধার মুখে মুতাযিলাদের সকল তৎপরতা থেমে যায়। এভাবে ফাতেমীয়গণ শিয়া মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার দূরভিসন্ধিতে লিপ্ত ছিল এবং স্পেনে তা প্রচারের অনুকূল পরিবেশ বিদ্যমান ছিল । কেননা স্পেনে আরও অনেক মুক্তচিন্তার প্রবক্তা ছিলেন। বোবাস্ত্রের দস্যু সরদার উমর ইবনে হাফসুনও তাদের দলে মিলিত হয়। স্পেনের বিখ্যাত কবি ইবনে হানীও ইসমাঈলীয় শিয়া আকিদা পোষণ করতেন। পরবর্তীতে উমাইয়া খলিফাগণ তাদের সকল কর্মকাণ্ড কঠোর হস্তে দমন করেন।

আরবি ভাষা শুধু সমৃদ্ধই নয়, বরং সমগ্র মুসলিম বিশ্বে এটি ছিল সার্বজনীন ভাষা। আরবি শুধু ধর্মীয় ভাষাই নয় জ্ঞান বিজ্ঞানেরও ভাষা। আরবি ভাষা খোদা প্রদত্ত ভাষা; যে ভাষায় মহাগ্রন্থ আল কুরআন লিখিত হয়েছে। এই ভাষায় হাদিস রচিত হয়েছে। মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর শুধুমাত্র এ ভাষা প্রাধান্য পায়নি, বরং প্রশাসন ব্যবস্থাকে আরবীয়করণ করেছেন উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিক। তিনি আরবি হরফ সঠিক ভাবে উচ্চারনের জন্য হরকত সংযোজন করেছেন।[১৭] তাঁর *মুজাহির* রচনার ক্ষেত্রে আল জুবাইদির গ্রন্থ থেকে অনেক তথ্য গ্রহণ করেন। আরবি ব্যাকরণকে ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করে মুসলিম স্পেনে হিব্রু ব্যাকরণের সৃষ্টি হয় এবং এখন হিব্রু ব্যাকরণের পারিভাষিক শব্দগুলি আরবি ব্যাকরণের পারিভাষিক শব্দের অনুবাদ রূপে ব্যবহার হয়। বিজ্ঞান সম্মত হিব্রু ব্যাকরণের জনক আবু জাকারিয়া ইয়াহিয়া ইবনে দাউদ এর কর্মকাণ্ডের বিকাশ ঘটেছিল স্পেনে।

প্রাচ্যে মুসলিম কর্তৃক বিজিত হবার পর শাসন মুদ্রা ও ভাষা প্রাথমিকভাবে বহুলাংশে পূর্বের নীতি বহাল রাখা হয়েছিল। এমনকি সিন্ধু বিজয় করার পর সেখানেও সে নীতি অনুসরণ করা হয়। কিন্তু স্পেন বিজয়ে তা হয়নি। প্রাথমিক ভাবেই সাংস্কৃতিক পট পরিবর্তনে এক বিপ্লব শুরু করা হয়। রাজকার্যের আদেশনামা, মুদ্রা, বক্তৃতা সবকিছুই স্পেনীয় ভাষার পরিবর্তে বিজয়ী আরবদের আরবি

---

[১৭] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *স্পেন ও উত্তর আফ্রিকার মুসলিম শাসনের ইতিহাস* (ঢাকা: উত্তরণ প্রকাশন, বাংলা বাজার, ২০০৫), পৃ. ১২৮।

ভাষা ব্যবহার করা হয়। অর্থ্যাৎ শুরু থেকেই আরবীয় করণনীতি অনুসরণ করা হয়। শাসকদের ভাষা উন্নত সংস্কৃতি, শিক্ষা ও সভ্যতায় সম্মানিত হবার প্রত্যয়ে স্পেনীয়রা অনেকে বিজয়ীদের ভাষা, আচার ব্যবহার, রীতি-নীতি, কর্মপদ্ধতি এবং এমনকি ধর্ম পর্যন্ত গ্রহণ করতে ইতস্তত: করেননি। এদেরকে নও মুসলিম বা *মুয়াল্লামুন* বলা হত। কালক্রমে এদের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়, আবার যারা পৈর্তৃক ধর্ম বজায় রেখে কেবল মাত্র মুসলমানদের ভাষা, আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ এবং উন্নত রুচি ও সংস্কৃতি গ্রহণ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন তাদেরকে *মুজারব* বলা হয়।

ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টি বলেছেন, "ভাষাতত্ত্ব, ব্যাকরণ অভিধান রচনা সই বিশুদ্ধ ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আল আন্দালুসের আরবেরা আল ইরাকের আরবদের থেকে পিছিয়ে ছিল।"[১৮] ("In the purely linguistic science, including philosophy, grammar and lexicography the Arabs of Al-Andalus lagged behind those of Al-Iraq.")

এতদসত্ত্বেও একথা বলা যায় যে, স্পেনীয় মুসলমানদের আমলে ভাষা ও সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। উত্তর আফ্রিকা, সিউটা, ইউরোপ, প্রাচ্যের অনেক দেশ থেকে জনমানুষ শিক্ষা, সভ্যতা ও উন্নত জীবনের প্রত্যাশায় ভিড় জমাত স্পেনে। ফলে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের একটা সম্মেলন কেন্দ্র হিসেবে কর্ডোভা পরিচিত হয়ে উঠে। সংস্কৃতির চর্চা ও লালন ক্ষেত্র রূপে চিহ্নিত হয়। শাসক বর্গও তাদের প্রভাব এবং রুচি অনুযায়ী সভ্যতার চারা রোপণ করতে থাকেন। যে সমস্ত মনীষী সৃজনশীল জ্ঞান সাধনায় যশস্বী হয়েছেন; তাদের মধ্যে ভাষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে যিনি বিশেষভাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন তিনি হচ্ছেন আল কালী (৯০১ খ্রিস্টাব্দ-৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ)।[১৯] আল কালী কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর *আমালি* গ্রন্থ অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। তাঁর প্রধান শিষ্য ছিলেন মুহম্মদ ইবনে আল হাসান আল জুবাইদি (৯২৮ খ্রিস্টাব্দ-৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ)।

খলিফা আল হাকাম তার পুত্র হিশামের শিক্ষক হিসেবে আল জুবাইদিকে নিয়োগ করেছিলেন। পরবর্তীতে হিশাম তাকে কাজী এবং সেভিলের প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করেন। আল জুবাইদির প্রধান কাজ ছিল তার সময়কাল পর্যন্ত যে সমস্ত ব্যাকরণবিদ ও ভাষাতত্ত্ববিদের আবির্ভাব ঘটেছিল তাদের তালিকা লিপিবদ্ধ করা। প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ আল সুয়ূতী আল জুবাইদির গ্রন্থাবলি ব্যবহার করে তার *মুজাহির* গ্রন্থ রচনা করেন। আরবি ব্যাকরণকে ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করে মুসলিম স্পেনে হিব্রু ব্যাকরণের সৃষ্টি হয় এবং এখন হিব্রু ব্যাকরণের পারিভাষিক শব্দগুলি আরবি ব্যাকরণের পারিভাষিক শব্দের অনুবাদ রূপে ব্যবহার

---

[১৮] P.K. Hitti, *History of the Arab* (London: Macmillan and Co., Ltd., 1970), P. 558.

[১৯] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৮।

হয়। বিজ্ঞান সম্মত হিব্রু ব্যাকরণের জনক তায়যুজ জুডাবেন ডেভিড (আরবিতে আবু জাকারিয়া ইয়াহিয়া ইবনে দাউদ) এর কর্মজীবন বিকশিত হয়েছিল কর্ডোভাতে।[২০]

আরবদের সমাজ জীবনে সাহিত্য এক উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করেছিল। যুগ যুগ ধরে তারা সাহিত্য লালন করেছে। সেই ইসলাম পূর্ব যুগের বেদুঈন আরবদের মুখে মুখেই সাহিত্যের চর্চা হত। ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় লাভের পর তারা নতুন আমেজ পেয়েছে। সাহিত্য, কবিতা ও তৈরিতো গ্রন্থাগার গড়ার ঐতিহ্য সৃষ্টিতে তাদের যে অবদান তা হলো ধর্মপুস্তকের পরেই কবিতার আসন নির্দিষ্ট করা।

স্পেনীয় মুসলিম সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক ইবনে আবদ রাব্বিহ (৮৬০ খ্রিস্টাব্দ-৯৪০ খ্রিস্টাব্দ)। তিনি কর্ডোভার নাগরিক ছিলেন এবং খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমানের সভাকবি ছিলেন। প্রথম হিশামের মুক্তিপ্রাপ্ত এক ক্রীতদাসের বংশধর ছিলেন ইবনে আবদ রাব্বিহ। তাঁর খ্যাতির মূল ভিত্তি ছিল তার রচিত প্রামাণ্য গ্রন্থ *আল ইকদ আল ফরিদ* (The Unique Necklece) বা অপূর্ব কণ্ঠহার এ গ্রন্থ রচনা করে তিনি খ্যাতির শীর্ষে পৌছে যান। ঐতিহাসিক হিট্টি তার গ্রন্থ সম্পর্কে বলেন, "এই গ্রন্থটি কিতাব আল আগানীর পরে আরবি সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম স্থান দখল করে আছে।"[২১] ("After Al-Aghan if occupies first place among works on the literary history of the Arabs".)

কিন্তু স্পেনীয় ইসলামের সবার সেরা পণ্ডিত ও মৌলিক চিন্তানায়ক ছিলেন আলী ইবনে হাযম (৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ-১০৬৪ খ্রিস্টাব্দ)। হিট্টির মতে, "তিনি ছিলেন ইসলামের দুই কিংবা তিন জন সৃজনশীল মনীষী ও অসংখ্য গ্রন্থ প্রণেতাদের মধ্যে অন্যতম।"[২২] তিনি নিজেকে একজন সম্ভ্রান্ত পারসিক ব্যক্তির বংশধর বলে দাবী করলেও বাস্তবে তিনি ছিলেন খ্রিস্টান থেকে মুসলমান হওয়া এক ব্যক্তির নাতি। যৌবনে তিনি উজির পদে অধিষ্ঠিত হন কিন্ত উমাইয়া সাম্রাজ্যের আসন্ন পতনের সম্ভাবনা লক্ষ করে তিনি অবসর গ্রহণ করেন এবং নিজেকে সাহিত্যচর্চায় নিয়োজিত করেন।

ইবনে খাল্লিকান ও ইবনে কিফতীর মতে, ইবনে হাযম চারশত গ্রন্থ রচনা করেন। এ সমস্ত গ্রন্থের বিষয় বস্তু ছিল ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব, হাদিস, যুক্তিবিদ্যা, কাব্য প্রভৃতি। তিনি জাহেরী মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। দীর্ঘদিন আগে বিলুপ্ত জাহিরীয় (আক্ষরিকতাবাদী) বিচারশাস্ত্র ধর্মতত্ত্বের প্রবক্তা রূপে এবং

[২০] খন্দকার মাশহুদ-উল-হাছান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১৫।

[২১] P.K. Hitti, *Op. cit.*,P. 559.

[২২] *Ibid*, P. 559.

সাহিত্যকর্মে তিনি ছিলেন সদা তৎপর ও উদ্যমী ব্যক্তি। তাঁর প্রথম গ্রন্থ *তাওক আল হামামা: ফী আল উলফন ওয়া আল ওয়াফে*। *তাওক আল হামামা* (কবুতবের মালা) নামের প্রেমকাব্য সংকলনে তিনি কাল্পনিক ভালবাসার জয়গান গেয়েছেন।[২৩] তার গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু ছিল নিষ্কাম প্রেম ও ভালাবাসা। এ গ্রন্থের কথা ঐতিহাসিক ডোযী উল্লেখ করেছেন। এটি তার কবিত্ব প্রতিভার এক অন্যতম উপমা।

শুধু কর্ডোভার নয় রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে যেমন আব্বাসিয়, মুরাবিত ও মুওয়াহ্‌দিদের সময় সেভিল, তলেদো এবং গ্রানাডায় পূর্ববর্তী যুগের তুলনায় সাহিত্য চর্চা আরও বৃদ্ধি পায়। কর্ডোভার যে সমস্ত খ্রিস্টানরা আরবীয় জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল অর্থ্যাৎ মোজারবরা আরবি সাহিত্যের সাথে বিশেষভাবে পরিচিত ছিল। তারাই আরবি সাহিত্যের বিভিন্ন উপকরণ যেমন আরবি ভাষা, ব্যাকরণ, সাহিত্য স্পেনের উত্তর ও দক্ষিণের রাজ্যগুলোতে ছড়িয়ে দেয়। যার ফলে ত্রয়োদশ শতকে পশ্চিম ইউরোপের গদ্যসাহিত্যে অনেক আরবি রূপকথা কাহিনী গল্প অনুপ্রেবেশ করে। সেগুলির সাথে প্রথমদিককার ইন্দো-পারসীয় উৎস থেকে উদ্ভুত আরবীয় সাহিত্যগুলোর সাথে অভূত পূর্ব সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

মাকামার বিখ্যাত গ্রন্থ *কালীলা ওয়া দিমনা* আরবি গ্রন্থ ক্যাসটাইল ও লিউ'র রাজা বিজ্ঞ আল ফানসোর নির্দেশে স্পেনীয় ভাষায় অনূদিত হয়।[২৪] কিছুদিন পর এক ধর্মান্তরিত ইহুদি সেটা ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। কাহিনীগুলো পারসীয় অনুবাদ থেকে ফরাসি ভাষায় অনূদিত হওয়ার ফলে তা লাফনটেনের কাহিনীগুলোর অন্যতম উৎসে রূপান্তরিত হয় বলে তিনি স্বীকার করেন। মাকামার সাথে এক শ্রেণীর স্পেনীয় উপন্যাসের মিল আছে। Carvantes এর *Don Quixto* গ্রন্থটির মডেল আরবি সাহিত্য থেকে গৃহীত। সমস্ত রকমের ভাষাতাত্ত্বিক অলংকারে সমৃদ্ধ ও গদ্যকাব্যের ছন্দে রচিত এবং এক অশ্বারোহী বীরের দুঃসাহসিক অভিযানের মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষাদানের ভবঘুরেদের জীবনমূলক উপন্যাসের নিকট সম্পর্ক রয়েছে।

কিন্তু মধ্যযুগের ইউরোপীয় সাহিত্যের গঠন প্রকৃতির ক্ষেত্রেই আরবেরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। আর এর ফলে প্রচলিত প্রথার নিগড়ে সংকীর্ণ ও অনড় নিয়মানুবর্তিতার দ্বারা আবদ্ধ পশ্চিমী মননশক্তি মুক্তিলাভ করেছিল কিন্তু আরবদের আদর্শ অনুসরণ না করেই স্পেনীয় সাহিত্য বরং উদ্ভট কল্পনাশক্তির দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছিল। সারভানটাসের ডনকুইজোটের কৌতুক একই ভূমিকা পালন

[২৩] খন্দকার মাশহুদ-উল-হাছান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১৫।
[২৪] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৯।

করেছিল। তিনি একজন জেলে বন্দি ছিলেন এবং কৌতুকের সাথে দাবি করেন যে বইটি আসলে আরবি উৎস থেকেই সংকলিত।[২৫]

শিক্ষিত লোকদের মুখে মুখে আরবি কবিতা প্রচলিত ছিল। এ কবিতার সঙ্গীত বৈশিষ্ট্য ও কারুকাজই এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করেছিল। যুব খলিফা ও সুলতানগন ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করতেন এবং উমাইয়া শাসকগোষ্ঠী এক্ষেত্রে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। ইউরোপের বহু দেশ থেকে বহু মনীষী স্পেনে আসেন এবং বহু গ্রন্থ আরবি থেকে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করে ইউরোপে জ্ঞানের ভান্ডার সমৃদ্ধ করেন। এসব মনীষীদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য ছিলেন এগারো শতকের মধ্য ভাগে পিটার এডিলাড বারো শতকের আসনে ইংল্যান্ডের এডিলাড আরবার্থ, রবার্ট অব রিডিং দানিয়েল মার্ল প্রমুখ। তারা মুসলমানদের সংস্পর্শে এসে নতুন বলে বলীয়ান হয়। বহু ইংরেজি শব্দ আরবি শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়, যেমন Good morning, Cotton, Algebra, Chemistry, Sandal প্রভৃতি।

প্রাচীন আরবদের কাব্য প্রীতি ছিল সর্বজন বিদিত। যেখানে যখনই আরবি ভাষার ব্যবহার লক্ষ করা গেছে সেখানেই কাব্য রচনার একটা গভীর আর্তি প্রকাশ পেয়েছে। মুখে মুখে প্রচলিত অসংখ্য কবিতা, তাদের বিষয়বস্তুর জন্য না হলেও সুর ও সুন্দর শব্দ নির্বাচনের জন্য সকল শ্রেণির মানুষের কাছেই সমাদর পেয়েছিল। শব্দের সৌন্দর্য ও মধুর উচ্চারন ধ্বনিতে আনন্দ অনুভব করা ছিল আরবিভাষী মানুষদের একটি বৈশিষ্ট্য।[২৬] আরবগণ মন মানসিকতার দিক থেকে ভাবপ্রবণ এবং এজন্যই তারা মোয়াল্লাকার মত গীতি কবিতা রচনা করতে সক্ষম হয়েছিল।

স্পেনীয় মুসলমানদের শাসনামলে স্পেনে কাব্য চর্চা অব্যাহতই ছিল না, বরং উৎকর্ষতার সুউচ্চ শিখরে পৌঁছেছিল। লোকসঙ্গীত অলিখিত ছিল এবং তা মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত হত। আরবি ভাষায় যে ধ্বনিতত্ত্ব ও কাব্যিক ছন্দ রয়েছে তার ফলেই এই ভাষা সার্বজনীন রূপগ্রহণ করে। ঐতিহাসিক হিট্টির ভাষায়, "The sheer Joy in the beauty and euphony of words, a characteristic of Arabic-Speaking peoples, manisfested itself or spanish soil."[২৭] ("আরবিভাষী লোকদের ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল শব্দের সৌন্দর্য ও সঠিক চয়ন ও ধ্বনি যা স্পেনে ব্যাপক আকারে প্রতিফলিত হয়")।

---

২৫ খন্দকার মাশহুদ-উল-হাছান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১৬।
২৬ খন্দকার মাশহুদ-উল-হাছান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১৬।
২৭ P.K. Hitti, *Op. cit.*,P. 559.

কাব্য প্রীতি সমাজের উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণির মধ্যে নানাভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করে। প্রথম উমাইয়া আমীর প্রথম আব্দুর রহমান একজন প্রথিতযশা কবি ছিলেন। তাঁর কবিতাগুলো ছিল খুবই নামকরা, যেমনটি দামেস্ক উমাইয়া আমলের কবি জরীর ফারাজদাক বা আল আখতালের কাব্য বিষয়বস্তু ছিল তেমনটি স্পেনেও নতুন ভাবে দেখা দেয়। তাঁর উত্তরাধিকারীগণ কাব্যচর্চা করতেন। স্বাধীন রাজ্যের অধিপতিগণ কাব্য রসিক ছিলেন।[২৮] ছোট ছোট রাজাদের মধ্যে আল মুতামিত ইবনে আব্বাদ কাব্য বা শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বেশির ভাগ রাজাদের রাজদরবারেই রাজকবিরা যুক্ত ছিলেন এবং যুদ্ধ ও ভ্রমণের সময় রাজারা তাদের সঙ্গে নিয়ে যেতেন। সেভিলের রাজদরবারে সর্বাধিক সংখ্যক সুন্দর ও অনুপ্রাণিত কবি ছিল। আর এজন্য সেভিল গর্ববোধ করত। তারও বহুকাল আগে থেকেই কর্ডোভাতে কাব্য প্রতিভার অগ্নিশিখা জ্বলে উঠেছিল। গ্রানাডায় শক্তিশালী দুর্গ ছিল। এসব সভাকবিগণ ভ্রমণকাহিনী ও যুদ্ধকালীন সময় কবিতা রচনা করতেন।

কর্ডোভা, গ্রানাডা ও সেভিলের রাজদরবারের কবিদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হত। স্পেনের মাটিতে বহু প্রতিভা সম্পন্ন কবির আবির্ভাব হয়। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ইবনে আবিদ রাব্বিহ, রাব্বী ইবন হাজম, ইবন আল খাতিব। অপর একজন সুনামধন্য কবি ছিলেন আবু আল ওয়াহিদ আহমদ ইবনে যায়দুন (১০০৩ খ্রিস্টাব্দ-৭১ খ্রিস্টাব্দ)। অনেকেই তাকে আল আন্দালুসের শ্রেষ্ঠ কবি বলে গণ্য করে থাকেন। তিনি মাখজুম গোত্রের অভিজাত পরিবারের সন্তান ছিলেন। তিনি প্রথমে কর্ডোভার রাজতন্ত্রের প্রধান ইবনে জাহওয়ার এর একজন বিশ্বস্ত প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি প্রেমের কবিতা লিখতে পছন্দ করতেন এবং খলিফা আল মুসতাকফীর অপরূপা কন্যা ওয়াল্লাদো'র উদ্দেশ্যে রচিত প্রেম গাঁথার জন্য তিনি কারাবরণ করেন। পরে কারা মুক্ত হয়ে আল মুতাদিদ আল আব্বাদের প্রধান উজির এবং কারার সেনাদক্ষ নিযুক্ত হন। তিনি যু আল ওয়াজারাতাইন অর্থ্যাৎ দুজন উজিরের সমতুল্য উপাধিতে ভূষিত হন। তার এই উপাধির অর্থ হল তরবারি ও লেখনি উজির।[২৯]

মার্জিত রুচির কবি ইবনে যায়দুন ছিলেন একজন বিখ্যাত পত্র লেখক। হিট্টি ইবনে যায়দুনের প্রশংসা করে বলেছেন, "ওয়াল্লাদাকে উদ্দেশ্য করে রচিত ইবনে যায়দুনের বহু কবিতাতেই আল জাহরা প্রাসাদ ও তার বাগানগুলির সৌন্দর্যের উজ্জ্বল চিত্র এবং প্রকৃতির প্রতি গভীর অনুরাগের ছবি অঙ্কিত হয়েছে।"[৩০] স্পেনীয় আরবি কবিতার এটাই প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। খলিফা আল মুস্তাকফির মেয়ে ওয়াল্লাদা ছিলেন

---

[২৮] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩০।

[২৯] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩০।

[৩০] P.K. Hitti, *Op. cit.*,P. 560.

সুন্দরী ও প্রতিভাময়ী। তার মনোরম ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য ক্ষমতার জন্য তিনি বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। স্পেনের মাটিতে আরব মহিলাদের মধ্যে কাব্য ও সাহিত্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ও সহজাত প্রবণতা লক্ষ করা গিয়েছিল। এছাড়া ওয়াল্লাদাকে স্পেনের স্যাফো বলা হত। তার আবাসস্থলটি ছিল কবি, পণ্ডিত ও রসিক ব্যক্তিদের মিলনস্থল। আল মাক্কারি তার বইয়ের একটা অধ্যায় জুড়ে আল আন্দালুসের মহিলাদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং মন্তব্য করেছেন যে, বাগ্মিতা ছিল এদের দ্বিতীয় সহজাত প্রতিভা।

তুলনামূলকভাবে কম খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিভাধরদের মধ্যে আবু ইসহাক ইবনে খাফাজার (মৃ. ১১৩৯ খ্রিস্টাব্দে) ছিলেন অন্যতম। তিনি ভ্যালেন্সিয়ার দক্ষিণে একটি ছোট গ্রামে বাস করতেন। এছাড়া ও মুহম্মদ ইবনে হানী ছিলেন অন্যতম; যিনি স্পেন থেকে চলে গিয়ে ফাতেমীয় খলিফা মুঈজের দরবার অলংকৃত করেছিলেন।

দশ শতকে ইবনে মুগিস খলিফা দ্বিতীয় হাকাম কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে প্রাচ্য ও আন্দালুসিয়ায় কবিদের সম্পর্কে একটি উৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। ইবনে মুগিসের সমকালীন ইবনে ফারাজ আল গায়ানী (মৃ. ৯৭০ খ্রিস্টাব্দ)। তিনি *কিতাব আল হাদাইক* (Book of Garden) রচনা করেন। ইবনে দাউদ আল ইস্পাহানীর কিতাব *আজজাহারা*'র অনুপ্রাণিত হয়ে। এ গ্রন্থে দু'শত পংক্তি বিশিষ্ট একটি অধ্যায় ছিল। এমনিভাবে এ দু'শত অধ্যায়ে বিভক্ত ছিল এ বৃহৎ কাব্য গ্রন্থটি। এটি খলিফা দ্বিতীয় হাকামের নামে উৎসর্গীকৃত।

আবুল ওয়ালীদ আল হিমাইরি (মৃ. ১০২৬ খ্রিস্টাব্দে), আল রাজি ফি ওয়াসক আল রাব্বি (The wondrous concerning the description at spring) উল্লেখযোগ্য স্পেনীয় পণ্ডিতদের নিয়ে তিনি উচ্চ প্রশংসা করেছেন। কাব্য ছন্দে ইবনে বাসাম (মৃ. ১১৪৭ খ্রিস্টাব্দ) *আল জাকিরাহ ফি মাহসিন আহল আজ জাজিরাহ* নামে আন্দালুসিয়ার কাব্য জগতে চমকপ্রদ একটি গ্রন্থ উপহার দেন। উপদ্বীপে সুন্দর গুণরাজিতে অমূল্য সম্পদ যে সম্বন্ধে কাব্যটির আলোচ্য বিষয়। গ্রন্থটি রচনা করে তিনি খ্যাতির শীর্ষে পৌছান। এটি তিনি (১০০৬ খ্রিস্টাব্দ-০৯ খ্রিস্টাব্দ) এর মধ্যে সেভিলে বসে রচনা করেন।

মুসলিম স্পেনে কবিতা চর্চা হত ব্যাপক আকারে। প্রথম আব্দুর রহমানসহ পরবর্তী শাসক গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতা ছিল কবিতা চর্চায়। আমীর দ্বিতীয় আব্দুর রহমানের সময় কাব্য ও সাহিত্যের জমজমাট আসর বসত। কবি ইয়াহিয়া আল গাজাল এবং আব্বাস বিন ফিরনাসের নাম এ সময়ে স্মরণীয়। তবে আমীর স্বয়ং কাব্যমোদী ছিলেন পূর্ব পুরুষদের মতই। প্রথম হাকাম ও বেশকিছু কবিতা লিখেন। প্রাচ্য

থেকে আসা আবুল হাসান ওরফে নাফি আল জিরয়াব (মৃ. ৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ) ছিলেন নাম করা কবি। আর একজন কবি অত্যন্ত বীরত্ব ব্যঞ্জক কবিতা রচনা করে মানুষের অনুপ্রেরণার খোরাক যোগান; তিনি হলেন সাঈদ বিন জুদী (মৃ. ৮৯৭ খ্রিস্টাব্দ)। প্রচলিত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন কবিতাগুলো থেকে কিছুটা আলাদা বৈশিষ্ট্য নিয়ে স্পেনীয় আরবী কবিতা নতুন ছন্দোবদ্ধ আকারে গড়ে উঠে।

প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রতি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি গৃহীত হয়। পল্লীগীতি ও প্রেমগীতির মধ্য দিয়ে এক নরম সুরের রোমান্টিক অনুভূতির প্রকাশ ঘটে যা মধ্যযুগীয় বীরত্বের পূর্বগামী। স্পেনের কবিতা ছন্দ ও প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রতি অনুভূতি পরায়ণতার জন্য বিখ্যাত ছিল। *মুওয়াশশাহ* ও *জাজল* নামে গীতিধর্মী কোরাস জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। উভয় গীতিকবিতাই সমবেত গানের জন্য প্রয়োজনীয় সঙ্গীত ধারার উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল এবং তা সমবেত ভাবেই গাওয়া হত। সুর সঙ্গীত ও কাব্যের মধ্যে একটা ঐক্যবজায় রেখে চলত।

চারণ কবিদের মধ্যে গ্রাম্য রূপকথা বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এ ধরনের একজন প্রখ্যাত চারণ কবি ছিলেন আবু বকর ইবনে কুর্যমান (মৃ. ১১৬০ খ্রিস্টাব্দ)। তিনি পায়ে হেঁটে হেঁটে শহরে শহরে ঘুরে মহান ব্যক্তিদের প্রশস্তিপূর্ণ গান গেয়ে বেড়াতেন। এগুলোকে সাধারণভাবে লোকসঙ্গীত বলা হয়। তাৎক্ষণিক সঙ্গীত রচয়িতাদের হাতে পড়ে থাকা *জাজল* কে তিনি সাহিত্যিক গুণসম্পন্ন আঙ্গিকের মর্যাদায় উন্নীত করেছিলেন। *মুওয়াশশাহ* নামে লোক সঙ্গীতের শুধু উন্নতিই ঘটেনি বরং তা স্পেন থেকে উত্তর আফ্রিকা ও প্রাচ্যের দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। লোক সঙ্গীতে যারা অশেষ খ্যাতি অর্জন করে তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন আবু আল আব্বাস আল তুতীলী (মৃ. ১১২৯ খ্রিস্টাব্দ) । ইহুদি ধর্মত্যাগী মুসলমান সেভিলের অধিবাসী ইব্রাহিম ইবনে সাহল (মৃ. ১২৫১ / ১২৬০ খ্রিস্টাব্দ) ছিলেন এ ধারার আর এক বিশিষ্ট কবি।[৩১]

এছাড়া *মুওয়াশশাহ* বা লোক সঙ্গীত রচয়িতাদের মধ্যে অপর বিশিষ্ট কবি মুহম্মদ ইবনে ইউসুফ আবু হায়য়ান (১২৫৬ খ্রিস্টাব্দ-১৩৪৪ খ্রিস্টাব্দ)। তিনি ছিলেন বার্বার সম্প্রদায়ের এক বহুভাষিক ব্যক্তি ও গ্রানাডার অধিবাসী। তিনি ফার্সি, তুর্কি, মিসরীয়, খ্রিস্টানদের ভাষা ও ইথোপিয়া ভাষায় ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন। এগুলোর মধ্যে কেবলমাত্র তুর্কি ভাষার ব্যাকরণটি অক্ষত রয়েছে। জাজল বা গীতিকাব্য পরবর্তীকালে ইউরোপীয় কাব্যে প্রভাব বিস্তার করে। সাধারণভাবে আরবি কবিতাও বিশেষভাবে এই গীতি কবিতা দেশীয় খ্রিস্টানদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল এবং আত্মস্থ হবার কার্যকর উপাদানে

[৩১] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩১।

পরিণত হয়েছিল। *জাজল* ও *মুওয়াশশাহ* ভিল্যানসিকোর ক্যাস্টিলিয় কবিতার রূপ গ্রহণ করেছিল। সেখানে বড়দিনের ভজনগীতি সহ খ্রিস্টানদের প্রার্থনায় ব্যবহৃত হত।[৩২]

এই সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতার শেষের ছয় চরণ সাধারণত সিডিই, সিডিই ইত্যাদি ছন্দে উচ্চারিত হত এবং আন্দালুসিয় কবিদের রচনাবলিতে বিশেষত্ব আরবি জাজলে-ই তা লক্ষ করা যায়। আল কাজবিনি (মৃ. ১২৮৩ খ্রিস্টাব্দ) জোর দিয়েই বলেছেন যে, দক্ষিণ পর্তুগালের শিলব (সিলভেস) এ এমনকি কৃষকরাও পরিস্থিতি অনুযায়ী কবিতা রচনা করতে পারত। এর থেকে আধুনিক লেবাননের কায়রোয়ানদের কথা মনে পড়ে যায়। স্বত:স্ফূর্তভাবে এই ধরনের লোকসঙ্গীত সৃষ্টি করতে পারত এবং যে লোক সঙ্গীতের অনকগুলিকেই তারা এখন ও জাজল ও মুওয়াশশাহ্ বলে থাকে।[৩৩]

আট শতকে স্পেনীয় ভাষায় দেহাতীত ভালবাসাকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্য গড়ে উঠেছিল তা আরবীয় কাব্যেরই একটি বিশেষ অবদান। এগারো শতকে দক্ষিণ ফ্রান্সে এ ধরনের কাব্যচর্চার উল্লেখ পাওয়া যায়। তারা সুন্দর কল্পনা শক্তির মাধ্যমে মানুষের হৃদয়ের কম্পিত ভালবাসার অনুভূতি প্রকাশ করতেন। বারো শতকে ফ্রান্সে প্রভাঁস প্রদেশে প্রেমমূলক গীতিকবিদের আবির্ভাব ঘটে। তারা জাজল গায়কদের অনুকরণ করেছিলেন। তারা তাদের সমসাময়িক দক্ষিন প্রদেশের জাজল গায়কদের অনুকরণ করেছিলন। আরবের নজির অনুকরণ করে হঠাৎই দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপে দেবী-মহিমা চর্চার উদ্ভব ঘটে।

প্রথম দিককার ইউরোপীয় সাহিত্যের মহত্তম স্তম্ভ সেন দা রোলা-র সৃষ্টি হয়েছিল ১০৮০ খ্রিস্টাব্দের আগে এবং এর মধ্যে দিয়ে পশ্চিম ইউরোপে একটি নতুন সভ্যতার সূচনা হয়েছিল। ঠিক যেমন ভাবে মুসলিম ধর্মাবলম্বী স্পেনের সাথে সামরিক যোগাযোগ ও হোমারের কবিতার মধ্যে দিয়ে গ্রিক সভ্যতার সূচনা হয়েছিল, পশ্চিম ইউরোপে অনেকটা সেই একই প্রক্রিয়ায় নতুন সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছিল।

আরবি ভাষায় একই অর্থবিশিষ্ট শব্দ সংখ্যা অধিক। বহু সুদীর্ঘ কবিতায় পর্যায়ক্রমে আদ্যন্তে একই মিত্রাক্ষর ব্যবহৃত হয়েছে। যা বর্তমানের চতুর্দশ কবিতাবলীর মত ভাষার মাধুর্য, উর্বর কল্পনা,

---

[৩২] খন্দকার মাশহুদ-উল-হাছান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১৮।

[৩৩] *তদেব*।

মনোরম প্রকাশ-ভঙ্গিতে এগুলো গ্রিক ও ল্যাটিনের সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা অপেক্ষা নিকৃষ্ট নয়। প্রাসাদগুণ আরব কবিতার এক প্রধানতম মোহিনী শক্তি।

কবিতা আন্দালুসিয়ার মূরদের জীবনযাত্রার প্রধান আকর্ষণ ছিল। তাদের মানসিক উন্নতি এর চারিদিকে আবর্তিত হত। স্পেনীয় আরব ইতিহাসগুলো কবিতায় পরিপূর্ণ ছিল। বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে খালদুনের ছাড়পত্র কবিতায় লিখতে হয়। প্রবীন ও নবীন কবিদের সংখ্যা মূর শাসিত স্পেনে ছিল সংখ্যাতীত।

ঐতিহাসিক S. Lanepoole বলেন, "There never was a time in Europe when poetry became so much the speech of every-body."[৩৪] ("ইউরোপে এমন এক সময় এসেছিল যখন কবিতা প্রত্যেক ব্যক্তির বাচন মাধ্যম ছিল"।) আবেগপ্রবণ স্পেনীয় আরবগণ প্রেম সম্পর্কিত কবিতাকে অধিক প্রাধান্য দিত। এর মাধ্যমেই মধ্যযুগের সিভালরীর পূর্বাভাস দেখা যায়। আর.এ. নিকলসন স্পেনীয় কবিতা সম্বন্ধে বলেন, "স্পেনীয় আরব কবিতার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে রোমান্টিক ভাব প্রবণতা বা মধ্যযুগীয় সিভালরীয়র মন মানসিকতা পূর্বসুরি যা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি আধুনিক যুগের মত সচেতনতার ইঙ্গিত বহন করে।"[৩৫]

আরবগণ প্রধানত ব্যঙ্গগীতি কবিতা, সংক্ষিপ্ত ব্যঙ্গ কবিতা, প্রণয় কবিতা, করুণ শোক গাঁথা ও সমর সঙ্গীত রচনা করত। সাম্রাজ্যের পতনকালে স্পেনীয় কবিরা মদ্যপানের আনন্দ সম্বন্ধে সনেট কবিতাও লিখত। যেমন- সেভিলের ইবনে সায়দেব এর মদ্যোৎসব সম্বন্ধীয় কবিতা খুবই জনপ্রিয় ছিল। জায়দুনের ইউরোপীয় জীবন চরিত লেখকগণ তাকে টিবুলাস ও পেট্রার্কের সাথে তুলনা করেন।

প্রকৃত অর্থে মুসলিম দর্শনের সূত্রপাত হয় আব্বাসিয় আমলে। মানব মনীষার প্রয়োগে জড় জগতের সৃষ্টির প্রকৃত কারণ নির্ণয়ই আরব দর্শন শাস্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল। দর্শন হচ্ছে যৌক্তিক পদ্ধতিতে সত্যে উপনীত হবার রাস্তা। আরবি দর্শন মূলত কুরআন ও হাদিস ভিত্তিক হলেও পূর্ববর্তী পর্যায়ে গ্রিক, পারস্য ও ভারতীয় বেদান্ত তারা মুসলিম দর্শন, ধর্মতত্ত্ব এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের উপর আরবগণ মৌলিক চিন্তার খোরাক পান। পরবর্তী পর্যায়ে ঐশ্বরিক ধর্মের উপর ভিত্তি করে তারা মৌলিক

---

[৩৪] Stanely Lanepoole, *The Moors in Spain* (Lahore: The Publishers United Ltd.,1959), P. 147.

[৩৫] R.A. Nicholson, *Literary History of the Arabs* (London: T.Fisher Unwin,1914), P. 416.

চিন্তাকে প্রসারিত করে। এ কারণে মুসলিম দার্শনিকদের দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। (১) ইসলামি দার্শনিক; যেমন : ইমাম আলী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, জাফর আস সাদেক, ইমাম আল রাজী, ইমাম গাজ্জালী প্রমুখ। (২) এরিস্টটলীয় পন্থী; যেমনঃ আল কিন্দী, আল ফারাবী, ইবনে সিনা, ইবনে রুশদ প্রমুখ।[৩৬]

দর্শন শাস্ত্রে স্পেনীয় মুসলমানগণ অসাধারণ অনুসন্ধিৎসা, মননশীলতা ও বুৎপত্তি জ্ঞানের যে দৃষ্টান্ত রেখেছেন তা অনুকরণীয়। তাদের দর্শনের প্রতি অসামান্য প্রীতি ছিল এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপনে সহায়ক হয়েছিল। গ্রিক দর্শনকে ইউরোপে পরিচিত করার যে পদক্ষেপ তারা গ্রহণ করেন তার ফলেই পাশ্চাত্য দর্শন ব্যাপকতা লাভ করে। হিট্টি যথার্থই বলেন, "স্পেনের আরবদের বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে সর্বাধিক কৃতিত্ব লক্ষ্য করা যায় দার্শনিক চিন্তাধারায়। গ্রিক দর্শন থেকে সংগৃহীত দর্শন শাস্ত্রের সূত্রগুলো তারা এবং পূর্ব দেশীয় মুসলিম দার্শনিকগণ ল্যাটিন ইউরোপে প্রসারিত করে সর্বশেষ ও সুষম সেতুবন্ধন তৈরি করে এবং সে সাথে ধর্মবিশ্বাস ও যুক্তিবিদ্যা, ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করে তারা তাদের মৌলিক অবদান রাখেন।"[৩৭]

এরিস্টটল ও প্লেটোর ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন মূর শাসিত স্পেনের দার্শনিকগণ। তাদের কাছে এরিস্টটল, প্লেটো ও কুরআন প্রত্যেকেই ছিল সত্য। কিন্তু সত্য একটাই হওয়া উচিত। আর সেই কারণেই তিনটির মধ্যে ঐক্য সাধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং সেই কাজে তারা নিজেদেরকে নিয়োজিত করে। খ্রিস্টান পণ্ডিতগণও একই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। কিন্তু তাদের ধর্মতত্ত্বের গোঁড়ামি ও রহস্যময়তার জন্য তাদের কাজ অনেক বেশি শক্ত হয়ে গিয়েছিল। গ্রিকদের সৃষ্ট দর্শনশাস্ত্র ও হিব্রু ধর্ম প্রচারকদের দ্বারা উদ্ভাবিত একেশ্বরবাদী ধর্ম ছিল প্রাচীন পশ্চিমি ও পূর্বদুনিয়ার সবচেয়ে মূল্যবান ঐতিহ্য।[৩৮]

মধ্যযুগে বাগদাদ ও আন্দালুসিয়ার মুসিলম চিন্তানায়কদের চিরন্তন গৌরব ছিল এই যে, দুটি ধারার চিন্তার মধ্যে তারা ঐক্য সাধন করেছিল এবং তা ইউরোপে প্রেরণ করেছিল। পরবর্তী যুগের ধর্মতত্ত্ব এবং বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক চিন্তার উপর এর প্রভাবের কথা বিচার করলে তাদের অবদানকে অত্যন্ত

---

৩৬ ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৯।

৩৭ P.K. Hitti, *Op. cit.*, P. 579-80.

৩৮ খন্দকার মাশহুদ-উল-হাছান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩৪।

গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হত। পশ্চিম ইউরোপে এই নতুন দার্শনিক চিন্তার উপর এর প্রভাবের কথা বিচার করলে তাদের অবদানকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হত। পশ্চিম ইউরোপে এই নতুন দার্শনিক চিন্তার অনুপ্রেবেশের ফলে সেখানে *অন্ধকার যুগ* এর অবসান এবং জ্ঞানচর্চার ঊষাকালের সূচনা হয়।[৩৯]

আরবীয় দর্শনচিন্তার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক ঐতিহ্যের সাথে নতুন পরিচয়ের দ্বারা ত্বরান্বিত হয়ে জ্ঞানচর্চা ও দর্শনচর্চায় ইউরোপীয়দের আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছিল। তার ফলেই তাদের মধ্যে একটি স্বাধীন ও দ্রুতগতিতে বিকাশ মান বৌদ্ধিক জীবন গড়ে উঠে যার ফল আমরাও ভোগ করছি। এরিস্টটল ও প্লেটোর ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন মূর শাসিত স্পেনের দার্শনিকগণ। কুরআন ও হাদিসের মূল সূত্রগুলো উপক্ষো করে গ্রিক প্রভাবে এ সমস্ত দার্শনিকগণ ধর্মতাত্ত্বিক সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেন। এছাড়া তাদের চিন্তা ভাবনার মধ্যে প্রাকৃতিক সূত্র অন্তর্ভুক্ত ছিল।

আমিনুল ইসলাম বলেন, “তারা গ্রীক দর্শনের প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন। গ্রিক দর্শনের সঠিক ও প্রামাণিক জ্ঞান লাভের জন্য তারা মূল গ্রন্থাবলি অনুবাদের কাজে হাত দেন। সঠিক সন্ধানে তারা ‘প্রতিবর্ণীকরণ’ পদ্ধতি অনুসরণ করেন। তাছাড়া মূল কাজ বিকৃত হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল। এ সম্প্রদায়ের চিন্তাবিদদের *ফালাসিফা* বা দার্শনিকবৃন্দ বলে অভিহিত করা হয়। এ সম্প্রদায় এরিস্টটলের প্রকৃত ও সঠিক জ্ঞানের প্রত্যয় নিয়ে অগ্রসর হন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে প্রাকৃতিক ঘটনাবলি অধ্যয়নে নতুন আগ্রহ সৃষ্টি হয়।”[৪০] *ফালসিফা*’দের মতবাদের সাথে কুরআন ও হাদিস ভিত্তিক দর্শনের যথেষ্ট প্রভেদ দেখা যায়।

মূর দার্শনিকরা বলতেন যে, অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা থেকে উৎপন্ন আইনের দরুন প্রাকৃতিক ঘটনাবলি পরপর আসতে হয়। তারা অলৌকিক ঘটনার সম্ভাবনা স্বীকার করতেন না। আল্লাহর অবিশ্রান্ত মধ্যবর্তিতা সম্বন্ধে প্রাচীনকাল থেকে লোকের যে প্রিয় ধারণা আছে, তারা তা ত্যাগ করেন। স্বর্গীয় দূত ও দৈত্যের আবির্ভাবকে তারা অত্র লোকের ভয় ও আত্মবিশ্বাস জনিত দৃষ্টিভ্রম বলে বিদ্রুপ করতেন। ধর্মবিধি ও অনুষ্ঠান পদ্ধতি সুবিধাজনক চাতুরি ও দাঙ্গাবাজির কৌশল বলে বিবেচিত হত। Theory of Origin তার নিজ শক্তিতে বাড়তে থাকে এবং তা থেকেই প্রাণের সঞ্চার হয়।

---

৩৯ খন্দকার মাশহুদ-উল-হাছান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩৪।

৪০ আমিনুল ইসলাম, *মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯১), পৃ. ১৮।

আঠারো শতকে লর্ড মন বোড্ডা Evolution প্রচার করেন, যা বর্তমান যুগে চার্লস ডারউইন চাতুর্যের সাথে তা প্রমাণ করেন। কিন্তু এরা কেউই ক্রম বিকাশ বাদের মৌলিক আবিষ্কারক ছিলো না। মনবোড্ডা ও ডারউইনের শত শত বছর পূর্বে মূর দার্শনিকগণ এর মূল সূত্র প্রকাশ করেন। এ প্রসঙ্গে S.P. Scott এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য, "The theory of Lord Monboddo promulgated in the eighteenth century and elaborated with such ingenuity by darwin in our time, was, it is evident, for from being original with either, for Moorish Philosophers had ages before leading principles."[৪১]

দর্শন শাস্ত্রে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন সলোমন বেন গ্যাব্রিয়েল (১২০১ খ্রিস্টাব্দ-১০৫৪ খ্রিস্টাব্দ)। দর্শনশাস্ত্রের মতবাদগুলো স্পেনে প্রকাশ্যে প্রচারিত হতনা। কিন্তু এগারো শতকে মালাগার ইহুদি দার্শনিক সলোমন বেন গ্যাব্রিয়েল এ সমস্ত সূত্র নীতি জনসমক্ষে প্রচার করেন। স্পেনীয় আরব দার্শনিকদের মধ্যে মালাগাবাসী ইহুদি সম্প্রদায়ভূক্তি বেন গ্যাব্রিয়েল শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। পশ্চিমি দুনিয়ায় নয়া প্লেটোনিক মতবাদের প্রথম মহান শিক্ষক বেন গ্যাব্রিয়েলকে প্রায়ই ইহুদি প্লেটো হিসেবে উল্লেখ করা হয়। তার পূর্ববর্তী ইরানে মাসাররার মত তিনিও ছিলেন এমপেডেক্লিস সৃষ্টি দর্শনচিন্তার অন্যতম প্রবক্তা। তৎকালীন সময়ের এক হাজার বছর পূর্বে আলেকজান্দ্রিয়ার হেলেনেস্টিক ইহুদি দার্শনিক ফিলোপ্লেটোর দর্শনতত্ত্বের প্রাচ্যের উপযোগী রূপদান করেছিলেন। পরবর্তীকালে সেই দর্শনতত্ত্বের খ্রিস্টিয় ও ইসলামিয় ধর্মবিশ্বাসের উপযোগী রূপ ও গ্রেকো-মুসলিম দর্শনের মাধ্যমে বেন গ্যাব্রিয়েলের দ্বারা তা পুনরায় পাশ্চাত্যের ক্লাসিক্যাল দর্শন মুসলিম দর্শনে অনুপ্রবেশ করে। তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থের নাম *ইয়ানবু আল হাওয়া* (জীবন-প্রসবন) যা ১১৫০ খ্রিস্টাব্দে Fonsvitae (জীবন-প্রসবন) নামে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। এই গ্রন্থ ইউরোপীয় মধ্যযুগীয় বুদ্ধিবৃত্তিতে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল এবং ফ্রান্সিসিসক্যাল অর্থ্যাৎ সেন্ট ফ্রান্সিস কর্তৃক স্থাপিত সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের স্কুলের দর্শনের পথিকৃত ছিল।[৪২]

বারো শতক ছিল মূর শাসিত স্পেনে দার্শনিকদের স্বর্ণযুগ। এই শতকের বিখ্যাত দার্শনিক আবু বকর মুহম্মদ ইবনে ইয়াহিয়া ইবনে বাজ্জাহ (মৃ. ১১৩৮ খ্রিস্টাব্দ)। তিনি ছিলেন একাধারে দার্শনিক, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, সঙ্গীতজ্ঞ এবং এরিস্টটলের সূত্রের প্রবক্তা। তাঁর দর্শন শাস্ত্রের গ্রন্থাবলির মধ্যে

---

৪১ Samuel Parsons Scott, *History of the Moorish Empire in Europe,*Vol.I (Philadelphia and London: J.B. Lippincott Co., 1904) P. 350.

৪২ খন্দকার মাশহুদ-উল-হাছান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩৪।

বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে *তদবীর আল মুতাওয়াহিদ*।[৪৩] এ গ্রন্থে গ্রিক দর্শনের প্রভাব সুস্পষ্ট। বর্তমানে এই গ্রন্থটি অবলুপ্ত। কেবল হিব্রু ভাষায় অনূদিত গ্রন্থে এটি সংযোজিত আছে। হিব্রু ভাষায় বইটির নাম *ডি রোজমাইন সলিটারি, দ্যা রেজিম অব দি সলিটারি*। কোন সাহায্য না পেয়েও মানুষ সেই পরম ভাবের সঙ্গে মিলনের মধ্যে দিয়ে মানুষের আত্মা কিভাবে ধীরে ধীরে নৈতিক বিশুদ্ধতা অর্জন করে তা শিক্ষা দেওয়াই দর্শনের উদ্দেশ্য।

ইবনে বাজ্জাহ মানুষের আত্মার সাথে খোদার সত্তার একীভূত করার কথা বলেন। আমিনুল ইসলাম বলেন, "ইবনে বাজ্জাহ শুধু আত্মার অমরত্বই সমর্থন করেননি; বরং তিনি একথাও বলেছেন যে, মানুষের আত্মা কোন স্বতন্ত্র দ্রব্য নয়, বরং গোটা মানবতার অংশ বিশেষ; দেহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আত্মা তিরোহিত হবেনা। মৃত্যুর পরেও তার অস্তিত্ব অব্যাহত থাকবে এবং কৃতকর্মের জন্য পরকালে পুরস্কার বা তিরস্কার লাভ করবে।"[৪৪] গোঁড়াপন্থী মুসলিম দার্শনিকগণ ইবনে বাজ্জাহকে নাস্তিক বলে অভিহিত করেছেন।

বারো শতকের প্রথম ভাগে ইবনে বাজ্জাহর শিষ্য আবু বকর মুহম্মদ ইবনে আব্দুল মালিক ইবনে তুফাইল শ্রেষ্ঠ এরিস্টটলপন্থী দার্শনিক ছিলেন। তিনি গ্রানাডার অধিবাসী ছিলেন এবং একাধারে দার্শনিক, গণিতজ্ঞ, কবি ছিলেন। তাকে নয়া প্রেটোনিয়া দার্শনিক বলা হত। তাঁর প্রখ্যাত দর্শন গ্রন্থের নাম *হায় ইবনে ইয়াকযান*। এটি একটি মৌলিক দার্শনিক কাহিনী। এ গ্রন্থে ইবনে তোফায়েল বলেন যে, বাইরের কোন শক্তির প্রভাব ব্যতিরেকে একজন মানুষ তার স্বীয় যোগ্যতা সৃষ্টিকর্তার উপর তার নির্ভরশীলতা উপলব্ধি করতে পারে। এর অন্তর্নিহিত ভাবধারা রহস্যবাদী এই দার্শনিক ফারাবি ও ইবনে সিনার কাছে ঋণী। ইবনে তোফায়েলের মতবাদ ১৬৭১ খ্রিস্টাব্দে এডওয়ার্ড পিকক কর্তৃক ল্যাটিন ভাষায় বিশেষ করে ওলন্দাজ (১৬৭২ খ্রিস্টাব্দ), রুশ (১৯২০ খ্রিস্টাব্দ) এবং স্পেনীশ (১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ) ভাষায় অনুবাদ করা হয়। অনেক ঐতিহাসিকের মতে, ইবনে তোফায়েলের রচনা রবিনসন ক্রুশোর কাহিনীকে প্রভাবান্বিত করে। এ সমস্ত কাহিনীতে মানুষের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস বিধৃত হয়েছে।

পশ্চিমা বিশ্বের উপর প্রভাবের নিরিখে বিচার করে হিস্পানো আরব জ্যোতির্বিদ চিকিৎসক ও এরিস্টটলের তত্ত্বের ভাষ্যকার আবু আল ওয়ালীদ ইবনে আহমদ ইবনে রুশদ কে শ্রেষ্ঠ মুসলিম দার্শনিক বলে অভিহিত করা হয়। ইবনে রুশদ ১১২৬ খ্রিস্টাব্দ কর্ডোভার অভিজাত পরিবারে জন্ম

[৪৩] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪০।
[৪৪] আমিনুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০১।

গ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র, গণিত ও দর্শনের প্রতি গভীর আগ্রহ ও একাগ্রতা প্রদর্শন করেন। উক্ত ত্রিবিধ শাস্ত্রে তিনি অসামান্য বুৎপত্তি লাভ করেন। ইবনে তোফায়েল তাকে মারাক্কেশে আবু ইয়াকুব ইউসুফ এর দরবারে নিয়ে যান এবং সেখানে সুলতান এই দার্শনিক ও চিকিৎসককে সাদরে অভ্যর্থনা জানান। রাজ চিকিৎসকদের স্থান পেলেও দর্শনচর্চা করার জন্য প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের বিরোধী বলে সন্দেহ করে ইবনে রুশদকে ১১৯৪ খ্রিস্টাব্দে নির্বাসিত করেন ইউসুফের পুত্র ও তাঁর উত্তসুরি আল মানসুর; যদিও পরবর্তীতে মুক্ত হন।[৪৫]

মূর শাসিত স্পেনের প্রাকৃতিক দার্শনিকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান ছিলেন ইবনে রুশদ। তিনি এতটাই জ্ঞান তাপস ছিলেন যে সারাজীবনে শুধুমাত্র বাসর রাত এবং পিতার মৃত্যুর দিন অধ্যয়ন করেননি। চিকিৎসাবিজ্ঞান অপেক্ষা দর্শন শাস্ত্রে তিনি অধিকতর অবদান রেখেছেন। অন্যান্য তত্ত্বের ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ ছাড়াও তার মূল দার্শনিক গ্রন্থ ছিল *তাহাফুত আল তাহাফুত* (অসম্বদ্ধতার অসম্বদ্ধতা)। ইমাম গাজ্জালীর যুক্তিবাদকে আক্রমণ করে *তাহাফুত আল ফালাসিফাহ* (দার্শনিকদের অসম্বদ্ধতা) নামে যে বইটি লিখেছেন, তার প্রত্যুত্তরেই রুশদের বইটি লেখা হয়েছিল। এই লেখনীর জন্যই তিনি পরিচিত ছিলেন সর্বাধিক কিন্তু শুধুমাত্র মুসলিম দুনিয়াতেই সীমাবদ্ধ ছিলেন। মধ্যযুগের একজন তত্ত্ব ব্যাখ্যা দাতা হলেন সেই লেখক যিনি পূর্বের লেখাকে পট-ভূমি ও কাঠামোরূপে ব্যবহার করে একটি বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক রচনা সৃষ্টি করতে পারেন।[৪৬]

ইবনে রুশদের তত্ত্ব ব্যাখ্যাও রচনা সৃষ্টি করতে পারেন। ইবনে রুশদের তত্ত্ব ব্যাখ্যাও ছিল তেমনি বেশ কয়েকটি গবেষণামূলক প্রবন্ধের সমষ্টি এবং এগুলি রচনার ক্ষেত্রে তিনি আংশিক ভাবে এরিস্টটলের রচনার শিরোনাম ব্যবহার করেছেন ও সেগুলোর বিষয়বস্তুকে সহজ ভাষায় প্রকাশ করেছেন। তিনি গ্রিক ভাষা না জানায় এরিস্টটলের উপর রচিত গ্রন্থাবলির জন্য বাগদাদের দার্শনিক আল কিন্দি, আল ফারাবির রচিত গ্রন্থাবলির উপর নির্ভর করতে হয়।

ইবনে রুশদের এরিস্টটলের উপর প্রণীত রচনাবলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য *জা'মী* (সারাংশ), *তালকীস* (পুনরায় চালু করা), *তাফসীর* বা *সার* (ভাষ্য)। আরবি ভাষায় তার লিখিত মৌলিক গ্রন্থাবলি সংরক্ষিত না হলেও হিব্রু ভাষা এবং হিব্রু ভাষা থেকে ল্যাটিনে তরজমাকৃত গ্রন্থাবলিতে ইবনে রুশদের দার্শনিক চিন্তা ধারার যথেষ্ট নজির পাওয়া যায়। একথা নি:সন্দেহে বলা যায় যে, পাশ্চাত্যে

---

[৪৫] খন্দকার মাশহুদ-উল-হাছান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩৬।
[৪৬] *তদেব*।

ইবনে রুশদের রচনাবলির মাধ্যমে এরিস্টটলের দর্শন পরিচিত লাভ করে। এরিস্টটল সম্পর্কে তাঁর প্রশংসা ও সম্মানবোধ ছিল অতি উঁচু। তাঁর মতে, এরিস্টটল ছিলেন একজন অতিশয় পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি। সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ এবং অকাট্য সত্যের অধিকারী একজন দার্শনিক চিন্তাবিদ এবং রুশদের দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ প্যারিসের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয় হিসেবে অনুমোদিত হয়।[৪৭]

বারো শতকের মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যে ইবনে রুশদের পরেই ইবনে মায়মুন এর স্থান। ইহুদি বংশোদ্ভূত দার্শনিক ও কর্ডোভার নাগরিক আবু ইমরান মুসা ইবনে মায়মুন (১১৩৫ খ্রিস্টাব্দ-১২০৪ খ্রিস্টাব্দ)। হিব্রু ভাষায় তাকে মোশেহ বিন মায়মুন, ল্যাটিন ভাষায় মাইমোনাইডস বলা হয়। হিট্টি তাকে "The most famous of the Hebrew Physicians and Philosophers of the whole Arabic epoch."[৪৮] (অর্থাৎ "সমগ্র আরবি যুগের হিব্রু চিকিৎসক এবং দার্শনিকদের মধ্যে তিনি খুবই খ্যাতিমান ব্যক্তি ছিলেন।") তিনি একাধারে চিকিৎসক, জ্যোতির্বিদ, ধর্মতাত্ত্বিক সর্বোপরি একজন দার্শনিক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁর প্রখ্যাত দার্শনিক গ্রন্থ *দালালাত আল হায়রীন* নামে পরিচিত ছিল।[৪৯] এ বইটিতে তিনি ইহুদি ধর্মতাত্ত্বিক ও মুসলিম এরিস্টটলিয়ানিজম বা আর ও বিস্তৃত অর্থে বিশ্বাস ও যুক্তির মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। দূরদর্শিতাকে তিনি দৈহিক অভিজ্ঞতা বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বাইবেলের মৌলবাদী চিন্তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বৈজ্ঞানিক চিন্তার সমর্থকের ভূমিকা পালন করেছেন। ফলে রক্ষণশীল ধর্মতাত্ত্বিকদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয় এবং তারা মাইমুনের গ্রন্থটিকে *যালালাহ* (ভুল পরামর্শ) বলে প্রচার করেন।[৫০]

স্বাধীনচেতা হলেও তাঁর দার্শনিক মতবাদ ইবনে রুশদের মতবাদ দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিলেন। তিনিও গ্রিক ভাষা জানতেন না; আরবি অনুবাদের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। তিনি পরমাণু তত্ত্বের সৃষ্টিতত্ত্ব প্রচার করেছিলেন। তিনি দর্শনের মৌলবাদী তত্ত্ব প্রচার করতেন। মৌলবাদী তত্ত্বে তিনি প্রচার করেছেন আল্লাহ সর্বসৃষ্টিকর্তা। তিনি তাঁর লেখনীগুলো হিব্রু অক্ষরে এবং আরবি ভাষায় লিখেছিলেন এবং হিব্রু ভাষায় ও পরে আংশিকভাবে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। যার প্রভাব পরবর্তীতে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের উপর পড়েছিল। এর মাধ্যমেই আঠারোশতক পর্যন্ত ইহুদিদের চিন্তাভাবনা কৌলিন্যে

৪৭ আমিনুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৩।
৪৮ P.K. Hitti, *Op. cit.*, P. 584.
৪৯ ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৬।
৫০ খন্দকার মাশহুদ-উল-হাছান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩৮।

পৌঁছেছিল। এছাড়া ইবনে মায়মুনের প্রভাব খ্রিস্টান সাধুদের উপর পড়েছিল। আলবার্টস ম্যাগনাস, ডানসস্কটাস, স্পিনোজা এবং কান্টের রচনাতেও লক্ষ্য করা যায়।[৫১]

এ সময়কার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দার্শনিক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন আবু মুহম্মদ ইবনে অলী মহীউদ্দিন ইবনুল আরাবি (১১৬৫ খ্রিস্টাব্দ-১২০৪ খ্রিস্টাব্দ)। ইসলামী সুফিবাদের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় দূরকল্পী প্রতিভা। ইসলামী পাশ্চাত্য জগতে তিনি ছিলেন মুসলিম দার্শনিকদের দিকপাল। ঔজ্জ্বল্যপূর্ণ বা মেকী এমপেডোক্লিনের নিওপ্লেটোনিক ও সর্বেশ্বরবাদী চিন্তার প্রতিনিধি ইবনে আরাবি সুফি আন্দোলনকে দূরকল্পী দর্শনের কাঠামো আকৃতি দিয়েছিলেন। তিনি পাঁচশতের ও বেশি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর দার্শনিক মতবাদ সম্বলিত গ্রন্থের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য *হিকমত আল ইসরাক* (ঔজ্জ্বল্যের জ্ঞান)।[৫২]

মরমীবাদী দর্শনের প্রতীভূ ইবনুল আরাবির মতবাদ মধ্যযুগীয় চিন্তাধারায় প্রকট প্রভাব ফেলেছিল। একমাত্র রুমী ছাড়া ইসলামের জন্য কোন মরমীবাদী সৃষ্টিশীলতা কিংবা নিগূঢ়তার দিক দিয়ে ইবনে আরাবিকে অতিক্রম করতে পারেননি। তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারা শুধু আরবি ভাষা ভাষী দেশ সমূহেই বিস্তার লাভ করেনি বরং মরমী কবি দার্শনিকদের দেশ পারস্যে সর্বেশ্বরবাদী সুফীদের মধ্যে ব্যাপক আলোড়নের সৃষ্টি করে। ইসলামে বৈরাগ্যের কোন স্থান নেই এবং ইবনুল আরাবি বৈরাগ্যবাদ থেকে ইসলামি দর্শনকে মরমী সূফীবাদে রূপান্তরিত করেন।[৫৩]

খ্রিস্টান দার্শনিকগণ যেমন- রেমন্ডলাল ও দান্তের রচনাবলিতে ইবনুল আরাবির প্রভাব লক্ষ করা যায়। ঐতিহাসিকগণ তাঁকে ইসলামের একজন শ্রেষ্ঠ সাধক বা ওলি বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু তার সমালোচকেরা তাকে একজন উগ্রধর্মবিরুদ্ধ ব্যক্তি হিসেবে তিরস্কার করেছেন। আমিনুল ইসলাম বলেন, "তাঁর দার্শনিক মতবাদে রক্ষণশীল ও সর্বেশ্বরবাদ এ উভয় উপকরণই পাওয়া যায়। তবে প্রকৃত পক্ষে তিনি যতটুকু ছিলেন রক্ষণশীল তার চেয়ে বেশি ছিলেন সর্বেশ্বরবাদী। তাঁর দর্শনকে *তত্ত্ববিদ্যা* (Ontology), *লোগোস মতবাদ* (Doctrine of Logos), *জ্ঞানবিদ্যা* (Epistemology) ও

---

[৫১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩৯।
[৫২] খন্দকার মাশহুদ-উল-হাছান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩৯।
[৫৩] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৭।

ধর্ম এ ক'টি শিরোনামে আলোচনা করা যেতে পারে।"[৫৪] তিনি মধ্যযুগীয় ইউরোপে যেমন সন্ন্যাস জীবন ধারার উদ্ভব করেন বারো শতকে মুসলিম প্রাচ্যে এ ধরনের জীবন ধারা লক্ষ করা যায়।

ইবনুল আরাবি মরমীবাদ ও সর্বেশ্বরবাদ এর মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন যার প্রবক্তা ছিলেন ইবনে মাসারা এবং বেন গ্যাব্রিয়েল। এই মতাদর্শের অপর একজন পথিক ছিলেন আল সুহরাওয়াদি।[৫৫] ইবনুল আরাবি যে দার্শনিক মতবাদ প্রচলিত করেন তা তার পূর্ববর্তী মরমীবাদী দার্শনিকদের দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিল। এতদসত্ত্বেও তিনি যে স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তাকে সাধারণভাবে *ইসরাকী* (ঔজ্জ্বল্যপূর্ণ) বলা হয়। নিও প্লেটোনিজম এবং সর্বেশ্বরবাদী মতবাদের প্রেরণায় তিনি যে মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন তার মূল সূত্র হচ্ছে; সৃষ্টিকর্তা হচ্ছে আল্লাহ এবং অশরীরী আত্মা। আলোচ্ছটা বা এই আলোচ্ছটা বস্তু জগতের সমস্ত কিছুতে বিকিরণ হয়। তার এই মতবাদের আরও সঠিক ব্যাখ্যা এভাবে দেখা যায়, একমাত্র একটি পরম সত্তা। এই পরম সত্তাকে দুই ভাবে দেখলে পাই মূল, অবিভাজ্য, চিরন্তন সত্তা হচ্ছে 'হক' এবং প্রাকৃতিক বস্তুকে আমরা বলি 'খালক' বা 'প্রতিভাস'। মূলকথা পরম সত্তা থেকে বস্তু সত্তার উদ্ভব। মরমি কবি ও সর্বেশ্বরবাদী দার্শনিকগণ এ দুটির মধ্যে একটি সমন্বয় বা মিলন দেখতে পান।

ইবনুল আরাবির মতে, পরমসত্তা এবং প্রতিভাসিক সত্তার মধ্যে কোনো প্রভেদ নাই, যা আছে তা হলো পার্থক্য সূচক গুণাবলির প্রভেদ। পাশ্চাত্য দর্শন যেমন নিউ প্লেটোনিজম এর প্রভাবে কখনও কখনও আল্লাহর গুণাবলি তাঁর সৃষ্টিজীবের মধ্যে নিহিত বা আরোপিত দেখা যায়। এ অবস্থাকে দেবত্বারোপক কুরআনে আল্লাহ শোনেন, দেখেন প্রভৃতির উল্লেখ আছে। ইবনে আরাবি এ সমস্ত উক্তিকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁর মতে, এ সমস্ত গুণ অনুসৃত।[৫৬]

প্রচলিত রক্ষণশীল ইসলামী চিন্তা ধারা থেকে ইবনুল আরাবির মতবাদে বেশ পার্থক্য রয়েছে। তার মতে, আল্লাহ কোন কিছুই সৃষ্টি করেননি। বস্তু নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করে তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। এক্ষেত্রে আল্লাহ যা করেন তা হলো এই যে, তিনি একটি জিনিস গুলো নিজস্ব স্বরূপ ও আল্লাহর ইচ্ছায় সৃষ্টি হয়ে থাকে। ইবনুল আরাবি তার শিষ্যদের আল শেখ আল আকবর অর্থ্যাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা হিসেবে সমৃদ্ধ। হিট্টি তাঁকে "The greatest speculative genius of Islamic Sufism." (অর্থ্যাৎ, "ইসলামি

[৫৪] আমিনুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১২।
[৫৫] খন্দকার মাশহুদ-উল-হাছান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩৯।
[৫৬] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৮।

সুফিবাদে চিন্তাশীল দার্শনিকদের মধ্যে তিনি ক্ষণজন্মা ব্যক্তি ছিলেন।")[৫৭] মিরাজ সম্বন্ধে তিনি তাঁর *আল ফুতুহাত আল মাক্কী* (মক্কার রহস্য উদঘাটন) গ্রন্থের ১৬৭ পরিচ্ছেদে *কিমিয়াত আল সাতাদাহ* (সৌভাগ্যের পরশমণি) নামে পরিচিত, নবী (সা.) এর উর্ধ্বগমন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন। একই বিষয়বস্তুর উপর তার অপ্রকাশিত অপর গ্রন্থ, *আল ইসরা ইলা মাকাম আল আসরা* (সবচেয়ে মহানুভবের উদ্দেশ্যে নৈশযাত্রা) তে তিনি মিরাজের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ইবনে আরাবির এ ধরনের ব্যাখ্যাকে বাতেনী বলা হয়। বাতেনী 'জাহেরী' বা প্রকাশ্যে বা যা চাক্ষুস দেখা যায় তার বিপরীত।[৫৮]

ইবনে হাযমের মত ইবনুল আরাবি প্রচলিত ধর্ম মতের পরিপন্থি মতবাদ ব্যক্ত করেন। এজন্য তিনি সমালোচিত হয়েছেন। মিরাজের উপর ভিত্তি করে তার রচিত প্রখ্যাত গ্রন্থের ভিত্তিতে ইতালির প্রখ্যাত কবি দান্তে তার "*Divine Comedy*" রচনা করেন। প্রচলিত, প্রতিষ্ঠিত, রক্ষণশীল, ইসলামী ধর্মীয় ও দার্শনিক মতবাদের অন্তরায় ছিল ইবনুল আরাবির চিন্তাধারা। তিনি কলেমা এর উপর অধিক জোর দেন এবং সব কিছু যুক্তি তর্ক প্রাজ্ঞিক প্রক্রিয়ায় ইসলামের বিধানগুলো বিশ্লেষণ করেন। তিনি সুফিদরবেশদের গূঢ় জ্ঞান এর উপর সঠিক গুরুত্ব আরোপ করেন। ইবনুল আরাবির মতে, আবশ্যিক জ্ঞান তিন ধরনের। যথা : (১) প্রাত্যক্ষিক (Perceptual) অবধারন (২) কতিপয় বৌদ্ধিক (Intellectual) অবধারণ (৩) স্বজ্ঞান প্রসূত অবধারণ। ইবনুল আরাবির দর্শন *ওয়াহদাত আল উজুদ* সর্ব গুণাবলি একত্রিকরণ, যা মুতাজিলা সম্প্রদায় বিশ্বাস করে।[৫৯]

ইবনে আরাবি মনে করেন যে, পৃথিবীর সমস্ত বস্তু একটি ধ্যান ধারণা বা '*আইন সাবিদা*' থেকে উদ্ভূত এবং সমস্ত জ্ঞানের উৎস সৃষ্টিকর্তা। সেখানেই সবকিছুর সৃষ্টি সেখানেই বিলুপ্তি। এ ক্ষেত্রে রক্ষণশীল মতবাদের সাথে আরাবির চিন্তাধারার কোন সংঘাত নেই। সর্বেশ্বর বাদী হিসেবে তিনি আধুনিক দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি খোদার সত্তা (যাত) এবং গুণাবলি (সিফাত) এর মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি। তিনি মনে করেন, প্রত্যেক সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহর গুণাবলি বিদ্যমান এবং রাসূল (সা.) সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব। তিনি '*ফানা*' এবং '*বাকায়*' বিশ্বাস করতেন। এটি ছিল অতীন্দ্রিয়বাদের পরিচায়ক। মরমী সুফিবাদকে তিনি সুদূর প্রসারী করেন। গোঁড়াপন্থী মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন।

স্রষ্টাকে চাক্ষুস দর্শন সম্ভাবনা; ইবনুল আরাবি স্রষ্টার আবির্ভাবে দিব্যদর্শনে বিশ্বাসী। তাঁর *হিকমাত আল ইসরার*'র দার্শনিক মতবাদ পারস্য ও তুর্কি সুফি সাধক ও দার্শনিকদের প্রভাবান্বিত করে। বিশেষ করে

[৫৭] P.K. Hitti, *Op. cit.*, P. 586.

[৫৮] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৮।

[৫৯] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৯।

মসনভী রচয়িতা জালালউদ্দিন রুমী একথা স্পষ্ট করে বলেছেন। ইবনুল আরাবির মতবাদ পাশ্চাত্য দার্শনিকদের প্রবলভাবে অনুপ্রাণিত করে। এ প্রসঙ্গে দার্শনিক দানস্ স্কটাস, রজার বেকন এবং রেমন্ডলালের নাম উল্লেখযোগ্য। ইবনুল আরাবির অনুসারিদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মুর্সিয়াবাসী আবু মুহম্মদ আবদ আল হক ইবন সা'বিন (১২১৭ খ্রিস্টাব্দ-৬৯ খ্রিস্টাব্দ) তার খ্যাতির জন্য তিনি কুতুবউদ্দিন (ধর্মের সেতু জয় করে এনে দেয়ার জন্য) উপাধি লাভ করেন। তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থের নাম *আল আযইউবা আন আল আসিলাহ আল সিকিলিয়া* (সিসিলিয় প্রশ্নাবলির জবাব)। ইবনুল আরাবির মতাদর্শে ইবনে সা'বিন বস্তুর চিরন্তনতা আর অবিনশ্বরতা ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশদ ব্যাখ্যা দেন। তাঁর অপর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হচ্ছে, *আসরার আল হিকমা মাসরিকীয়া* (আলোকভিত্তিক দর্শনের রহস্য)।[৬০] এ বইটি এখনও অপ্রকাশিত।

মূলত গ্রিক দর্শন চিন্তা ইউরোপে স্পেনের মুসলিম দার্শনিকই পরিচিত করান। তাঁরা ধর্ম ও বিজ্ঞান, যুক্তিবিদ্যা ও বিশ্বাসের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে দর্শন শাস্ত্র বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

উপরোল্লিখিত দার্শনিক ছাড়াও স্পেনের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের মধ্যে ছিলেন আবু সিনা ইবনে মাসারাহ, ইয়াহিয়া বিন ইয়াহিয়া, ঈসা বিন দিনার, আবু ইব্রাহিম, আবু বকর বিন মুয়াবিয়া, সাঈদ বিন রাবিক প্রমুখ।

মুসলিম স্পেনীয় ভূ-খন্ডে ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে প্রাচ্যের চেয়ে পিছিয়ে থাকলেও অল্পকিছুকালের মধ্যেই স্পেনীয় মুসলিম ইতিহাসবেত্তাদের মধ্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিষয় বিশেষ করে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আঞ্চলিক সাহিত্যের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করতে উৎসাহী ছিলেন স্পেনের মুসলিম ইতিহাস বেত্তাগণ।

মুসলিম স্পেনের সর্বাধিক পরিচিত ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ছিলেন আবু বকর ইবনে উমর (মৃ. ৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ)। তিনি কর্ডোভার অধিবাসী ছিলেন। তিনি আন্দালুসিয়ার মুসলিম বিজয় ও রাজনৈতিক ঘটনাবলির উপর নির্ভরযোগ্য এবং অতি প্রাচীন গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থটি *তারিখ ইফতিতা আল আন্দালুস* নামে পরিচিতি।[৬১] এই গ্রন্থে তিনি মুসলমানদের স্পেন বিজয় থেকে শুরু করে তৃতীয় আব্দুর রহমান এর শাসনামলের প্রথম দিক পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন। এছাড়া তিনি ব্যাকরণবিদ হিসাবেও অনেক খ্যাতি অর্জন করেন। ক্রিয়া পদের ধাতুর রুপ সংক্রান্ত গবেষণা মূলক গ্রন্থ তিনি প্রথম রচনা করেন। তিনি ইবনে আল কুতিয়া নামে সর্বাধিক পরিচিতি।

---

৬০ P.K. Hitti, *Op. cit.*, P. 587.

৬১ ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৯।

ইবনে আল কুতিয়াহ ছাড়াও মূর শাসিত স্পেনে অপর একজন ঐতিহাসিক বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর নাম আবু মারওয়ান হায়্যান ইবনে খালাফ ওরফে ইবনে হায়্যান (৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ-১০৭৬ খ্রিস্টাব্দ)। তিনিও কর্ডোভার অধিবাসী ছিলেন। তিনি কমপক্ষে ৫০টি গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে *আল মাতিন* শীর্ষক সারগর্ভ গ্রন্থটি ৬০ খন্ডে রচিত। দূর্ভাগ্যবশত তার গ্রন্থাবলির মধ্যে শুধু মাত্র একটি গ্রন্থ পাওয়া যায়। এটির নাম *আল মুকতাবিস ফি তারিখ রিজাল আল আন্দালুস*। তিনি ছাড়াও মুহাহ্হিদ যুগের উপর ১২২৪ খ্রিস্টাব্দে ইতিহাস রচনা করেন মরক্কো বাসী। ঐতিহাসিক আবেদ আল ওয়াহিদ আল মারাক্কুশী। তিনিও কিছুকাল স্পেনে ছিলেন।[৬২]

জীবন বৃত্তান্ত রচনায় আন্দালুসিয়ার পণ্ডিতগণ সমান বুৎপত্তি অর্জন করেন। প্রথম শ্রেণির জীবন-বৃত্তান্ত রচনাকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আবু আল ওয়ালিদ আব্দুল্লাহ ইবনে মুহম্মদ ইবন আল ফারাবী (৯৬২ খ্রিস্টাব্দ-১০১৩ খ্রিস্টাব্দ)। কর্ডোভায় তিনি একজন গবেষক ও শিক্ষক ছিলেন। তিনি জ্ঞান সাধনার জন্য ত্রিশ বছর বয়সে কায়রোয়ান, কায়রো, মক্কা ও মদিনায় ভ্রমণ করেন। দেশে ফিরে এসে তিনি ভ্যালেন্সিয়ার কাজী হিসেবে যোগদান করেন। তাঁর অসংখ্য রচনার মধ্যে মাত্র একটি অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে। এই গ্রন্থটির নাম *তারিখ উলামা আল আন্দালুস*। মহামূল্যবান গ্রন্থে আন্দালুসের প্রখ্যাত মনীষীদের জীবনবৃত্তান্ত রয়েছে।[৬৩] পরবর্তী কালে এ গ্রন্থটির পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করেন আবু আল কাসিম খালাফা ইবনে আব্দুল মালিক ওরফে ইবনে বাশকুওয়াল।

১১৩৯ খ্রিস্টাব্দে *আল সিলাহ ফি তারিখ আইমাত আল আন্দালুস* রচিত হয়। তিনি কমপক্ষে পঞ্চাশটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি ১১০১ খ্রিস্টাব্দে কর্ডোভায় জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১১৮৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর প্রণীত *সিলাহ'*র উপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে আবু আব্দুল্লাহ মুহম্মদ ইবনে আল আব্বার (১১৯৯ খ্রিস্টাব্দ-১২৬০ খ্রিস্টাব্দ) যে গ্রন্থ রচনা করেন তা *আল তাকমিলা লি কিতাব আল সিলাহ* নামে পরিচিত। তিনি ভ্যালেনসিয়ার অধিবাসী ছিলেন। ইবনে আব্বার মুসলিম স্পেনের একজন স্বনামধন্য ইতিহাসবিদ ছিলেন। তিনি অন্য একটি জীবনী সংকলন রচনা করেন। যার নাম *আল হুল্লাহ আল সিয়ারা*। জীবনবৃত্তান্ত রচয়িতা ইবনে আব্বার তৎকালীন মূর পণ্ডিতদের সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ দিয়েছেন।[৬৪]

---

[৬২] খন্দকার মাশহুদ-উল-হাছান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২২।
[৬৩] P.K. Hitti, *Op. cit.*, P. 565.
[৬৪] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫১।

শিক্ষিত স্পেনীয় আরবরা যে মূল্যবান বিশ্বকোষটি ব্যবহার করতেন, তার নাম ছিল *বুগিয়াত আল মুলতামিস ফী তারিখ রিজাল আল আন্দালুস*।[৬৫] এই বিশ্বকোষ রচনা করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন *আল যাব্বি*। তিনি আবু জাফর আহমদ ইবনে ইয়াহিয়া নামে সুপরিচিত।

ইতিহাস গ্রন্থ ও জীবন বৃত্তান্ত রচনায় যিনি অশেষ খ্যাতি অর্জন করেন তিনি হচ্ছেন আবু আল কাসিম সাঈদ ইবনে আহমদ আল তুলাইতুলী (১০২৯ খ্রিস্টাব্দ-১০৭০ খ্রিস্টাব্দ)। তিনি *তাবাকাত আল উমাম* (জাতিগুলির শ্রেণিবিভাগ) শীর্ষক গ্রন্থটি রচনা করেন। এই গ্রন্থটি পরবর্তীকালে আল কিফতীর রচনাবলি প্রণয়নে সহায়তা করে। আল কিফতী ছাড়াও ইবনে আবী উসাইবিয়া এবং ইবন আল ইবরী আল তুলাইতুলীর গ্রন্থ দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। আল তুলাইতুলী তলেদোর রাজবংশ বানু জুনুনের কাজী ছিলেন। তিনি একাধারে গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ ও ঐতিহাসিক ছিলেন।[৬৬]

পশ্চিমাঞ্চলীয় ইসলামে আবির্ভূত সাহিত্যিক উৎকর্ষতার এবং ঐতিহাসিক বিচার বিশ্লেষণে যে দুই ব্যক্তি খ্যাতির সর্বাধিক শীর্ষে আরোহণ করেন তারা হচ্ছেন নাসিরিয় পরিবারের দুই বন্ধু ও সহকর্মী ইবনে আল খতিব এবং ইবনে খালদুন।[৬৭] লিসান আল দীন ইবনে আল খাতিব (১৩১৩ খ্রিস্টাব্দ-১৩৭৪ খ্রিস্টাব্দ) সিরিয়া থেকে আগত একটি আরব পরিবারের সদস্য ছিলেন। তিনি সর্বমোট ৬০টি গ্রন্থ রচনা করেন এবং এগুলো বেশির ভাগই ইতিহাস, কবিতা, ভূগোল, চিকিৎসা, দর্শন এবং সুকুমার সাহিত্য সংক্রান্ত। এ সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে গ্রানাডার ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থটি সুপরিচিত। এটি *আল ইহাতা ফি আখবার গ্রানাডা*। এটি দুই খন্ডে রচিত হয়।

জ্ঞানচর্চা ও গবেষণা, মননশীলতা, একনিষ্ঠ সাধনার জন্য যিনি জগৎ বিখ্যাত হয়েছেন তাঁর নাম আব্দুর রহমান ইবনে খালদুন (১৩৩২ খ্রিস্টাব্দ-১৪০৬ খ্রিস্টাব্দ)। তিউনিসের এক স্পেনীশ মুসলিম পরিবারে তাঁর জন্ম।[৬৮] তাঁর বংশধরেরা তের শতক পর্যন্ত সেভিলে বসবাস করেন। তিনি প্রথমে ফার্সে বিভিন্ন সরকারি পদে চাকরি করেন। কিন্তু ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে ১৩৬১ খ্রিস্টাব্দে গ্রানাডার সুলতান ষষ্ঠ মুহম্মদের অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। তিনি সুলতানের বিশেষ দূত হিসেবে ক্যাস্টিলিয় দরবারে যান। ইবনে খালদুনের অসামান্য প্রভাব ও খ্যাতি সহ্য করতে না পেরে তাঁর সহকর্মী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ইবনুল খাতিব তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন। এর ফলে তাকে ১৩৬৩ খ্রিস্টাব্দে মাগরীবে চলে যেতে

---

[৬৫] P.K. Hitti, *Op. cit.*, P. 566.

[৬৬] *Ibid*, P. 569.

[৬৭] *Ibid*, P. 566-67.

[৬৮] ইবনে খালদুন, *আল-মুকাদ্দিমা*, ১ম খণ্ড, বাংলা অনুবাদ, গোলাম সামদানী কোরায়শী (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮২), পৃ. ৩।

হয়। এখানে তিনি বিভিন্ন সময়ে বহু দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং অবশেষে কালাত ইবনে সালমাহতে অবসর জীবন যাপন করেন।

কালাত ইবনে সালমায় তিনি গবেষণা, অধ্যয়ন ও গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৩৭৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি অসংখ্য মূল্যবান ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৩৮২ খ্রিস্টাব্দে তিনি হজ্জ পালনের জন্য বের হন কিন্তু কায়রোতে এসে কিছুদিন বিখ্যাত আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। ১৩৮৪ খ্রিস্টাব্দে কায়ারোতে মালিকী সম্প্রদায়ের প্রধান কাজী হিসেবে নিযুক্তি লাভ করেন। মামলুক সুলতান আল জাহির বারকুকের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি এইপদ লাভ করেন। ১৪০১ খ্রিস্টাব্দে সুলতান আল নাসিরের সাথে তৈমুর লঙ্গ সম্মানিত অতিথি হিসেবে ইবনে খালদুনকে অভ্যর্থনা জানান। যার ফলে তৈমুর লঙ্গের উত্তর আফ্রিকায় বিজয়াভিযান স্থগিত করেন। এ প্রেক্ষিতে ইবনে খালদুনের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে মর্যাদা বৃদ্ধি করে। এসব ঘটনা ইবনে খালদুনের ইতিহাস রচনায় বিশেষ প্রভাব ফেলে। তিনিই সর্বপ্রথম ইতিহাস প্রণয়নের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও প্রণালি উদ্ভাবন করেন । তাঁর প্রণীত *কিতাব আল ইবার ওয়া দিওয়ান আল মুবতাদা ওয়া আল খবর ফী অ্যায়াম আল আরব ওয়া আল আযম ওয়া আল বার্বার* (নির্দেশমূলক উদাহরণের বই এবং আরব, পার্সীয় ও বার্বার ইতিহাসের মুখ্য ও গৌণ ঘটনার সমাহার) বিশ্ব বিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থ।

তিনি মুসলিম জগতের একটি নিখুঁত ও ধারাবাহিক ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রণয়ন করে গেছেন। এ গ্রন্থটি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডটি *মুকাদ্দামা* (প্রবন্ধাবলীর ভূমিকা সমূহ)। এ খণ্ডে তিনি যে কেবল রাজা ও রাজ বংশীয়দের ইতিবৃত্ত সংকলন করেছেন এমন নয়, তিনি মরু প্রবাসী সাধারণ বেদুঈন থেকে আরম্ভ করে আরবের উচ্চ বংশোদ্ভূত কুরাইশদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যাবতীয় ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করেছেন। ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে তিনি তাঁর মত ব্যাখ্যা করেন *আল মুকাদ্দামাহ* খণ্ডে। এটি ছিল পৃথিবীর ইতিহাস বিষয়ক তাঁর বিশাল গ্রন্থের ভূমিকা। তিনি ছিলেন ইসলামের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক, দার্শনিক এবং প্রথিতযশা সমাজতাত্ত্বিক। *মুকাদ্দামা* গ্রন্থটির জন্যই তিনি খ্যাতিলাভ করেছেন। এই গ্রন্থটিতে তিনি সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক বিকাশের একটি তত্ত্বের উপস্থাপনা করেছেন। এই তত্ত্বে তিনি আবহাওয়া ও ভৌগোলিক পরিবেশের প্রাকৃতিক ঘটনাবলি এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিগুলির ভূমিকাকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়েছেন।

কোন মানুষ যদি জাতীয় অগ্রগতি ও অবক্ষয়ের নিয়ম রচনা করার চেষ্টা করেন, তাকে অবশ্যই ইবনে খালদুনকে ইতিহাসের প্রকৃত সীমা ও চরিত্রের আবিষ্কারক বা সমাজতাত্ত্বিক বিজ্ঞানের প্রকৃত জনক

বলে গণ্য করতে হত। তিনি নিজেই নিজের সম্বন্ধে এমন দাবী করেছেন। কোন ইউরোপীয় তো নয়ই, এমন কি কোন আরব লেখক ও ইতিহাসের এমন দর্শনগত ও সর্বব্যাপক চিত্র তুলে ধরতে পারেননি।

ইবনে খালদুনের ইতিহাস সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা ছিল অভিনব। তাঁর সময় পর্যন্ত ধারণা করা হত যে, ইতিহাসের প্রধান উৎস দু'টি; ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা। কিন্তু তিনি জ্ঞানতত্ত্বকে ইতিহাসের প্রধান উৎস হিসেবে গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠা করেন যে, ইতিহাস শুধু রাজা-বাদশাহদের কাহিনী অথবা বীর পুরুষদের জীবনালেখ্য নয়। তিনি বলেন যে, ইতিহাস একটি ঘটনাসমূহের সমষ্টি। ইতিহাসে গতিময়তা রয়েছে, স্থবিরতা নয়। ইতিহাস স্থান, কাল, পাত্র নিয়ে গঠিত হয় এবং মূল স্রোতধারায় এটি বিলীন হয়। এটি ধারাবাহিক নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। ইবনে খালদুন ইতিহাসকে বিজ্ঞানের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন এবং তা দর্শনের একটি অংশ। সেদিক থেকে বিচার করলে তাঁর ঐতিহাসিক দার্শনিক আখ্যা সঠিক।[৬৯]

হিট্টি ইবনে খালদুনকে "সমাজতত্ত্বের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলেছেন।"[৭০] ("Real founder of the science of sociology.") সমসাময়িক কালে সমাজতত্ত্বভিত্তিক ইতিহাস রচনা কোন আরব অথবা ইউরোপীয় এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁর সমাজ বিবর্তন ছিল খুবই বিজ্ঞান-সম্মত। তিনি মনে করেন যে, সমাজের শুরু যাযাবর জীবন থেকে। আদি অবস্থা থেকে মানুষ ক্রমশ বিবর্তনের মাধ্যমে বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে সভ্যতার দিকে অগ্রসর হয়। যাযাবর থেকে মানুষ সমাজবদ্ধ জীবনে রূপান্তরিত হয়। এই সমাজবদ্ধ নাগরিক জীবনের এক পর্যায়ে রাজবংশের উদ্ভব হয়। যেমন-সুমেরীয়দের মধ্যে হয়েছিল। এভাবে শাসক শ্রেণির আবির্ভাব ঘটে।

সমাজ জীবন থেকে অর্থনৈতিক জীবনে উত্তোরণ হয় এবং মানুষ বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হয় জীবিকা অর্জনের জন্য। শ্রমের বিভাজনের মূল লক্ষ্যই হলো উৎপাদনমুখী অর্থনীতি। আবার এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে শোষকশ্রেণি এবং শোষিত শ্রেণি। এই শ্রেণিভেদ থেকে সমাজের অবক্ষয় শুরু হয় এবং পরিসমাপ্তি ঘটে শ্রেণি সংগ্রামে। ইবনে খালদুন সমাজের এই বিবর্তনকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি প্রাকৃতিক কারণকে বিশেষ গুরুত্ব দেন। তার একদিকে যেমন কোন অগ্রদূত ছিলনা, অপর দিকে কোন অনুগামীও ছিলনা। তিনি এমন একটি নতুন বিজ্ঞানের পথ সুগম করেছিলেন, যার শুধু মূল সমস্যাগুলোই তিনি নির্দেশ করেছিলেন এবং পরামর্শ দিয়েছিলেন প্রকৃত বিষয়বস্তু অনুসন্ধান

---

[৬৯] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৪।
[৭০] P.K. Hitti, *Op. cit.*, P. 568.

পদ্ধতি সম্পর্কে। লেনিন ও এঞ্জেলস কর্তৃক ব্যাখ্যাকৃত ও সম্প্রসারিত কার্ল মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে ইবনে খালদুন উপর্যুপরি প্রকল্পের যৌক্তিক বিকাশ বলা চলে।[৭১] নি:সন্দেহে তাঁকে একজন মৌলিক চিন্তাবিদ বলা যায়। তাঁর সমস্ত ঐতিহাসিক গ্রন্থ পাঠে এটাই প্রমাণিত হয় যে, তাঁর ন্যায় সূক্ষ্মদর্শী ঐতিহাসিক অদ্যবধি জন্মগ্রহণ করেননি।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় স্পেনের মুসলমানরা যে উন্নতি সাধন করেছিল ইউরোপের কোথায়ও তা দেখা যায়নি। ইতিহাস চর্চার পাশাপাশি মূরগণ ভূগোলশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিল। মূলত ভূগোল বিজ্ঞানে তারা বিশেষ অবদান রেখেছিল। একাদশ শতকের হিস্পানো আরব ভৌগোলিকদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আল বাক্‌রী ও আল ইদ্রিসী। আবু উবাইদ আব্দুল্লাহ ইবনে আবদ আল আজীজ আল বাক্‌রী কর্ডোভায় বসবাস করতেন। পশ্চিমাঞ্চলীয় মুসলিম ভৌগোলিকদের তিনি পথিকৃত ছিলেন। ১০৯৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন। একাধারে কবি সুকুমার সাহিত্যিক ভূগোলবিদ ও ভাষা বিজ্ঞানী আল বাকরীর খ্যাতির মূল উৎস ছিল তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ *আল মাসালিক ওয়া মামালিক* (অর্থ্যাৎ সড়ক ও রাজ্য সমূহের ইতিবৃত্ত)। গ্রন্থটিতে ঠিক ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না শুধু ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। গ্রন্থটি আংশিক পাওয়া গেছে।[৭২]

বারো শতকের বা বলা যায় মধ্যযুগের সবচেয়ে প্রতিভাবান গ্রন্থাকার ও মানচিত্রবিদ ছিলেন আল ইদ্রিসী। ১১৪০ খ্রিস্টাব্দে তিনি সিউটায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পূর্ণনাম ছিল আব্দুল্লাহ মুহম্মদ ইবনে মুহম্মদ আল ইদ্রিসী। তিনি ছিলেন এক স্পেনীয়। তিনি সিসিলির নর্মান বংশীয় রাজা দ্বিতীয় রজারের রাজত্বকালকে দীপ্যমান করে তুলেছিলেন। ঐতিহাসিক হিট্টি তাকে *রজারের দরবারের প্রধান অলংকার* বলে অভিহিত করেছেন।[৭৩] তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের নাম *নুযহাত আল মুসতাক ফি ইখতিরাক আল আফাক*। এই গ্রন্থটি সংক্ষেপে *কিতাব রজার বা রজার গ্রন্থ* নামে পরিচিত। এই গ্রন্থে টলেমী এবং আল মাসুদীর গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে রচিত এবং সেই সাথে পর্যটকদের বর্ণনা থেকে সংগৃহীত তথ্যাবলী সংযোজিত হয়। উল্লেখ্য যে, এই মহামূল্যবান গ্রন্থ রচনা ছাড়াও তিনি তার পৃষ্ঠপোষক দ্বিতীয় রজারের জন্যে রূপার একটি গোলক মানচিত্র এবং নভোমন্ডল তৈরি করেন।

---

[৭১] আমিনুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ, ২৬৩।

[৭২] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৫।

[৭৩] P.K. Hitti, *Op. cit.*, P. 569.

আল ইদ্রিসীর পর ভূগোল শাস্ত্রে আর কোন মৌলিক রচয়িতা দেখতে না পাওয়ায় পর্যটকদের ভ্রমণ কাহিনীই তখন ভূগোল বইয়ের ভূমিকা পালন করেছিল। মূরগণ ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখে যশস্বী হয়েছেন।

প্রখ্যাত হিস্পানো-আরব পর্যটকদের মধ্যে বিশেষভাবে খ্যাতি অর্জন করেন ইবনে যুবাইর। তার পুরো নাম আবু আল হুসাইন মুহম্মদ ইবনে আহমদ। তিনি ১১৪৫ খ্রিস্টাব্দে ভ্যালেনসীয়ায় জন্ম গ্রহণ করেন এবং জাতিভায় শিক্ষা অর্জন করেন। তিনি ১১৮৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১১৮৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত গ্রানাডা থেকে মক্কা পর্যন্ত দীর্ঘপথ পরিভ্রমণ করেন এবং এই ভ্রমণ কালে তিনি মাগরেব, মিসর, সিরিয়া, ইরাক এবং সিসিলি দ্বীপে যান। মুসলিম পর্যটক এবং ভ্রমণ বৃত্তান্তকারীদের মধ্যে ইবনে যুবাইর ছিলেন সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান এবং তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত দ্বাদশ শতকের মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থার কথা জানা যায়। তিনি দ্বিতীয় বারের মতো ১১৮৯ খ্রিস্টাব্দ হতে ১১৯১ খ্রিস্টাব্দ এবং তৃতীয়বারের মত ১২১৭ খ্রিস্টাব্দে প্রাচ্যদেশ ভ্রমণ করেন। তৃতীয়বার ভ্রমণে বের হয়ে আলেকজান্দ্রিয়া পৌছান এবং সেখানে ১২১৭ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ *রিহালা*। আরব সাহিত্যে ভ্রমণবৃত্তান্ত গ্রন্থাবলির মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।[৭৪]

ইবনে যুবাইর ব্যতিত অপর একজন প্রখ্যাত হিস্পানো-আরব ভূগোল বিশারদ ও পর্যটক বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর নাম হচ্ছে আবু হামিদ মুহম্মদ আল মাযিনী (১০৮০/৮১-১১৬৯/৭০ খ্রিস্টাব্দ)। তিনিও গ্রানাডার অধিবাসী ছিলেন এবং ১১৩৬ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়া ভ্রমণ করেন। তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে ভল্গা নদীর তীরবর্তী বসবাসকারী বুলগারদের ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে জানা যায়। অধুনালুপ্ত অতিকায় হাতির প্রস্তরীভূত দাঁত দূরবর্তী খাওয়ারিজমে রপ্তানি করা হত এবং তার থেকে সেখানে চিরুনি এবং জহরত বা প্রসাধনীর জিনিস রাখার ছোট ছোট কৌটো তৈরি করা হত।[৭৫]

মরক্কোর আরব অধিবাসী ও মধ্যযুগের মুসলিম ভূ-পর্যটক ইবনে বতুতার ভ্রমণ বৃত্তান্তের কাছে ইবনে যুবাইর ও আল মাজিনির ভ্রমণ বৃত্তান্ত ম্লান হয়ে গেছে। ইবনে বতুতা ১৩০৪ খ্রিস্টাব্দে উত্তর আফ্রিকার মরক্কোর তাঞ্জিয়ারে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩৭৭ খ্রিস্টাব্দে মাররাকুশে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর প্রকৃত নাম আবু মুহম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বতুতা। একথা বলা যায় যে, তিনি মুসলিম পর্যটকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং তাঁর ভ্রমণ সূচি অপরাপর পর্যটকদের তুলনায় অধিক ব্যাপক। মাত্র একুশ বছর বয়সে স্বদেশ ত্যাগ করে মুসলিম বিশ্ব পরিভ্রমণে বের হন এবং চীন দেশও ভ্রমণ করেন। তিনি বারবার হজ্জ

---

[৭৪] *Ibid*, P. 569.

[৭৫] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৬।

উপলক্ষে মক্কা গিয়েছিলেন সেই সূত্রে প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন। চারবার আফ্রিকা পার হয়ে আরব, পারস্য, লিভেন্ট এবং কনস্টান্টিনোপল সফর করেন। পূর্ব দিকে সিংহল, বঙ্গদেশ, মালদ্বীপ, চীন দেশ তিনি ভ্রমণ করেন। ১৩৫৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি শেষবারের ভ্রমণে আফ্রিকার প্রত্যন্ত প্রান্তে গিয়েছিলেন। কাজানের কাছে বুলগার শহর ও ভলগা ভ্রমনকাহিনীটি সম্ভবত একমাত্র অতিরঞ্জন।[৭৬]

এছাড়া ইবনে বতুতা ১৩৩৩ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলকের আমলে দিল্লী আগমন করেন। সেখানে তিনি কাজির পদ অলংকৃত করেন এবং দীর্ঘ আট বছর তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কথিত আছে যে, সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলক ইবনে বতুতাকে চীন দেশে দূত হিসেবে প্রেরণ করার প্রয়াস পান। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়নি। তিনি চট্টগ্রাম হয়ে সোনারগাঁয়ে উপস্থিত হন। তিনি সোনারগাঁয়ে ১৩৪৫ খ্রিস্টাব্দ-৪৬ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মোবারক শাহের আমলে আসেন এবং এখান থেকে সিলেটে যান। সিলেটে তিনি সুফি সাধক শাহজালালের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ইবনে বতুতার বর্ণনায় তৎকালীন বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার কথা জানা যায়। তিনি বলেন যে, তিনি সিলেট থেকে সোনারগাঁ পর্যন্ত পনেরো দিন ধরে জল পথে ভ্রমন করেন এবং নদীর দু’ ধারে জল সেচের জন্য ব্যবহৃত কাঠের চাকা, ফলের বাগান ও অনেক সুসমৃদ্ধ গ্রাম দেখতে পান। ঠিক যেমন তিনি মিসরের নীল নদের উভয় তীরে দেখেছিলেন। ইবনে বতুতা বলেন যে, সে সময় বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল খুবই উন্নত এবং জিনিসপত্রের দাম ছিল খুব কম। ইবনে বতুতা ছিলেন বিশ্ব পর্যটক বা Globe trotter এবং তিনি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ও ভ্রমণ করেন, যেমন- মালদ্বীপ।[৭৭]

পশ্চিমা বিশ্বের উপর স্পেনীয় আরবের ভূগোল চর্চার প্রভাব খুব একটা দেখা যায়নি। পৃথিবী গোলাকার এ তত্ত্বে স্পেনীয় আরবরা বিশ্বাস করত এবং মনে করত পৃথিবী গোলাকার না হলে নতুন বিশ্ব আবিষ্কার সম্ভব হতনা। এই তত্ত্বের উদ্যোক্তা ভ্যালেনসিয়ার অধিবাসী আবু উবাইদা মুসলিম আল বালানসী। দশ শতকের শুরুতেই তাঁর কর্ম জীবন বিকশিত হয়। স্পেনীয় আরবরা মনে করত ভূ-গোলার্ধের একটি কেন্দ্র আছে যা চারটি প্রধান কোণ থেকে সমগ্র দূরত্বে অবস্থিত। এই ধারণাটিকে এ্যারিনতত্ত্ব বলে। ১৪১০ খ্রিস্টাব্দে ল্যাটিন ভাষায় এই এ্যারিনতত্ত্বটি ছাপা হয়েছিল। এই তত্ত্বকে

[৭৬] খন্দকার মাশহুদ-উল-হাছান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২৫।
[৭৭] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৬।

বিশ্বাস করেই কলম্বাস মনে করেছিলেন, পৃথিবীর আকৃতি একটি নাশপাতি ফলের মত এবং এ্যারিনের বিপরীত দিকে পশ্চিম গোলার্ধে উচ্চভূমিতে অবস্থিত অন্য আর একটি কেন্দ্র আছে।[৭৮]

জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে স্পেনীয় মুসলমানদের অসামান্য কৃতিত্ব আছে। গ্রহ নক্ষত্রের গতি নির্ধারণ তাদের পরস্পরের সম্পর্ক ও পৃথিবীর সাথে তাদের সম্বন্ধ নিরুপনে, নিগূঢ় দার্শনিক সমস্যার সমাধান ও অপরাপর প্রাকৃতিক রহস্যের অনুসন্ধানে মূরদের অপরিসীম কৃতিত্ব ছিল। ফলিত জ্যোতিষের পুনরুভ্যদয় বিশেষত খ্রিস্টান জগতের উপর আরবদের প্রগাঢ় মানসিক প্রভাবই জ্যোতির্বিদ্যা খ্যাতিলাভের প্রধান কারণ।

ক্যালডিয়, ব্যাবিলনীয় ও প্রাচীন মিসরের লোকদের মত মূরেরা তাদের প্রার্থনাগারের একাংশ জ্যোতির্বিদ্যার জন্য বরাদ্দ রাখত। নমন, আস্তারলেব বা গ্রহ নক্ষত্রাদির তুঙ্গত্ব পরিমাপের যন্ত্র, ডায়োপট্টা বা আলোক বিষম গতি বিষয়ক যন্ত্র, ক্রান্তি ও সমরাত্রি দিন সম্পর্কীয় armil প্রভৃতি যন্ত্রপাতি মসজিদের উপর স্থাপিত হত। মসজিদ সংলগ্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই জ্যোতির্বিদ তাঁর গণনাকাল সম্পন্ন করতেন। হজ্জব্রত যেমন মুসলমানদের ভূগোল আলোচনায় উৎসাহ দেয়, ধর্মের প্রয়োজনে জ্যোতির্বিদ্যায় জ্ঞানলাভ ও তাদের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। কিবলা নির্ধারণ ও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের জন্য জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা প্রয়োজন হয়ে পড়ে।[৭৯]

একথা অনস্বীকার্য যে, স্পেনীয় আরবরা জ্যোতিষ শাস্ত্রে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। তারাই সর্বপ্রথম নির্ভূলভাবে বৎসরের দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করেন। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আপেক্ষিক গুরুত্ব ও নক্ষত্রের গতির নির্ঘন্ট প্রণয়ন করেন। টাইকোব্রাহের সাড়ে ছয়শত বছর পূর্বে স্পেনীয় আরবগণ চাঁদের ৪০ মিনিটের তৃতীয় বৈষম্য আবিষ্কার করেন। সূর্যের কক্ষের কেন্দ্র চ্যুতি (Ecentricity of the Sun's orbit), এর কক্ষের গতি (apogee), কক্ষ বক্রতা বা কক্ষরেখা ও বিষুব রেখার মধ্যবর্তী কোণের ক্রমিকহ্রাস (Obiquility of the ecliptic), ও সমরাত্রি দিনের প্রাগয়নের (Precession of the equinoxes) পরিমান তাদের দ্বারাই নির্ণীত হয়।

মূর শাসিত স্পেনে দশ শতকের মধ্যভাগ থেকে অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে কর্ডোভা, সেভিল এবং টলেডোর জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চার এক নতুন দিগন্ত রচিত হয়। কর্ডোভা, সেভিল ও টলেডোর শাসকবর্গ

---

[৭৮] খন্দকার মাশহুদ-উল-হাছান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২৫।

[৭৯] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৭।

জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চার প্রতি বিশেষ আনুকূল্য দেখিয়েছিলেন। স্পেনের স্বনামধন্য জ্যোতির্বিদদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আল মাজরিতি, আল জারকালি, ইবনে আফলা, আল বিতরুজী। মুজাফফর আলী বলেন, "মুসলিমগণ জ্যোতির্বিজ্ঞানকে *এলমে তানাবিম* বলে অভিহিত করতেন। এতে ফলিত জ্যোতিষ এবং গণিত জ্যোতিষ উভয়কেই বুঝাতো। ইবনে রুশদ গণিত জ্যোতিষকে প্রত্যক্ষৈকবাদ, নক্ষত্রবিজ্ঞান এবং ফলিত জ্যোতিষকে গণিত বিজ্ঞানমূলক নক্ষত্র, বিজ্ঞান নামে অভিহিত করেছেন।"[৮০]

বাগদাদের প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ আবু মাসারের প্রভাবে আন্দালুসিয়ার প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানিগণ মনে করতেন যে, জীবন ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী মানুষের সমস্ত কার্যকলাপ জ্যোতিষ বা নভোমন্ডল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই নক্ষত্রের প্রভাব সম্পর্কে পড়াশোনা অর্থ্যাৎ জ্যোতির্বিদ্যা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে নক্ষত্রের অবস্থান নির্ণয় এবং তাদের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমার পরিমাপকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। এ ধরনের জ্ঞান চর্চায় অবশ্যই ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করতে হত।[৮১] কোপারনিকাস ও কেপলারের বহুপূর্বে টলেডোর আল জারকালি'ই সর্বপ্রথম প্রস্তাব করেন যে, ব্যাপকভাবে গৃহীত টলেমী পদ্ধতির ভ্রমসংশোধনের জন্য ডিম্বাকার কক্ষ স্থাপনের প্রয়োজন।

মূর জ্যোতিষীগণ টলেমী মতবাদ অপেক্ষা এরিস্টটলের থিওরীর প্রধান্য দেন। এরিস্টটলের মতবাদের ভিত্তিতে তারা টলেমীর নভোমন্ডলের গতিবিধির সমালোচনা করেন। প্রাচ্যের জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষবিদ্যা স্পেনের মাধ্যমেই ল্যাটিনভাষী পশ্চিমী দুনিয়াকে প্রভাবিত করেছিল। মুসলিম জ্যোতির্বিদদের দ্বারা রচিত জ্যোতির্বিদ্যার প্রধান প্রধান বইগুলি স্পেনের মাটিতে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। তের শতকের দশম আলফানসোর উদ্যোগে সংকলিত অ্যাল ফোনসাইন সারণিকে স্পেনীয় আরব জ্যোতির্বিদ্যার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি বলে গণ্য করা হয়।[৮২]

প্রাচ্যের দেশগুলিতে তাদের সমধর্মাবলম্বীদের জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষবিদ্যা সংক্রান্ত রচনাবলির উপর ভিত্তি করেই স্পেনীয় আরব জ্যোতির্বিদেরা তাদের বইগুলি লিখেছিলেন।

---

[৮০] মুজাফফর আলী, *বিশ্ব সভ্যতায় মুসলিমদের দান* (ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ১৯৫৫), পৃ. ৯৫-৯৬।
[৮১] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৭।
[৮২] খন্দকার মাশহুদ-উল-হাছান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২৬।

আন্দালুসিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুসলিম বিজ্ঞানির মধ্যে আল কাশেম মাসলামা আল মাজরিতি'র নাম সর্বাগ্রে উচ্চারন করতে হয়। তিনি কর্ডোভায় ১০০৭ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আল খাওয়ারিজমীর জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত সারণি বিশোধিত করেন। তিনিই প্রথম পূর্ববর্তী পারস্যের ইয়াজিদেজার্দ যুগ থেকে ব্যবহৃত সারণিকে ইসলামি যুগের উপযোগী করে তুলেন এবং আরিন যার উৎপত্তি ভারতবর্ষের উজ্জয়ীনী শহর থেকে পূর্বে। পৃথিবীর গোলকের যে মধ্যরেখা বা মধ্যবর্তী নিরূপন করা হত তার পরিবর্তে কর্ডোভা ভিত্তিক মধ্যাহ্ন নির্ধারণ করে আল মাজরিতি অশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

উল্লেখ্য যে, ১১২৬ খ্রিস্টাব্দে বাথের এডিলাড আল খাওরিজমী প্রণীত সারণি ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। অপর একটি আল বাত্তানী কর্তৃক ৯০০ খ্রিস্টাব্দে প্রণীত হয় এবং তাটিভলীর অধিবাসী প্লেটো কর্তৃক ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়।[৮৩] আল মাজরিতি জ্যোতির্বিদ্যা অসামান্য খ্যাতি অর্জন করেন যার প্রমান তাঁর *আল হাসিব* পদবিতে। আল হাসিব অর্থ গণিতশাস্ত্রবিদ। গণিতশাস্ত্র এবং জ্যোতির্বিদ্যা অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত । আল মাজরিতির গণিতশাস্ত্রের বুৎপত্তি এরুপ ছিল যে তিনি এক্ষেত্রে ইমামের সম্মান লাভ করেন। তিনি আয়তন নির্ণয়সহ গণিতের সমস্ত ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তিনি অথবা কর্ডোভাবাসী তার শিষ্য আবু আল হাকাম আমর আল কারমানী (১০৬৫ খ্রিস্টাব্দ) মূরীশ স্পেনে ইখওয়ান আল সাফার মতবাদ প্রচলিত করেন।[৮৪]

ঐতিহাসিক S.P.Scott বলেন, "টলেডোর আল জারকালি সর্বপ্রথম মন্তব্য করেন যে, ব্যাপক ভাবে গৃহীত টলেমী পদ্ধতির ভ্রম সংশোধনের জন্য ডিম্বাকৃতি কক্ষ স্থাপনের প্রয়োজন, যা পরবর্তীকালে কোপারনিকাস ও কেপলার অনুসরণ করেন। বর্তমান জ্যোতির্বিদরা যা সঠিক বলে ঘোষণা করেন। আল জারকালির প্রাপ্তফল তার এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে।"[৮৫] ("Al-Zarkali of Toledo was the first to suggest the substitutions of the elliptical orbit to correct the errors of the generally accepted ptolemaie system, thus anticipating copernicus and keplen and the result be obtained was within a fraction of a second of the amount declared to be correct by the moderns astornomers".)

---

[৮৩] *তদেব*।

[৮৪] P.K. Hitti, *Op. cit.*, P. 570.

[৮৫] S.P. Scott, *Op. cit.*, Vol.III, P. 477.

আল জারকালি সূর্যের গতি নির্ধারণের চেষ্টায় কমপক্ষে ৪০২ বার পর্যবেক্ষণ গ্রহণ করেন। টলেডো সারণি নামে পরিচিত জ্যোতিষশাস্ত্রের জ্ঞান ভান্ডার কতিপয় মুসলিম ও ইহুদি জ্যোতিষীর অবদান ছিল। এদের মধ্যে আল জারকালি, আবু ইসহাক ইব্রাহিম ইয়াহইয়া বিশেষভাবে খ্যাতি অর্জন করেন। এ সমস্ত সারণিতে টলেমী এবং আল খাওয়ারিজমীর লব্ধ জ্ঞান সন্নিবেশিত ছিল, যা পরবর্তীকালে ক্রীমনার জেরার্ড ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন।

মার্সের রেমন্ড (১১৪০ খ্রিস্টাব্দ) আল জারকালির জ্যোতিষশাস্ত্রের গ্রন্থাবলি থেকে প্রভাবান্বিত হন। অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ নির্ধারণে আল জারকালি বিশেষভাবে অবদান রাখেন। ভূ-মধ্যসাগরের দৈর্ঘ্য সম্পর্কে টলেমী যে অতিরঞ্জিত ৬২ ডিগ্রি দেখিয়ে ছিলেন, তা আল খাওয়ারিজমী কেটে ৫২ ডিগ্রিতে নিয়ে আসেন। কিন্তু আল জারকালিই প্রথম এটি ৪২ ডিগ্রিতে সঠিকভাবে নির্ধারিত করেন। হিট্টি বলেন, "আল জারকালি নি:সন্দেহে তাঁর যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতিষশাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন।"[৮৬] ("Al-Zarkali was evidently the foremost astronomical observer of his age.") তিনি একটি উন্নত ধরনের আস্তরলেব প্রস্তুত করেন। এই যন্ত্র দ্বারা গ্রহ, নক্ষত্রের তুঙ্গত্ব পরিমাপ করা যায়। তার উদ্ভাবিত আস্তরলেব যন্ত্রের নাম *সুহিফা*।

আল জারকালি প্রথম নক্ষত্রের ভিত্তিতে সূর্যের দুরতম স্থানবিন্দু নির্ধারণ করেন। তাঁর পরিমাপ অনুযায়ী এটি ১২.০৪ ইঞ্চি। যদিও প্রকৃত পরিমাপ ১১.৮ ইঞ্চি। কোপারনিকাস তাঁর জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কিত গ্রন্থ *দ্য রেভুল্যুশেনিবাস অরবিয়াম কায়লেস্টিয়াম* এ আল বাত্তানী ও আল জারকালির নাম উল্লেখ করেন।

মূর শাসিত স্পেনে আল জারকালির পরেই জ্যোতির্বিদ্যায় বিশেষ স্থান দখল করেন আছেন জাবির ইবনে আফলা। তিনি তাঁর *কিতাব আল হায়া* (জ্যোতির্বিদ্যার বই) গ্রন্থে টলেমীর সূত্রগুলোর কঠোর সমালোচনা করেন। ক্রীমোনার জেরার্ড কর্তৃক তাঁর গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে। ইবনে আফলা যথার্থই বলেন যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্ররাজি, যেমন- বুধ ও শুক্র গ্রহের কোন দৃশ্যমান অক্ষরেখা (Visible Parallaxes) নেই।

ইবনে আফলার আরও একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ আছে যাতে গোলাকার ও সামতলিক ত্রিকোণমিতির উপর একটি অধ্যায় আছে। আমরা এখন ত্রিকোণমিতির অনুপাত অধ্যায় পাঠ করি। ইবনে

---

৮৬ P.K. Hitti, *Op. cit.*, P. 571-72.

আফলার প্রায় ২৫০ বছর পরে আল বাত্তানি তা জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। হিট্টি স্বীকার করেন যে, "বীজগণিত ও বৈশ্লেষিক জ্যামিতির মধ্যে ত্রিকোণমিতি মূলত আরবদের দ্বারাই উদ্ভাবিত হয়েছিল।"[৮৭] সুতরাং এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় জ্যোতিষশাস্ত্র ব্যতিত ইবনে আফলা ত্রিকোণমিতিতে বিশেষ অবদান রেখেছিলেন।

স্পেনীয় জ্যোতির্বিদদের মধ্যে সর্বশেষ স্বনামধন্য জ্যোতির্বিদ ছিলেন আল বিতরুজী। তাঁর পুরো নাম নূর আল দীন আবু ইসহাক আল বিতরুজী (মৃ.১২০৪ খ্রিস্টাব্দ)। তিনি ইবনে তোফায়েলের শিষ্য ছিলেন। তিনি তাঁর *কিতাব আল হায়া* গ্রন্থে নভোমন্ডলের নক্ষত্ররাজির আপেক্ষিক অবস্থান (Configuration of the heaventy bodies) সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেন। যদিও আল বিতরুজীকে জ্যোতির্বিদ্যার নতুন দিকপাল বলে মনে করা হয়, তবুও মূলত তাঁর সূত্রাবলী টলেমীর মতবাদের বিরোধী এবং এরিস্টটলের তত্ত্বের পুনর্গঠন করেন। বারো শতকের শেষ দিকে জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা ও আবহবিদ্যা সংক্রান্ত এরিস্টটলের বহু গ্রন্থ আরবি থেকে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। এ গ্রন্থগুলোতে এরিস্টটলের ভূগোল সংক্রান্ত চিন্তাভাবনার বর্হিপ্রকাশ ঘটেছে।

মূরগণই সর্বপ্রথম ইউরোপের মানমন্দির নির্মাণ করেন। ঐতিহাসিক J.W.Draper বলেন, "ইউরোপে আরবরাই প্রথম মানমন্দির নির্মাণ করেন।"[৮৮] ("In Europe the Arabs were the first to build observatories.") ১১৯৫ খ্রিস্টাব্দে সেভিলে জেবারের তত্ত্বাবধানে বিখ্যাত জিরাল্ডা নির্মিত হয়। ইউরোপে মূরদের যে সমস্ত অসামান্য অবদান রয়েছে তাঁর মধ্যে জ্যোতির্বিদ্যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সম্পর্কে S.P. Scott বলেন "আধুনিক পঞ্জিকা তাদের (আরবদের) উদ্ভাবন।"[৮৯] ("The Modern almanac, as its name denotes, is their invention.") বর্তমান পঞ্জিকা বা ক্যালেন্ডার স্পেনীয় আরবদের আবিষ্কার এবং আল মানাক নামই তার প্রমাণ।

পঞ্জিকা যে নামে সপ্তগ্রহের পরিচয় দেয়, তাদের কল্যাণেই তা আমাদের হস্তগত হয়েছে। প্রধানতম তারকা শ্রেণি তারাই নক্ষত্র মন্ডলীতে (constellation) বিভক্ত করে। যে সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র আজ পর্যন্ত আকাশের মানচিত্রে অঙ্কিত হয়, তারাই তাদের আরবি নাম দেয়। সংক্ষেপে বলতে গেল দূরবীক্ষণ ব্যতিত জ্যোতির্বিদ্যায় যতদূর উন্নতি করা সম্ভবপর হয়, আরবদের দ্বারা এর ততদূর উন্নত সাধিত

[৮৭] *Ibid*, P. 572.

[৮৮] John Willam Draper, *Intellectual Development in Europe,* Vol.II (London: G.Bell and Sons, 1910) P. 42.

[৮৯] S.P. Scott, *Op. cit.,* P. 427.

হয়। হিট্টি বলেন, "আরব জ্যোতির্বিদেরা আকাশে তাদের মৌলিক ও অবিস্মরণীয় গবেষণার ফসলের চিহ্ন রেখে গেছেন। ইউরোপীয় ভাষায় গ্রহ-নক্ষত্র মন্ডলীর যে নাম আজ প্রচলিত আছে তা আরবি ভাষা থেকে উদ্ভুত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, Scorpion এসেছে Aerab or aqrab থেকে; the kid এসেছে Algedi বা Al-Jadi থেকে; the flyer এসেছে Al-tair of Al-tair থেকে; tail এসেছে Deneb বা dhnab থেকে, calf এসেছে Pherkad বা farqad থেকে।"[৯০]

এছাড়া মূর জ্যোতির্বিদরা অসংখ্য যন্ত্রপাতি এবং রাশির নামও উদ্ভাবন করেন। স্পর্শ জ্যা (trangent), ছেদন রেখা (secant) সম্বন্ধে ইবনে ইউনুসের অবদান ইউরোপীয় জ্যোতির্বিদেরা স্বীকার করে। ঐতিহাসিক S.P.Scott বলেছেন- "তারা ইবনে ইউনুসের স্পর্শ জ্যা এবং ছেদন রেখা সম্পর্কিত সূত্রগুলো ব্যবহার করত। যার অস্তিত্ব ইউরোপে প্রকাশিত হবার ছয়শত বছর পর জানত না।"[৯১] (They made constant use of formulas of Ibn Junis for tangents and secants of whose existence Europe was ignorant for six hundred years after their publication".)

ইবনে ইউনুসের বিদ্ধরমন (Piercedgnomon) আবিষ্কারের ফলে সূর্যের তুঙ্গত্ব নির্ধারণের জন্য পর্যবেক্ষণ ক্রিয়া পরিচালনা করা খুবই সহজ হয়। লেপলেস (Laples) তার সিস্টেমে ডিউ মোন্ডের (System dut monde) পঞ্চম টীকায় এই দার্শনিক এবং আল বাত্তানি ও অন্যান্য আরব জ্যোতির্বিদদের পর্যবেক্ষণ পৃথিবী কক্ষের কেন্দ্র চ্যুতি-হ্রাসে (diminution of the ecentricity of the earths orbit) অকাট্য প্রমাণ বলে গ্রহণ করেছেন। J.W. Draper এ প্রসঙ্গে সবিশদ বর্ণনা করেছেন, "লেপলেস কক্ষ-বক্রতা সম্বন্ধে ইবনে ইউনুসের পর্যবেক্ষণ আলোক-রশ্মির দিক পরিবর্তন ও ভূ-পৃষ্ঠ যথাযথ সংশোধিত হলে ১০০০ খ্রিস্টাব্দে যে ফল পাওয়া যায়, তা আনুমানিক হিসাবের অতি নিকটবর্তী। তিনি শনি ও বৃহস্পতির অত্যধিক বন্ধুরতা সম্বন্ধে ১০০৮ খ্রিস্টাব্দের ৩১শে অক্টোবর তারিখে গৃহীত ইবনে ইউনুসের আর একটি পর্যবেক্ষণ ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে উল্লেখ করেন।"[৯২]

একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, মুসলিম জ্যোতির্বিদেরাই নির্ঘন্ট, সময় মাপ, বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি, ছায়া-ঘড়ি, জল-ঘড়ি, পরিমাপক যন্ত্র বা quadreant, আস্তরলেব, সেক্সট্যান্ট (Sextant) প্রভৃতি আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু ক্যাথলিক খ্রিস্টান স্পেনের জিঘাংসার ফলে মূর সভ্যতার নিদর্শন

---

৯০ P.K. Hitti, *Op. cit.*, P. 572.
৯১ *Ibid.*, P. 478.
৯২ J.W. Draper, *Op. cit.*, P. 49.

বহু মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য আরবি গ্রন্থ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পরিতাপের বিষয় যে, নয় শতকের পরে যে সমস্ত জ্যোতির্বিদের আর্বিভাব হয় তাদের কারও গ্রন্থাবলি সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায়নি। মূরেরা কেবল পৃথিবীর গোলক (Orbit) তৈরি করেই ক্ষান্ত হয়নি, তারা আকাশের গোলকও নির্মাণ করে। প্রতিটি শিক্ষায়তনে আকাশ ও ভূ-মন্ডলের কাঠ অথবা ধাতুর তৈরি গোলক ও সমতল গোলক (plain sphere) থাকত। ধাতুর মধ্যে রূপার ব্যবহারই অধিক প্রচলিত ছিল। প্রখ্যাত খ্রিস্টান পন্ডিত গারবার্ট কার্ডোভা থেকে একটি গোলক নিয়ে তাঁর প্রতিষ্ঠিত রিম্‌সের বিদ্যালয়ে ব্যবহার করেন।

স্পেনে মুসলিম আমলে বিভিন্ন স্বাধীন সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় জ্যোতির্বিদ্যার যে অগ্রগতি হয় তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখেনা। মুজাফফর আলী বলেন, "আফ্রিকায় মুসলিম শাসনে বিজ্ঞান চর্চায় কি পরিমাণে উৎকর্ষতা লাভ করেছিল তা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত সমাজের উজ্জ্বলতম রত্ন ইবনে ইউনুসের বিষয় অলোচনা করলে সম্যক উপলব্ধি করা যায়। তাঁর প্রণীত *জিয়ুল আকবর উল হাকিমী* নামক জ্যোতিষী গ্রন্থ (টলেমী রচিত) প্রাচীন জ্যোতিষ শাস্ত্রের ভ্রমাত্মক যুক্তিসমূহ সম্পূর্ণরূপে খন্ডন করে দেন। উক্ত মহামূল্যবান গ্রন্থ গ্রিস, পারস্য, মঙ্গোলিয়া এমনকি চীন দেশেও সাদরে গৃহীত হয়েছিল। কিঞ্চিৎ দুই শতক পরে চীনা জ্যোতিষী কে চু কিং উক্ত গ্রন্থ থেকে যাবতীয় তথ্য শিক্ষা করে যশস্বী হয়েছিলেন।"[৯৩]

জ্যোতিষ শাস্ত্রে বহুল ব্যবহৃত কারিগরি সংজ্ঞাগুলো আজও ইউরোপীয় বিজ্ঞানে সমাদৃত; যেমন *আজিমত* (Azimuth), যা আরবি আল-সামিত থেকে, *নাদির* (Nadir) নাজির থেকে, *জেনিথ* (zenith) আল সামাত থেকে গৃহীত হয়েছে। এ সমস্ত শব্দকোষ (ethomology) খ্রিস্টান ইউরোপে ইসলামের অসামান্য অবদানকে প্রমাণিত করে।

গ্রহাদি পর্যবেক্ষণ করার জন্য মূরেরা যে সমস্ত যন্ত্র ব্যবহার করত সেগুলোর মধ্যে বড় ও ছোট যন্ত্র ছিল। বড় ধরনের যন্ত্রের মধ্যে নভোমন্ডলে গ্রহাদির কক্ষগতি প্রদর্শনার্থে তাদের নির্মিত কয়েকটি যন্ত্রের (armillary sphere) ব্যাস পঁচিশ ফুট ছিল। উচ্চতা পরিমাপক যন্ত্রগুলো সাধারণত পনেরো ফুট ছিল। মরক্কোর আবুল হাসান বর্ণিত ও কক্ষ বক্রতা নির্ধারণের জন্য দশ শতকে ব্যবহৃত পিতলের তৈরি কোণ পরিমাপক যন্ত্রের (sextant) ব্যাস ছিল ৫৮ ফুট। এর বৃত্তাংশ (arc) সেকেন্ডে বিভক্ত করা হয়।

---

[৯৩] মুজাফফর আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৫।

S.P.Scott বলেন, "আরবদের যে সমস্ত আস্তারলেব ও গ্রহাদির কক্ষ গতি প্রদর্শনার্থে নির্মিত যন্ত্রাবলি ইউরোপের জাদুঘর সমূহে রক্ষিত আছে; এগুলোর সম্পাদন প্রণালি এত উৎকৃষ্ট ও ব্যবস্থাপিত করণের কৌশল এত সঠিক যে, আধুনিক কৌশলী জ্যোতির্বিদরা প্রাণপণ চেষ্টা ও পরিশ্রম করেও তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং নির্ভূল যন্ত্র তৈরি করতে পারেননি। যে সমস্ত সূক্ষ্ম কাজের জন্য এ সমুদয় যন্ত্র অভিপ্রেত, শিল্পিদের যে সে সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান ছিল এ দ্বারা তাও প্রমাণিত হয়। বর্তমান যুগের যেকোন সর্বাপেক্ষা সুসজ্জিত মান-মন্দিরের আলোকে বিজ্ঞান বিষয়ক যন্ত্রপাতির সঙ্গে তুলনা করলে নির্মান প্রণালির মনোহারিত্বে আরবদের যন্ত্রাবলির অনুকূলেই রায় দিতে হবে।"[৯৪] ("The Arabic armillary sphere and astrolabes preserved in the museums of Europe are not surpassed by the most laborious efforts of modern ingenuity in excellence of finish and in the accurate of adjustment these instruments , through whose agency such wonderful results were achieved will compare favourably, in elegance of construction with the optical appliance of the best equipped observatory of today".)

মূর সভ্যতার অসামান্য অবদান হিসেবে জ্যোতির্বিদ্যায় তাদের মননশীলতা, নিষ্ঠা ও মৌলিক গবেষণা স্বীকৃতি লাভ করে। তাঁরা ছায়া-ঘড়ি (Sundial), জল-ঘড়ি (clepsydra) এবং বালি ও ভার চালিত ঘড়ির ব্যবহার জানত। প্রখ্যাত বিজ্ঞানি আল-জারকালির জল ঘড়ি টলেডোর রাজকীয় প্রাসাদের দু'টি চৌবাচ্চা নিয়ে গঠিত হয়। চন্দ্রকলার হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে তাদের জল নিয়ন্ত্রিত হত। চাঁদ ওঠার সাথে সাথে চৌবাচ্চায় পানি প্রবেশ করতে আরম্ভ করে এবং চৌদ্দ তারিখ তা পরিপূর্ণ হয়ে যেত। এরপর আবার পানি কমতে থাকত। আঠাশ তারিখে তাতে বিন্দু মাত্র পানি ও থাকত না। চৌবাচ্চায় পানি ঢেলে দিলে বা বের করে দিলে তাতে পানির পরিমানের কোনই তারতম্য হত না। যন্ত্রটি এমন কৌশলে নির্মিত হয় যে, অতিরিক্ত পানি আপনা আপনি বের হয়ে যেত কিংবা বেরিয়ে যাওয়া সম-পরিমানের পানি ভেতরে থেকে যেত। দিন রাত্রির নিরন্তর পরিবর্তনশীল বৈষম্য অনুযায়ী জলের গতি ও সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হত।

দোলক ঘড়ির আবিষ্কারে স্পেনীয় আরবদের অবদান ছিল। তারা জানত যে কোন বস্তু ঝুলিয়ে রাখলে তা দুলবে। J.W. Draper বলেন, "সময় মাপার জন্য ইবনে ইউনুস সর্বপ্রথম দোলক ঘড়ি আবিষ্কার করেন।"[৯৫] (Ibn Junis accumplished the most valuable of all chronometic improvements.

[৯৪] S.P. Scott, *Op. cit.*, P. 435.
[৯৫] J.W. Draper, *Op. cit.* P. 49.

He first applied the pendulum to the measure of time.") দোলক সংযুক্ত করে আরবেরা যে pendulum ঘড়ি আবিষ্কার করে তা বর্তমানের মত; অথচ সাধারণ ভাবে গ্যালিলিওকেই আধুনিক ঘড়ির আবিষ্কারক বলা হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে S.P.Scott যথার্থই বলেছেন, "The Arabs had adapted it to a contrivance whose construction resembled that of the modern clock, an invention generally attributed to Galeleo."[৯৬]

একজন ইউরোপীয় লেখক বলেন যে স্পেনীয় সারাসিনগণ আমাদেরকে সময় নির্ধারনের পেন্ডুলামের ব্যবহার শিক্ষা দিয়েছে। তারা আমাদেরকে টেলিগ্রাফ ও শিক্ষা দিয়েছে, যদিও তা বর্তমানকালের উন্নত পদ্ধতির ন্যায় দ্রুত ও কার্যকরী ছিলনা। তিনি আরও বলেন, বর্তমান কালের যে সকল আবিষ্কার জীবনের আরাম আয়েশ বৃদ্ধি করেছে এবং যা ছাড়া সাহিত্য ও কলা কখনও উন্নতি লাভ করতে পারত না, তার অধিকাংশই যে আরবগণের দ্বারাই আবিষ্কৃত হয়েছে।

একথা বলা যায় যে, ফলিত জ্যোতিষ থেকে জ্যোতির্বিদ্যার উৎপত্তি হয়। জ্যোতিষশাস্ত্রে বাগদাদের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আবু মাসার বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি কমপক্ষে চারখানি গ্রন্থ জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপর রচনা করেন এবং তাঁর গ্রন্থ দ্বাদশ শতকে সেভিলের জন এবং বাথের এডিলাইড কর্তৃক ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। জন্ম মৃত্যুর উপর গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাব ছাড়াও জোয়ার ভাটার উপর তাদের প্রভাবের কথা আবু মাসার প্রথম উল্লেখ করেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপর লিখিত আরবি গ্রন্থ ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হলে তার প্রভাব খ্রিস্টান ইউরোপের বিজ্ঞানে পরিলক্ষিত হয়। আরব জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রভাবে ইউরোপীয় বিজ্ঞানী গবেষণা ও চর্চা করতে থাকেন। টাইকোব্রাহের স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতেন এবং তিনি সম্রাট রুডলফের কোষ্ঠী প্রস্তুত করেন। কেপলারও হস্তলিপি বিশারদ হিসেবে কোষ্ঠি তৈরি করতেন।

স্পেনীয় আরবে জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রভাব প্রকট আকারে দেখা দেয়। তারা ভবিষ্যৎ গণনা, কোষ্ঠীবিচার এমন কি কবচে (talisman) বিশ্বাস করত। গির্জার ক্রুশাকার নকশায়, গৃহ-দ্বারের উপর বিলম্বিত ঘোড়ার নালে, গুপ্ত সমিতির ব্যাজে, আসবাব পত্রের খোদাই কাজে ইহুদিদের ইষ্টি কবচে, ক্যাথলিক পাদ্রীদের বুটীদার পবিত্র চিহ্নে ইউরোপের সর্বাপেক্ষা গর্বিত রাজবংশগুলোর বংশ মর্যাদা জ্ঞাপক চিহ্নে ও বিলাসিনী সুন্দরীদের বক্ষের শোভাবর্ধক বহু মূল্যবান প্রস্তরে এ প্রভাব সুস্পষ্ট দেদীপ্যমান।

---

[৯৬] S.P. Scott, *Op. cit.*, Vol.III, P. 479.

মুজাফফর আলী যথার্থই বলেন, “স্পেন দেশের মুসলিমগণ অপরাপর শাস্ত্রের ন্যায় গণিতশাস্ত্রের সমধিক উৎকর্ষ লাভের সমর্থ হয়েছিলেন। বছরের প্রকৃত দৈর্ঘ্য তারাই সর্বপ্রথম নির্ভূলভাবে নির্ণয় করেছিলেন। সৌরকলঙ্কের আবিষ্কার, সৌরকক্ষের উৎকেন্দ্রিকতা, সূর্যের মন্দোচ্চতা, ক্রান্তি বৃত্তের বক্রতার ক্রমিক হ্রাস, ক্রান্তিগমনের পরিমাণ ইত্যাদি সুক্ষ্ম গণনার দ্বারা তারা গণিতশাস্ত্রের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করে গেছেন। বর্তমান ত্রিকোণমিতির উদ্ভাবন কিউবিক ইকোয়েশনের সমাধান, ব্যাস ও সমাহার গণিতের সৃষ্টি এ সমস্ত আরবগণ দ্বারাই আবিষ্কৃত হয়েছে।”[৯৭] একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, গণিত শাস্ত্র ব্যতীত জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষশাস্ত্রের উৎকর্ষ সাধিত হতনা। প্রকৃত বিজ্ঞানের অনুশীলন ও প্রয়োগে বিশেষ করে গণিতশাস্ত্রের উচ্চতম শাখার উন্নতি সাধনে মূরগণ বিশেষ যোগ্যতা প্রদর্শন করেন।

তারা ইউরোপে গণনার চাতুর্য ও কৌশল দ্বারা অসামান্য প্রভাব ফেলে। এর ফলে গণনার প্রক্রিয়া সহজতর হয় এবং এর ফলে নবনব অনুসন্ধানের ক্ষেত্র উন্মুক্ত হয়। একথা সত্য যে, সংখ্যাতত্ত্বে আরবগণ ভারতীয় সংখ্যা তত্ত্ব বা শূন্য (Cipher, 0) দ্বারা প্রভাবিত হয়। কিন্তু তারাই শূন্যের ব্যবহার ইউরোপে প্রচলিত করে। সংখ্যাতত্ত্বে শূন্য ব্যতিরেকে গণনা একেবারেই অসম্ভব। একথা স্মরণ রেখে আরব গণিতজ্ঞগণ প্রাচীন বিরক্তিকর রোমীয় সংখ্যাতত্ত্বের স্থলে শূন্যের ব্যবহার জনপ্রিয় করে তোলে। এই শূন্য ‘হিন্দ’ নামে পরিচিত ছিল এবং এ শূন্য থেকেই শূন্যের ভারতীয় উৎস সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়।

বারো শতকে ক্রেমনার জেরার্ড কর্তৃক ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত আল খাওয়ারিজমির গ্রন্থটি ষোল শতক পর্যন্ত ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে গণিত বিষয়ের একটি প্রধান পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ব্যবহৃত হতো এবং তাই ইউরোপে প্রথম পরিচিত করেছিল বীজগণিত বিজ্ঞান ও সে সাথে এ বিজ্ঞানের নামকে। আল খাওরিজমের গণিতবিষয়ক গ্রন্থ বাথের এডিলার্ড ল্যাটিনে অনুবাদ করেন। মূল আরবি গ্রন্থটি দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেলেও ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত এডিলার্ডের গ্রন্থ *De numero Indico* সমগ্র ইউরোপে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

নয় শতকের প্রথম ভাগে আল খাওয়ারিজমি তাঁর গ্রন্থগুলো লিখেছেন। তিনি অক্ষরের পরিবর্তে শূন্য ব্যবহার করেন। এছাড়া অন্যান্য সংখ্যা ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁকেই জনক বলা হয়। এ সংখ্যাগুলোকে তিনি *হিন্দী* বলতেন এর দ্বারা সংখ্যাগুলির ভারতীয় চরিত্রকেই তিনি বোঝাতে চাইতেন। স্পেনের

[৯৭] মুজাফফর আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৪।

মুসলিমগণ নবম শতকের দ্বিতীয় ভাগে *হুরূফ আল গুবার* (কালির অক্ষর) নামে একধরনের গণনা তত্ত্ব আবিষ্কার করেন যা মূলত কালির অ্যাবাকসের সাহায্যে লিখা হত। *হুরূফ আল গুবার* মূলত বালির গণনা যন্ত্র। বেশির ভাগ গবেষক শূন্যের মত *গুবার* কে ভারতীয় উৎস সংখ্যাতত্ত্ব থেকে এটি গ্রহণ করা হয়েছে এবং স্পেনের মুসলিম শাসনের বহু পূর্বে রোমান যুগেও এটি প্রচলিত ছিল। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ের মত এখানেও আরব প্রভাব দেদীপ্যমান। যে শূন্যের (০) অভাবে জগতের হিসাব নিকাশ মূহুর্তে বন্ধ হয়ে যেত, তা তাদের আবিষ্কার।

O. J. Thatcher বলেছেন, "সাইফার (Cipher-শূন্য), সাইফারিং (ciphering-অন্ধ সমাধান) প্রভৃতি বর্তমান ইংরেজি শব্দ আরবি 'সাফারা' বা সিফার (শূন্য) হতে নিষ্পন্ন। গণনা সম্বন্ধে আমরা এখনও আল-গরিদম (Al-goritham)শব্দ ব্যবহার করে থাকি। শূন্যের ন্যায় দশমিক মান ও (decimal nation) ইবনে মুসার আবিষ্কার, তিনিই সংখ্যার স্থানীয় মান (Value of position) নির্মাণ করেন।"[৯৮]

J.W Draper বলেন, "বর্গীয় সমীকরণের (quadratic equation) সাধারণ নিয়মও তারাই আবিষ্কার করেন।"[৯৯] আরবগন ঘন সমীকরণের (Cube equation) একটি নির্দিষ্ট নিয়মের প্রস্তাব করেন।

গেরবার্ট, যিনি পোপ দ্বিতীয় সিলভেষ্টার (৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ-১০০৩ খ্রিস্টাব্দ) হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বহুদিন স্পেনে বসবাস করে গণিত বিষয়ক গবেষণা করেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম গুবারের বিজ্ঞানসম্মত তথ্য দেন। আরবি ভাষায় ৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে *হুরুফ আল গুবার* প্রকাশিত হবার প্রায় একশত বছর পরে রচিত হয়। হিন্দু সংখ্যা তত্ত্ব অপেক্ষা আরবি গুবারের উপর ভিত্তি করে ইউরোপের আধুনিক সংখ্যাতত্ত্ব উদ্ভাবিত হয়। উল্লেখ্য যে, খ্রিস্টীয় ইউরোপে গণিতজ্ঞগণ এগারো, বারো এবং তের শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত রোমীয় সংখ্যাতত্ত্ব অ্যাবাকাস ব্যবহার করতেন।

উল্লেখ্য যে, স্পেন থেকে সর্বপ্রথম ইতালিতে গুবার প্রচলিত হয়। ১২০২ খ্রিস্টাব্দে পিসার অধিবাসী লিওনার্ডো ফাইবোসী (Leonardo Fibonacci); যিনি একজন প্রখ্যাত মুসলিম বিজ্ঞানীর নিকট গণিত শাস্ত্রে জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি উত্তর আফ্রিকা সফর করেন এবং মুসলিম সংখ্যাতত্ত্ব সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থটি ইউরোপে আরবি সংখ্যাতত্ত্ব প্রচলনে সহায়তা করে।

---

[৯৮] Oliver J. Thatcher and schwill F. *General History of Europe,* Vol.I (New York: John Murray, 1912), P. 173.

[৯৯] J.W. Draper, *Op. cit.*, Vol.II, P. 47.

এ ঘটনাকে আরবি সংখ্যাতত্ত্ব প্রচলনের মাইলফলক বলা হয়। (The main land work in the introduction of the Arabic numerals.) শুধু তাই নয়, হিট্টি বলেন, "এর ফলে ইউরোপীয় গণিতশাস্ত্রের সূচনা হয়।" ("March the beginning of European mathematics.")[১০০]

বীজগণিত ও জ্যামিতিতে আরবদের অসামান্য অবদান ছিল। উল্লেখ্য যে, আল খাওয়ারিজমির *হিসাব আল জরব ওয়া আল মুকাবালা* ল্যাটিনে অনূদিত হয়ে ইউরোপে আল জেবরার বা বীজগণিতের প্রচলন হয়। এটি ইউরোপে *Algorism* নামে পরিচিত। শুধু বীজগণিতই নয়, আরবরা জ্যামিতি ও ত্রিকোণমিতির (Trigonomentry) উদ্ভাবন করেন। তারাই বৃত্তের শেষ প্রান্তদ্বয়ের সংযোজন সরল রেখার পরিবর্তে প্রথম শিঞ্জনীর ব্যবহার করেন। পিউরবাক (Peurback), রেজিওমেন্টাস (Regiomentenus) ও কোপারনিকাসের গৌরবের যুগ শুরু করতে গেলেই তাদেরকে মৌলিক ও প্রাথমিক পরিশ্রমের কথা মনে না উঠে পারে না। তারাই বাস্তব উদাহরণের সাহায্যে তাদের সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা দিতে ভালবাসতেন বা পছন্দ করতেন। এর ফলে ভূ-পৃষ্ঠের আকার ও পরিমাপ নিরূপণ শাস্ত্র (Geodesy) পর্বতশ্রেণির উচ্চতা, উপত্যকার প্রস্থ বা একই সমতল ক্ষেত্রে অবস্থিত দু'টি দ্রব্যের দূরত্ব নির্ধারণ প্রক্রিয়ার অত্যধিক উৎকর্ষ সাধিত হয়।

কার্য প্রণালির নক্শা অঙ্কনে এবং যুদ্ধ যন্ত্র ও অত্যধিক সুকুমার দাঁড়ি পাল্লা নির্মাণে বল-বিজ্ঞানের নীতি প্রয়োগ করতে এটি বিশেষ কাজে লাগতো। ইউরোপীয় বিজ্ঞানে আরবি গণিত শাস্ত্রের প্রভাব ছিল অপরিসীম। হিট্টি বলেন, "বীজগণিতের সংজ্ঞা সুর্দ (Surd) যা ষোল শতকে ল্যাটিনে ব্যবহৃত হয় তা আরবি শব্দ *Jadhar asamon* থেকে উৎপন্ন হয়েছে। ত্রিকোণমিতিতে *sine* শব্দটিও, যা ল্যাটিনে *sinus* হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আরবি Jayb অথবা পকেট থেকে অনূদিত হয়েছে ভেবে বা পকেট হিন্দি বাক্য *জিভা* থেকে উদ্ভব হয়েছে। ইংরেজি গণিতজ্ঞ চেষ্টারের রবার্ট বারো শতকের মধ্যভাগে তার ত্রিকোণমিতিতে আরবি শব্দ (Jayb) এর বিপরীতে *Sinus* শব্দটি ব্যবহার করেন।"[১০১]

মূরগণ বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মত উদ্ভিদ বিদ্যায় অসামান্য অবদান রেখেছেন। সাধারণ এবং ফলিত উদ্ভিদ বিজ্ঞানে স্পেনের মুসলমানগণ তাদের গবেষণা ও উদ্ভাবনার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। কৃষিকার্য সম্বন্ধে তাদের অগাধ জ্ঞান ছিল এবং উদ্ভিদের উপর গবেষণা করে নানা প্রকারের তথ্য আবিষ্কার করেন। প্রাকৃতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে বিশেষ করে বিশুদ্ধ ও ফলিত উদ্ভিদ বিদ্যা এবং জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিতশাস্ত্রের

---

[১০০] P.K. Hitti, *Op. cit.*, P. 574.
[১০১] *Ibid*, P. 579.

ক্ষেত্রে পশ্চিমি দুনিয়ার মুসলিমরা তাদের গবেষণার বিভিন্ন শ্রেণি বিভাগ করেন এবং চারা থেকে কলম (cutting) তৈরির পদ্ধতি জানতেন। স্বাভাবিকভাবে বীজ থেকে উৎপাদিত চারার মধ্যে তারা প্রভেদ নির্ণয় করেন। চারাগুলো স্ত্রী ও পুরুষ এ দুই শ্রেণিতে তারাই প্রথম বিভক্ত করেন। যেমন- তাল ও শন জাতীয় গাছের মধ্যকার যৌন পার্থক্য সম্পর্কে তারা সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। প্রথমে তাঁরা কলম থেকে, বীজ থেকে ও স্বত:স্ফূর্তভাবে বেড়ে উঠা এই তিন শ্রেনীতে গাছগুলিকে ভাগ করেছিলেন। সম্রাট ফ্রেডারিকের একটি প্রশ্নের উত্তরে ইবনে-সাবীন যে বক্তব্য রাখেন তা থেকে এটিই প্রমাণিত হয়।[১০২]

খলিফা ও মুসলমানগণ বৃক্ষাদির বিশ্লেষণ, শ্রেণিবিভাগ ও বিশেষ গুণ নির্ধারণে অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। তারা উদ্ভিজ্জ ও চারার সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন দেশে সংগ্রহকারীদের পাঠাতেন। উদ্ভিদ বিজ্ঞানীগণ তাদের গবেষণার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে বীজ ও নমুনা সংগ্রহ করতেন। দেশী বিদেশী উভয় প্রকারের বৃক্ষাদির নমুনা সংগ্রহ করে উৎপাদনের প্রয়াস পাওয়া যায়।

মূর শাসিত স্পেনে প্রখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন কর্ডোভাবাসী আল গাফেকী (১১৬৫ খ্রিস্টাব্দ)। যার প্রকৃত নাম আবু জাফর আহম্মদ ইবনে মোহাম্মদ। তিনি স্পেনের বিভিন্ন অঞ্চলে ও আফ্রিকা থেকে উদ্ভিদ ও চারা সংগ্রহ করেন তাঁর গবেষণার জন্য। আল গাফেকী প্রতিটি চারার আরবি ভাষা ও ল্যাটিন ভাষায় নাম দেন। তিনি তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ *আল আদ উইয়া আল মুফ্রাদা*-তে তাঁর গবেষণালব্ধ জ্ঞান দ্বারা উদ্ভিদবিজ্ঞানে অসামান্য অবদান রাখেন। তাঁর গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে পরবর্তী কালে ইবনে আল বায়তার গবেষণা করে যশস্বী হয়েছিলেন। বারো শতকের শেষভাগে স্পেনের আবু যাকারিয়া ইয়াহিইয়া ইবনে মুহম্মদ ইবনে আল আওয়াম বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর কৃষি বিজ্ঞানের উপর রচিত গ্রন্থ *আল ফিলাহা* তৎকালীন সময়ের সর্বাধিক ব্যবহৃত রেফারেন্স গ্রন্থ হিসেবে সমাদৃত হয়।

আল ফিলাহা গ্রন্থটি শুধু ইসলামি নয় বরং উপরোক্ত বিষয়ে মধ্যযুগীয় সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রচনা। গ্রিক ও আরবি ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলির এবং স্পেনে কৃষিজীবীদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে রচিত এই গ্রন্থটিতে কমপক্ষে ৫৮৪টি বিভিন্ন ধরনের চারার বর্ণনা দেয়া হয়। এতে কমপক্ষে ৫০টি বিভিন্ন জাতের ফলের উৎপাদন প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থটিতে ‘কলম’ তৈরির বিভিন্ন পদ্ধতি, বৃক্ষ ও চারার বিভিন্ন রোগ, সারের বিভিন্ন উপাদান এবং রোগ নিরামক ওষুধাদির বিবরণ ও রয়েছে। তৎকালীন প্রখ্যাত বিজ্ঞানীগণ যেমন ইবনে খাল্লিকান, ইয়াকুত, হাজী খালাফা এই

---

[১০২] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ১৬৬।

গ্রন্থের অস্তিত্ব জানতেন না। এমনকি প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ইবনে খালদুন এটিকে ভুল করে ইবনে ওয়াহসিয়ার সংশোধিত গ্রন্থ (Reconsion) হিসেবে বর্ণনা করেন। এটি এতটা গুরুত্বপূর্ণ হলেও আরব লেখকদের কাছে কম পরিচিত।[১০৩]

মূর শাসিত স্পেনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদ্ভিদবিজ্ঞানী এবং ওষুধ প্রস্তুতকারী (Pharmacist) ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে আল বায়তার। মালাগায় জন্মগ্রহণ কারী ইবনে আল বায়তার ভেষজশাস্ত্রে মূলত ডাইসকোরাইডসের উত্তরাধিকার ছিলেন। শুধু স্পেন নয় তাকে গোটা মুসলিম দুনিয়ার সবচেয়ে খ্যাতনামা উদ্ভিদবিদ এবং ওষুধবিদ্যা বিশারদ বলা হয়। তিনি সমগ্র স্পেন ও উত্তর আফ্রিকায় ভ্রমণ করে ভেষজ বিজ্ঞানী (Herbalist) হিসেবে অসংখ্য নমুনা সংগ্রহ করেন। তিনি মিসরের আয়্যুবীয় সুলতান আল মালিক আল কামিলের রাজত্বকালে চাকরি গ্রহণ করেন। তিনি স্পেনের প্রধান ভেষজ বিজ্ঞানী হিসেবে কর্মরত অবস্থায় সিরিয়া ও এশিয়া মাইনরে ভ্রমণ করেন এবং ১২৪৮ খ্রিস্টাব্দে দামেস্কে মৃত্যুবরণ করেন।[১০৪]

মালাগার ইবনে বায়তার সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত মুসলিম উদ্ভিদবেত্তা। ইউরোপে তিনি ইবনে বায়তার (Ibn Beytar) নামে পরিচিত। ডাইসকোরাইডস থেকে লিনাসের অভ্যুদয় পর্যন্ত দেড় হাজার বছরের মধ্যে জ্ঞানের এই প্রধান বিভাগে তাঁর নাম সমুজ্জ্বল। (His is the greatest name in the annals of this important branch of learing form Discordes to Linaeus, an interval of fifteen hundred years.)

আল বায়তার তাঁর দুটি প্রখ্যাত গ্রন্থের জন্য অশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। এ দুটি হচ্ছে *আল মুঘানী ফি আল আদউইয়া আল মুফরাদা* বা *Materia Medica* অর্থ্যাৎ ভেষজশাস্ত্রের উপর লিখিত তথ্যবহুল ও প্রামাণ্য গ্রন্থ। দ্বিতীয় গ্রন্থটির নাম *আল জামী ফি আল আদি উইয়া আল মুফরাদা*। এই গ্রন্থটিতে প্রাণীজ, উদ্ভিজ, খনিজ বস্তুর রোগ নির্ণয় ও সেগুলোর মহৌষধ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা রয়েছে। এ দুটি গ্রন্থে আল বায়তার গ্রীক ও আরবীয় বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্য ও তত্ত্ব সন্নিবেশিত করেন এবং তার সাথে তাঁর গবেষাণলব্ধ বিচার বিশ্লেষণ সংযোগ করেন। উদ্ভিজ্জ ক্ষেত্রে প্রায় ১৪০০ গাছপালার বর্ণনা রয়েছে এবং এর মধ্যে ৩০০টি সম্পূর্ণ নতুন সংযোজন। আল বায়তার কমপক্ষে ১৫০টি গ্রন্থ থেকে

---

[১০৩] P.K. Hitti, *Op. cit.*, P. 575.
[১০৪] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ১৬৬।

তথ্যাদি গ্রহণ করে মৌলিক রচনা প্রণয়ন করেন। ১৭৫৮ খ্রিস্টাব্দে ক্রিমোনার তাঁর *Simplicia* এর ল্যাটিন অনুবাদ করেন।[১০৫]

উদ্যানকর্ষণ বিদ্যা অথবা gardening-এ স্পেনের মুসলিম শাসক ও সাধারণ লোক পৃষ্ঠপোষকতা করেন। Draper বলেন, "স্পেনীশ আরবদের মত অপর কোন জাতি এত উন্নত ও ব্যয়বহুল প্রমোদোদ্যান নির্মাণ করতে পারেননি।"[১০৬] "No Nation has ever excelled the spanish Arabs of the beauty and costliness of their pleasure gardens".) প্রথম আব্দুর রহমান দামেস্ক থেকে খেজুরের চারা এনে কর্ডোভায় রোপন করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রোসাফা উদ্যানেই সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক প্রথায় এশিয়ায় বৃক্ষ লতার চাষ আরম্ভ হয়। তার জন্য জগতের সর্বাংশ থেকে দুর্লভতম বৃক্ষলতা ও বীজ আনা হয়। উদ্যানে একটি উচ্চ মানের স্থাপত্যকলা এবং বিশেষ পদ্ধতিতে ও কৌশলে বিভিন্ন গাছ, চারা ফুল নিয়ে বাগান সাজান হয়। মালিগণ গাছের খুবই যত্ন নিতেন।ঐতিহাসিক S.Lanepoole বলেন, "এটি (উদ্যান) ইউরোপীয় উদ্যান সমূহের মডেলে পরিণত হয়।"[১০৭] ("It became a model for the civilised countries of Europe")

উদ্ভিদবিজ্ঞান ও উদ্যানবিদ্যা প্রসঙ্গে S.P. Scott বলেন, "এ সমস্ত শ্রমসাধ্য গবেষণার ফলে আন্দালুসিয়ার আরবেরা কৃষি উদ্ভিদ বিদ্যায় এরূপ দক্ষতা অর্জন করেন যে, অপর কোন জাতি অদ্যাবধি তাদের সমকক্ষ হতে পারেনি।"[১০৮] ("As a consequence of these laborious searches the Andalusian Arabs became more proficient in the kindred sciences of botany and agriculture than any people who have ever existed".)

রসায়ন শাস্ত্রের উৎপত্তি ও অগ্রগতি আরবদের পরিশ্রমের ফল। ঐতিহাসিক E.Gibbon বলেন, "The science of chemistry owes its origin and improvement to the industry of the saracens".[১০৯] আরবগণ রসায়ন শাস্ত্রকে আল কেমি বলে থাকে। আরব রসায়ন শাস্ত্রের উদ্ভব হয় মিসরে এবং সেখান থেকে রসায়ন শাস্ত্র সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি এগারো শতকের শেষ ভাগেও রসায়ন শাস্ত্র সমগ্র ইউরোপের অপরিচিত ছিল। কেবল বারো শতকে মুসলিমগণ সর্বপ্রথম

---

[১০৫] P.K. Hitti, *Op. cit.*, P. 576.

[১০৬] J.W. Draper, *Op. cit.*,Vol.II, P. 33.

[১০৭] Stanely Lanepoole, *Op. cit.*, P. 132.

[১০৮] S.P. Scott, *Op. cit.*, Vol.III, P. 486.

[১০৯] Edward Gibbon, *Rise and Fall of the Roman Empire*, Vol.VI (London: Strahan and cadell, 1776), P. 37.

ইউরোপে রসায়ন শাস্ত্র প্রচলিত করেন। মুসলিম পূর্ব ইউরোপে রসায়ন শাস্ত্রের যেমন প্রচলন ছিল না তেমনি এর কোন বিশেষ নাম ও ছিলনা।

অধিকাংশ ইউরোপীয় পণ্ডিত মনে করেন যে, আরবি বিশেষণ আল (The) এর পরে আরবি শব্দ কেমিয়া থেকে *Al- chemy* এর উদ্ভব হয়েছে এবং al-chemy থেকেই আধুনিক সংজ্ঞা chemistry উৎপন্ন হয়েছে। মুজাফফর আলী বলেন, "বিজ্ঞান হিসেবে রসায়ন শাস্ত্র সন্দেহাতীত ভাবে মুসলমানদের সৃষ্টি । আবু মুসা জাবির আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রের উদ্ভাবক।"[১১০] S.P Scott বলেন, "তারাই আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রের জনক।"[১১১] ("They practically invented modern chemistry".) আমিনুল ইসলাম বলেন, "আধুনিক রসায়ন স্পষ্টতই ছিল মুসলমানদের আবিষ্কার এবং এ বিষয়ে তাদের কীর্তি ছিল এক অনন্য আকর্ষণের ব্যাপার।"[১১২]

মুসলিম স্পেনে রসায়ন শাস্ত্রের চরম বিকাশ ঘটেনি, বরং একটি সূদৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হয়। দশ শতক থেকে স্পেনের বিভিন্ন শহরে এবং স্বাধীন রাজ্যের রাজধানীতে রসায়ন চর্চা হতে থাকে সুলতান বা শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায়। কর্ডোভা, সেভিল ও গ্রানাডা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন পাঠ্যসূচির অন্তর্গত ছিল। রসায়ন চর্চার সাথে ল্যাবরেটরি বা গবেষণাগার অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এ সমস্ত গবেষণাগার না থাকলে রসায়ন শাস্ত্রের বিকাশ হত না। এ সমস্ত পরীক্ষাগারে শুধু মুসলিম বিজ্ঞানীগণ বক্তৃতা দিতেন না, ছাত্র ও দর্শকদের সামনে পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ, পরিশোধন প্রভৃতি বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতেন। সেই সাথে ফলাফলও উদঘাটন করতেন। মধ্যযুগের পরীক্ষাগারসমূহ মূলত রসায়ন বিদ্যাচর্চার ফলশ্রুতি অথবা মুসলমানদের পৃষ্ঠপোষকতার ফসল।

রসায়নবিদরা ধাতু থেকে স্বর্ণ লাভের চেষ্টা করেন, কিন্তু এক্ষেত্রে তেমন সফলতা লাভ না করলেও তাদের গ্রন্থাবলি ও গবেষণাগারে লব্ধজ্ঞান থেকে ধারণা করা হয় যে, তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করতে থাকে। তাদের লেখায় যে রাসায়নিক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় তার পূর্বে এর কোন অস্তিত্ব ছিল না এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

মূর রসায়নবিদেরা বিশ্লেষণ (Analysis), পৃথকীকরণ (Separation), খনিজমিশ্রিত ধাতু গলিয়ে বের করার প্রক্রিয়া (Smelting of ores), গুপ্ত পরীক্ষা থেকে মিশ্র ধাতু নির্মাণে (Compositions of

---

[১১০] মুজাফফর আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০।
[১১১] S.P. Scott, *Op. cit.*, Vol.III, P. 490.
[১১২] আমিনুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৮।

alloys), কাঁচ গলন (fusing of glass), দানাবন্ধন (crystalization), ক্ষার (alkali) প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখে গেছেন।

জাবির বিন হায়য়ান এক্ষেত্রে যে অভূত পূর্ব সাফল্য অর্জন করেন তার উপর ভিত্তি করে মূররা রসায়ন শাস্ত্রকে চরম উৎকর্ষতা দান করে। মূর রসায়নবিদেরা জানতেন যে, উত্তাপ দিয়ে চূর্ণ করলে ধাতুর ওজন না কমে বেড়ে যায়।

আরব মূরগন রসায়ন শাস্ত্রে যথেষ্ট বুৎপত্তি লাভ করেন। পাশ্চাত্যের পণ্ডিতবর্গ লি.বন প্রমুখ স্বীকার করেন যে, বারুদের আবিষ্কারক হিসেবে আরবদের কৃতিত্ব রয়েছে। চীনে প্রথম বারুদের ব্যবহার শুরু হয় এবং আরবগণ এই বারুদ ইউরোপে প্রচলন করে। এর ফলে কামানের ব্যবহার সম্ভব হয় । সাধারণত ফ্রায়ার বেকন বারুদের আবিষ্কারক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছেন। কিন্তু S.P.Scott বলেন, "রেমন্ড, ফেভ, লি-বন, ভায়ারডট-এর কঠোর পরিশ্রম ও সুবিস্তারিত গবেষণা দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে আরবগণই বারুদ এবং কামানের আবিষ্কারক।"[১১৩] ("The laborious and exhaustive investigations of Reimand, Fave, Le-Bon and Viardot have demonstrated beyond dispute that the Arabs were the inventors of gan-powder and artillery.")

স্পেনের মূরেরা এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তের শতকে মূরগণ যে কামান বারুদ ব্যবহার করত তার অকাট্য প্রমাণ রয়েছে। এমনকি এগারো শতকের শেষ ভাগে সেভিলের মূরদের সাথে তিউনিসের মুসলমানদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে তারা কামান বারুদ ব্যবহার করে। একথা ঐতিহাসিক Lecky তাঁর *History of European morals*-এ স্বীকার করে গেছেন।

এছাড়া মিসরের সুলতানদের কামান বড় বড় প্রস্তর খন্ড নিক্ষেপ করে ১২৪৯ খ্রিস্টাব্দে সেন্ট লুইর সৈন্যদলে এদের রাজত্ব কায়েম করেন। ১২৫৭ খ্রিস্টাব্দে দশম আলফানসো অবরোধ করলে অবরুদ্ধ মূরেরা যে কামান ব্যবহার করে তা নিশ্চিত। ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন বলেন, "১২৭৩ খ্রিস্টাব্দে মরক্কোর আমির আবু ইউসুফ কর্তৃক সিদাজলমের অবরোধকালে কামানের ব্যবহার করা হয়। ইবনুল খাতিব বলেন যে, ১৩০০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে গ্রানাডায় কামান প্রস্তুত হতো। তিনি কামান প্রস্তুতকারক হিসেবে ইবনুল হাজের দক্ষতার প্রশংসা করেন। ইউরোপে ফ্রান্সের যুদ্ধ ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম কামানের ব্যবহার দেখা যায়। ডার্বি এবং সলসবেরির আর্লদ্বয় (Earl) ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে আল জেকিরাসের সম্মুখে একাদশ আলফানসোর সৈন্যদল থেকে মূরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। সেখান থেকে

---

[১১৩] S.P. Scott, *Op. cit.*,Vol.III, P. 634.

তারা কামান বারুদের ব্যবহার ১৩৪৬ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত ক্রেসীর যুদ্ধের চার বছর পূর্বে ইংল্যান্ডে প্রবর্তিত হয়। এরপর ইউরোপীয় যুদ্ধে এর ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়।

ইউরোপ মূর সভ্যতার নিকট চিরঋণী। স্পেনের মুসলিমদের গবেষণা প্রসূত জ্ঞান প্রসারিত না হলে ইউরোপ অন্ধকারে থেকে যেত। দ্রাবক ও গন্ধক দ্রাবক আরবদেরই আবিষ্কার। তারাই রসায়নশাস্ত্রের বহু উপাদান এবং সূত্রগুলো আবিষ্কার করেন। যেমন- মদ, নাইট্রিক এবং সালফিউরিক এসিড। Edward Gibbon বলেন, "তারাই প্রস্রবনের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম বক-যন্ত্র আবিষ্কার করেন।"[১১৪] ("They first invented and named the alembic.")

মূরেরা অন্য যে সমস্ত ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছেন তার মধ্যে নিম্নবর্ণিত রাসায়নিক উপাদানগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো হচ্ছে, ফিটকিরি (alum), Salammonia, সোরা বা যবক্ষার (Salt petre), সুরায়ার (alcohol), কাষ্ঠ ভস্ম ক্ষারের ধাতবিক মূল (Potassium) bich loride of mercury, nitrate of silver, corrosive sublimate (পারদ বিশেষ ফসফরাস)। এ সমস্ত দ্রব্যাদি দৈনিক সাজ, চিকিৎসা ক্ষেত্রে ও শ্রম শিল্প উন্নয়নে ব্যবহৃত হচ্ছে।

আরবেরা যবক্ষার ও পিপার গাত্র সংলগ্ন সুরাবিষ্ট (tartar) থেকে ক্ষার (alkali) প্রস্তুত করতে জানত। তারা প্রকৃতির ত্রি-রাজ্যের পদার্থবলির বিশ্লেষণ এবং ক্ষার ও দ্রাবকের রাসায়নিক সম্বন্ধ ও প্রভেদ পরীক্ষা করে। তাদের গবেষণার ফলে বিষাক্ত খনিজ পদার্থসমূহ মৃদু ও হিতকর ওষুধে পরিণত হয়। কস্টিক (caustic) ও দ্রাবকের ব্যবহার ওষুধে বিপ্লব আনে। মূরেরা জানত যে, উত্তাপে চূর্ণ করলে ধাতুর ওজন না কমে বরং বাড়ে। এই জ্ঞান গ্যাসের সাথে পরিচয় ও অম্লযান বাষ্প (Oxygen) আবিষ্কারের পূর্বাভাস, জলদানা বাষ্পের (hydrogen) অস্তিত্ব ও তার বিশেষ গুণ সম্বন্ধেও তারা অজ্ঞ ছিলনা।

জাবর আল কুফী বা জেবার (Geber) সর্বপ্রথম ধাতুকে অম্লজান জারিতকরণ (Oxidation) ও গ্যাস উৎপাদন (generation of gas) প্রণালী বর্ণনা করেন। তার ব্যক্তিগত ইতিহাস অজ্ঞাত অনেক সময় তাকে স্পেনের গণিতবিদ জাবর ইবনে আফনাহ বলে ভ্রম করা হয়েছে। ইউরোপীয় দৈনন্দিন জীবন, সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতায় আরব মূরদের অসামান্য অবদান রয়েছে। উল্লেখ্য যে আরবগণ ছাড়া কোন সুসভ্য জাতি সাবানের ব্যবহার জানত না। S.P.Scott এর ভাষায়, "প্রাচীন কালের কোন জাতি

---

[১১৪] Edward Gibbon, *Op. cit.*, P. 37.

তাদের সমস্ত সভ্যতার উপাদান থাকা সত্ত্বেও সাবানের সাথে সুপরিচিত ছিলনা যা আরবদের আবিষ্কার।"[১১৫] ("The ancients with all their civilization were unacquainted, with soap, which is an invention of the arabs.")

চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির মূলে আরব রসায়নবিদদের অক্লান্ত পরিশ্রম, মেধা ও অভিজ্ঞতাই ফলপ্রসূভাবে কাজ করে। তারা যে সমস্ত উপাদান, ফল-মূল, পানীয় আবিষ্কার করেছে তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হচ্ছে "কুচিলা (nux vormica), তেতুল (tarmarind), গন্ধ রস (myrrh), চন্দন (sandal), কাবাব চিনি (cabeb), গো-ধূমাদি নাশক ছত্রাক (ergot), সোনামুখী (sena), রেউ চিনি (rhubarb) ও কর্পূর (camphas)। এছাড়া তারা আদা, লবঙ্গ, জায়ফল, দা'রুচিনি প্রভৃতি রসালো জুলাপ (Julep) অন্তঃসার (elixir), আদব (syryp) ও মধু শর্করাদি মিশ্রিত অবলেহ ওষুধ (eletauries) প্রভৃতি যৌগিক উপাদানের (compound) প্রবর্তনের জন্য ইউরোপ স্পেন ও সিসিলির মূরদের নিকট ঋণী। উল্লেখ্য যে, ইউরোপীয় বাণিজ্য জগতে এ সমস্ত দ্রব্য আরবি নামে পরিচিত।"[১১৬]

অন্যান্য ক্ষেত্রের মত স্পেনের মূরগণ চিকিৎসা শাস্ত্রে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। স্বয়ং নবী করিম (সা.) তাঁর সাহাবীদের চিকিৎসা বিজ্ঞানে অধ্যয়ন ও অনুশীলন করার পরমার্শ দেন। প্রথম শতকের বিখ্যাত চিকিৎসকদের মধ্যে বিখ্যাত ছিল হারিস বিন কালাদাহ। উমাইয়া ও আব্বাসীয় আমলে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিকাশে দুটি পর্ব দেখা যায়। একটি অনুবাদের পর্ব; যখন যাবির বিন হাইয়ান, হুনাইন বিন ইসহাক এবং ঈসা বিন ইয়াহহিয়া গ্রিক চিকিৎসা শাস্ত্র ক্ষেত্রে গ্রন্থাবলি আরবিতে অনুবাদ করেন। অপরটি মৌলিক গবেষণা ও অবদানের পর্ব। এ পর্বে ৯০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১১০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মুসলিম চিকিৎসকগণ অভূতপূর্ব অবদান রাখেন বলে এ যুগকে স্বর্ণযুগ বলা হয়। এ যুগে যারা অসামান্য অবদান রাখেন তাদের মধ্যে জগৎ বিখ্যাত চিকিৎসকগণ ছিলেন : যেমন- আল রাজী, ইবনে সিনা, আলী ইবনে আব্বাস প্রমূখ পূর্ববর্তী চিকিৎসা বিজ্ঞানে চর্চা ও গবেষণার ধারা অব্যাহত রেখে স্পেন ও উত্তর আফ্রিকায় মুসলিম চিকিৎসকগণ চিকিৎসাবিজ্ঞানের সমস্ত ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন।

ঐতিহাসিক Sedillot বলেন, "একটি জাতির মেধার প্রতীক এবং ধর্মের জ্ঞানার্জনের প্রমাণ হিসেবে চিকিৎসাশাস্ত্র এবং শৈল্য চিকিৎসার সর্বোচ্চ অগ্রগতি সাধিত হয়। নিঃসন্দেহে গ্রিকদের মধ্যে চিকিৎসা

---

[১১৫] S.P. Scott, *Op. cit.*,Vol.III, P. 644.

[১১৬] P.K. Hitti, *Op. cit.*, P. 579.

বিজ্ঞানে উৎকর্ষতা লাভ করেছিল কিন্তু আরবগণ তাদের পূর্বসূরিদের সভ্যতার অগ্রগতিকে যতদূর প্রসারিত করেছিল তা থেকে বহু দূরে আরবগণ নিয়ে গিয়েছিল এবং আধুনিক বিজ্ঞানের পর্যায়ে আনতে সক্ষম হন।”[১১৭] (“The science of medicine and art of surgery, the best index to a nation's genius and a severe test to the intellectual spirit of a faith were developed to the highest degree of excellence among the Greeks but Arabs carried it for beyond the stage in which their predecesor's in the work of civizlization had left it and brought it close to the modern standard.”)

চৌদ্দ শতকে কালান্তর মহামারীর কবলে পড়ে বিধস্ত হয়েছিল ইউরোপ। তখন ঈশ্বরের অবহেলা ভেবে খ্রিস্টানরা অতি অসহায় হয়ে পড়েছিল। সে সময় গ্রানাডার মুসলিম চিকিৎসগণ রোগ সংক্রমনের তত্ত্বের পক্ষে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করেছিল। তাতে কিভাবে একজন ব্যক্তি রোগ সংক্রমিত হয়ে পড়ে, কিভাবে এই রোগীর সংস্পর্শে আসা অপর একজন ব্যক্তি এই রোগের শিকার হয়ে পড়ে, অন্য ব্যক্তি কিভাবে ওই রোগ থেকে নিরাপদ থাকে, কিভাবে ঐ রোগ ছড়ায় এসব সংক্রান্ত বিশদ সমালোচনা করা হয়েছে।

প্রায় সমস্ত স্পেনীয় আরব চিকিৎসক বুদ্ধিবৃত্তি এবং পেশাগত দিক থেকে জাত চিকিৎসক ছিলেন। মূর শাসিত স্পেনে চিকিৎসা বিজ্ঞানে অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেন আবুল কাসেম খালাফা ইবনে আব্বাস আল জাহরাভী (১০১৩ খ্রিস্টাব্দ)। পাশ্চাত্যে তিনি Abul casis নামে সুপরিচিত। দ্বিতীয় হাকামের রাজদরবারে বিশিষ্ট চিকিৎসক আল জাহরাভী এর খ্যাতির মূল উৎস তার রচিত প্রখ্যাত গ্রন্থ *আল তাসরিক লি মান আজাইজ আন আল তালিফ*। এই অমূল্য গ্রন্থে চিকিৎসা বিজ্ঞানের কমপক্ষে ৩০টি শাখায় তার পান্ডিত্য ও গবেষণালব্ধ ফসল লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে। সবাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ছিল, শৈল্য চিকিৎসার উপর। মূলত শৈল্য চিকিৎসক হিসেবে আল জাহরাভী পাশ্চাত্যের অসামান্য খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি প্রথম ক্ষতকে বন্ধ করা (cauterization of wonds), নালীতে পাথর ভাঙ্গার প্রক্রিয়া (Crushing of stone inside the bladder) এবং মানুষ ও জীবজন্তু ব্যবচ্ছেদ করার প্রয়োজনীয়তা (necessity of vivisection and dissection) উপলব্ধি করেন।

আল জাহরাভীর শৈল্য চিকিৎসা সম্পর্কিত পরিচ্ছেদগুলো ল্যাটিন ও হিব্রু ভাষায় অনুদিত হয়। ক্রীমোনার জেরার্ড এ অংশ ল্যাটিনে অনুবাদ করেন যা ১৪৯৭ খ্রিস্টাব্দে ভেনিসে, ১৫৪১ খ্রিস্টাব্দে ব্যাসলে এবং ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে অক্সফোর্ডে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থটি বহু শতক পর্যন্ত সালেরনো

[১১৭] Sedillot, *Historic des Arabs*, উদ্ধৃত, মুজাফফর আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৭।

মল্টাপিলার এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের অন্যান্য স্কুলে শৈল্যবিদ্যার ম্যানুয়েল হিসেবে পরিগণিত হয়। আল জাহরাভী তথ্য দিয়েই ক্ষান্ত হননি; শৈল্য চিকিৎসায় ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতির ছবিসহ বর্ণনা দেন। এর ফলে আরব অধ্যুষিত অঞ্চলেই নয়, সমগ্র ইউরোপে শৈল্য চিকিৎসা (Surgery) সম্প্রসারিত হয়।

শব ব্যবচ্ছেদে অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্র চিকিৎসার (Surgery) প্রভূত শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। আবুল কাসিম খালাফ মধ্যযুগে পাশ্চাত্য জগতের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত অস্ত্র চিকিৎসক। ঐতিহাসিক Joseph Hell তাঁর সম্পর্কে বলেন- আবুল কাসিম পাশ্চাত্যে মধ্যযুগে সর্বশ্রেষ্ঠ শৈল্য চিকিৎসক হিসেবে সম্মান পেয়েছে। (Abul Qasim was reckoned in the west an the most eminent surgeon of the middle age.) একই মত প্রকাশ করে S.P.Scott বলেন, "আবুল কাসিম আধুনিক শৈল্য চিকিৎসার জনক।"[১১৮] ("Abul casim is the originator of modern surgery.") তিনি পাথরির (Lithotony) ব্যাখ্যা দিয়ে ছেদনের উপদেশ দেন। আজ পর্যন্ত এ পদ্ধতি চিকিৎসকগণ ব্যবহার করে আসছেন। ছুরি ও লৌহ শলাকা (coutery) ব্যবহার করতেন। ঐতিসাহিক S. Lanepooleও স্বীকার করে বলেন যে, "আধুনিক কালে ব্যবহৃত অস্ত্রোপচারের যে পদ্ধতি রয়েছে তা তার কাছে থেকেই এসেছে।"[১১৯] ("Some of his operations concided in the present practice.")

আল জাহরাভীর একজন সহকর্মী ছিলেন ইহুদি সম্প্রদায়ভূক্ত হাসাদ বিন শাপরুত। তিনিও একজন চিকিৎসক ছিলেন এবং তিনি খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমানের নিকট বাইজান্টাইন সম্রাট সপ্তম কনস্টানটাইন কর্তৃক উপহার হিসেবে প্রেরিত ডাইসকোরাইডসের *মেটেরিয়া মেডিকা* আরবিতে অনুবাদ করেন। এ অনুবাদে হাসাদকে সাহায্য করেন নিকলাস নামের একজন বাইজান্টাইন পাদ্রী।

মুসলিম স্পেনের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ছিলেন আবু মারওয়ান আব্দুল মালিক ইবনে আবি আল আলি ওরফে ইবনে যুহুর *(Avenzoor)*। তিনি স্পেনের সবচেয়ে বিখ্যাত চিকিৎসক পরিবারের সদস্য ছিলেন। যার পরিবার তিন শত বছর ধরে স্পেনের চিকিৎসাক্ষেত্রে বিরাজমান ছিলেন। ইবনে যুহুর **১০৯১** খ্রিস্টাব্দ এবং **১০৯৪** খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সেভিলে জন্মগ্রহণ করেন। সেভিলেই **১১৬২** খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি মুয়াহ্হিদ বংশের প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল মুমীনের উজীর ও প্রধান চিকিৎসক ছিলেন।

---

[১১৮] S.P. Scott, *Op. cit.*, Vol.III, P. 519.
[১১৯] Stanely Lanepoole, *Op. cit.*, P. 144.

আল রাজীর পরেই ইবনে যুহুর; তিনি মুসলিম বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিজ্ঞানী ছিলেন। ইবনে যুহুর চিকিৎসা শাস্ত্রের উপর মোট ছয়টি গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে তিনটির সন্ধান পাওয়া গেছে। এসব গ্রন্থের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে *আল তাফসির ফি আল মুদাওয়া ওয়া আল তদবীর*। এ অমূল্য গ্রন্থটি তার পরম বন্ধু ইবনে রুশদের অনুরোধে রুশদের *আল কুল্লিয়াত* গ্রন্থের পরিপূরক হিসেবে রচিত হয়। হিট্টি বলেন যে, "*কুল্লিয়াত* অপেক্ষা *তফসীরে* বিষয়বস্তুর বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়। *আল কুল্লিয়াত* গ্রন্থে ইবনে রুশদ আবু যুহুরকে গ্যালেনের পরে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক হিসেবে চিহ্নিত করেন। যা হোক আল রাজীর পরে তিনি নি:সন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ রোগ নির্ণয়কারী (Clinician)।"[১২০] তার পরিবার ছয়টি বংশ পরম্পরায় সরাসরি ভাবে চিকিৎসাবিজ্ঞানে আত্মনিয়োগ করেন।

ইবনে যুহুর সর্বপ্রথম হাড়ের অনুভূতি নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং খোস-পাঁচড়ার (সুরাবাত আল-জারাব) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁর আবিষ্কারেরও বহুপূর্বে আহমদ আল তাবারী দশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে তাঁর *আল মুয়ালাজাহ আল বুকরাতিয়া* বইতে খোস-পাঁচড়া সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তার বংশধর আবু মারওয়ানের পর তার পুত্র আবু বকর মুহম্মদ (১১৯৮ খ্রিস্টাব্দ-৯৯ খ্রিস্টাব্দ) ছিলেন সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সদস্য। অবশ্য চিকিৎসা সংক্রান্ত কার্যকলাপের তুলনায় আরবি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর দক্ষতার জন্যই তিনি বেশি খ্যাতি লাভ করেছিলেন। সূক্ষ্ম মানসিক অনুভূতির পরিচায়ক মুওয়াশশাহ্ সহ অনেক কবিতাই তাঁর নামে উৎসর্গকৃত। মুয়াহ্হিদ বংশের খলিফা আবু ইউসুফ ইয়াকুব আল মুনসুর তাকে মাররাকুশে তাঁর চিকিৎসক হিসেবে নিয়োগ করেছেন এবং সেখানেই এক ঈর্ষাপরায়ণ উজির বিষ প্রয়োগ করে তাকে হত্যা করেন। তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় খলিফা নিজেই ধর্মীয় বাণী পাঠ করেছিলেন।

ইবনে যুহুর পরিবারের আর একজন অর্থ্যাৎ তাঁর দাদু স্পেন, বাগদাদ, আল-কায়রোওয়ান ও কায়রোতে চিকিৎসক হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। তাঁরও নাম ছিল আবু মারওয়ান আবদ আল মালিক। প্রাচ্যে আর ও একজন হিস্পানো-আরব চিকিৎসক চিকিৎসার পেশায় যুক্ত ছিলেন। তিনি হলেন আল মেরিয়া (আল-মারিয়া)র নাগরিক উবাইদুল্লা ইবনে আল মুজাফফর আল বাহিলি। একাধারে কবি ও চিকিৎসক আল বাহিলি ১১২৭ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদের মালিক খলিফা মাহমুদ ইবনে মালিক শাহ'র চাকরিতে সেবা দেন এবং ৪০টি উটের পিঠে এক চলমান হাসপাতাল তাকে সরবরাহ করা হয়।

---

[১২০] P.K. Hitti, *Op. cit.*, P. 577-78.

দার্শনিক হিসেবে ইবনে রুশদ যেমন পরিচিত, তেমনি চিকিৎসক হিসেবেও রুশদ সর্বাধিক পরিচিত। তাঁর খ্যাতির মূল ভিত্তি হচ্ছে চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ *আল কুল্লিয়াত ফি আল তিব্ব* (ওষুধসমূহের বিবরণ)। তিনি এ গ্রন্থে সর্বপ্রথম উল্লেখ করেন যে, বসন্ত একাধিকবার হয়না এবং চোখের দৃষ্টিতে রেটিনার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।[১২১]

মূর শাসিত স্পেনে চিকিৎসকগণ চিকিৎসাবিজ্ঞান, শৈল্য চিকিৎসা, ব্যবস্থাপত্র বিজ্ঞান, ওষুধ তৈরির প্রক্রিয়া (Pharmacy) প্রভৃতি ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখেছেন। আরব ইবনুল সায়দুল খাতেব *এর* গ্রন্থ সংখ্যা সহস্রাধিক। তিনি স্ত্রীরোগ চিকিৎসা ও ধাত্রীবিদ্যা সম্বন্ধে পুস্তক লেখেন। তাঁর *কর্ডোভার পঞ্জিকা* আয়ুর্বেদ, অস্ত্র চিকিৎসা, জ্যোতির্বিদ্যা ও কৃষি বিষয়ক জ্ঞানের এক অপূর্ব সংকলন। টলেডোর ইবনে ওয়াফেদ দশ শতকের লোক, অসাধারণ ধী শক্তির বলে তিনি তার সমকালীন শতশত বিখ্যাত লোকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন। তাঁর অসাধারণ চিকিৎসা ব্যাখ্যায় সম্পর্কিত গ্রন্থ দীর্ঘ বিশ বছরের অক্লান্ত সাধনার ফল। *দায়ুদ আল আগবেরি* রসাঞ্জন (Collyrium), গন্ধকাদির ধূম্র প্রদান (furnigation) ও (hemostatics) সম্বন্ধে গ্রন্থ লেখেন। ইবনুল হায়সাম ও আলী ইবনে আস এর গ্রন্থ চক্ষু রোগ চিকিৎসকদের পক্ষে অপরিহার্য।

মধ্যযুগীয় ইউরোপে চিকিৎসা শাস্ত্রের অভাবে জীবন যাত্রা ছিল দুর্বিষহ। বহু শতক পর্যন্ত খ্রিস্টান ইউরোপের অধিবাসীগণ উপযুক্ত রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার অভাবে হাতুড়িয়াদের উপর তুকতাক চিকিৎসা, যাজকদের ঝাড়ফুক এর উপর নির্ভর করত। প্রার্থনা, কবচ, সাধু সন্ন্যাসীদের উপদেশ প্রভৃতির উপর তাদের নির্ভর করতে হতো।

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের অভাবে বিনা চিকিৎসায় তারা প্রাণ ত্যাগ করত। কঠিন রোগের কোন চিকিৎসাই ছিলনা। স্নান করা নিষিদ্ধ হওয়ায় স্নানাগার ছিলনা। ফলে রোগ জীবাণু ছড়িয়ে জনজীবন মারাত্মক হুমকীর সম্মুখীন হত। ১২৫০ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে দুই হাজার এবং ইউরোপের অন্যান্য স্থানে উনিশ হাজার কুষ্ঠ নিবাস ছিল। ঐতিহাসিক Draper বলেন, “যে দ্রুত হারে ঐ ব্যাধি সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে তা সে যুগের নৈতিক অধঃপতনের গুরত্বপূর্ণ দিকের প্রতি ইঙ্গিত করে। এমন কোন বিবাহিত, অবিবাহিত, যাজক অথবা সাধারণ লোক, পোপ দশম লিও থেকে পথের ভিক্ষুক পর্যন্ত সর্ব শ্রেণির লোকই সিফিলিসের আক্রমণ থেকে রেহাই পায়নি।”[১২২] (“The rapidity of its spread all over Europe is a significant illustration of the fearful immortality of the times there

[১২১] *Ibid,* P. 582.
[১২২] J.W. Draper, *Op. cit.,*Vol.II, P. 332.

was not a class marreid or unmarried, clergy or laity, from the holy father Leox to the begger by the way-side, free from it syphilis.”)

সমগ্র ইউরোপ যখন চিকিৎসা ক্ষেত্রে এক অসহনীয় অবস্থা বিরাজ করছিল তখন মূর চিকিৎসকগণ তাদের পাণ্ডিত্য, ধীশক্তি, মৌলিক গবেষণা দ্বারা সমগ্র ইউরোপে ব্যাপক অবদান রাখতে সমর্থ হয়। ঐতিহাসিক Thatcher and schwill বলেন, “ইউরোপে ধর্মযাজকেরা যখন ওষুধের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে পাদ্রীদের সম্পাদিত ধর্মানুষ্ঠান দ্বারা রোগ আরোগ্যের ব্যবস্থা দিচ্ছিল তখন আরবেরা প্রকৃত চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রবর্তন করে।”[১২৩] (“At a time when in Europe the practice of medicine forbidden by the Church, which expected cure to be effected by religious rites performed by the clergy, Arabs had a real science of medicine.”)

মূরগণ চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রকৃত জ্ঞানলাভের জন্য একদিকে যেমন চিকিৎসা বিদ্যালয় প্রবর্তন করে, অন্যদিকে বাস্তব অভিজ্ঞতা দ্বারা চিকিৎসার ব্যাপক অগ্রগতি সাধনের জন্য বহুস্থানে হাসাপাতাল বা বিমারিস্তান নির্মাণ করে। আব্বাসিয়, ফাতেমীয়, মামলুক আমলে চিকিৎসা বিদ্যালয়, ঔষধালয় ও পর্যবেক্ষণাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। অনুরূপ প্রতিষ্ঠান স্পেনের খিলাফত এবং স্বাধীন রাজ্যের শাসনামলে প্রকাশ পায়। বিভিন্ন রোগ নিরাময়ের জন্য বিভিন্ন ধরনের হাসপাতাল নির্মিত হয়। যেমন - উন্মাদের জন্য বাতুলালয় (asylum)। স্পেনেই প্রথম বাতুলালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এ ধরনের চিকিৎসায় মূরদের কৃতিত্ব স্বীকার করে ঐতিহাসিক Lecky বলেছেন- প্রাচীনকালে পাগলাগারদের অস্তিত্ব ছিলনা মুসলমানগণই মানবতার সেবায় প্রথম পাগলাগারদ প্রতিষ্ঠা করে। (No lunatic asylum appears to have existed in antiquilty. The Mahammedans in this charity were early in the field.)

চিকিৎসা ক্ষেত্রে শিক্ষাব্যবস্থা ছিল খুবই সুপরিকল্পিত। পাঠ্যক্রম, শিক্ষক নির্বাচন, তথ্যগত এবং ব্যবহারিক জ্ঞান যাতে বিদ্যার্থিগণ গ্রহণ করতে পারে সেজন্য চিকিৎসার স্কুল ও তৎসংলগ্ন হাসাপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়। আল রাজীর বিশ্বকোষ, ইবনে সিনার চিকিৎসা পদ্ধতি ও আলী ইবনে ঈসার গ্রন্থাবলি ব্যবহার করতে আরম্ভ করে। খলিফাদের লাইব্রেরীতে প্রত্যেক প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পুস্তকই পাওয়া যেত। শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে ব্যবহারিক জ্ঞানের জন্য যে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা হয় তাতে আধুনিক কালের হাসপাতালের মত বিভিন্ন রোগের জন্য পৃথক পৃথক ওয়ার্ড সৃষ্টি করা হয়। পুঁথিগত

[১২৩] Thatcher and Schwill F. *Op. cit.*,Vol.I, P. 174.

বিদ্যা অপেক্ষা হাসপাতালে রোগীর চিকিৎসা মাধ্যমে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও প্রকৃত জ্ঞান লাভের প্রতি তাদের অধিক আগ্রহ ছিল।[১২৪]

রোগ নির্ণয় (diagnosis) ও রোগমুক্তি (cure) মূর চিকিৎসকদের প্রধান কর্তব্য ছিল। রোগ নির্ণয়ের বিভিন্ন প্রক্রিয়া ছিল। এ কারণে রোগ নির্ণয়ের জন্য Pathology বা ব্যাধি বিজ্ঞান শাস্ত্রের উদ্ভব হয়। রোগ নির্ণয়ের পর ব্যবস্থাপত্র দেয়া হত এবং ওষুধ (ভেষজ, হেকিমী) দেয়া হত। চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিশেষ একটি শাখা চক্ষু বিজ্ঞান (Opthalmology)। মুহম্মদ ইবনে কাসিম চক্ষু রোগের উপর ৬০০ পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থ রচনা করেন। সালাহ্উদ্দিন বিন ইউসুফ চক্ষু ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা ও দৃষ্টি বিচার (Theories of vision) সম্বন্ধে পুস্তক প্রণয়ন করেন। এছাড়া তারা আরোগ্যবিজ্ঞান (Therapeuties), মৃগিরোগ (apoplexy), নিদানশাস্ত্র (etiology), অম্লদ্রব্য (acidity) সম্বন্ধে মূর চিকিৎসকদের সম্যক জ্ঞান ছিল। স্পেনের সর্বশ্রেষ্ঠ শৈল্য চিকিৎসক আবুল কাসিম পাশ্চাত্য জগতে সমধিক পরিচিত ছিলেন।[১২৫]

স্পেনের চিকিৎসকগণ সংজ্ঞানাশক পদার্থ যেমন- রাইঘাস (darnel), মাদকদ্রব্য (decoction) দ্বারা রোগীকে অজ্ঞান করার পদ্ধতি জানতেন। মুহম্মদ আত তেমনি ফোঁড়া (hernia) ও অন্ত্রবৃদ্ধি রোগ (tumors) চিকিৎসা সম্বন্ধে ৪০০ পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এ ছাড়া চোখ উঠার (Opthalmia) চিকিৎসাও তারা জানতেন। স্ত্রীরাগ (gynaecology) সম্বন্ধেও তাদের যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। কিন্তু চিকিৎসকগণ স্বহস্তে তা করতেন না। মহিলা চিকিৎসক ও ধাত্রী দ্বারা রোগীদের চিকিৎসা করা হতো। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক S.P.Scott বলেন, "বর্তমান যুগের চিকিৎসকেরা পোমেড (কেশাদির নির্মিত সুগন্ধি স্নেহপদার্থ), মলম, বস্ত্রলিপ্ত মলম বা পটী উত্তেজনা নাশক ওষুধ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের যে সমস্ত স্থানীয় প্রয়োগের দ্রব্য ব্যবহার করছেন মুসলিম স্পেনেই তার উৎপত্তি"।[১২৬] ("The various topical applications used at present Profession-such as ungenots, plasters, counter irritants and pomades, originated in Mohammeden spain".)

মূর চিকিৎসকগণ চিকিৎসা ক্ষেত্রে যে অসামান্য অবদান রেখেছেন তার আর ও প্রমাণ রয়েছে। স্নায়ুর রোগ নির্ণয়ে তারা বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। এ রোগের চিকিৎসার জন্য তারা বলদায়ক ওষুধের

---

[১২৪] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৫।
[১২৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৬।
[১২৬] S.P. Scott, *Op. cit.*, Vol.III, P. 516.

পরিবর্তে প্রদাহনাশক ওষুধের (refrigerant) ব্যবস্থা দিতেন। রক্ত স্রাবের (heaemorrag) ক্ষেত্রে ঠান্ডা পানির উপকারিতা তাদের জানা ছিল। তারাই প্রথম মহিলাদের ঋতুস্রাবের জন্য পট্টি বন্ধন প্রভৃতি পদ্ধতি প্রবর্তন করেন যা পৃথিবীর সর্বত্র স্বীকৃত। মূর চিকিৎসগণ গরম পানিতে স্নান করিয়ে সান্নিপাতের জ্বরবিকার বা টাইফয়েড করে রোগের চিকিৎসা করতেন। সেভিলের চিকিৎসক ইবনে যুহর সর্বপ্রথম একটি ক্ষুদ্র পরগাছা (Parasite) আবিষ্কার করেন যা দ্বারা তিনি পাঁচড়া (scabies) চিকিৎসা করতেন। পাঁচড়া যাতে বৃদ্ধি না পায় সেজন্য তিনি গন্ধক (sulpur) ব্যবহারের নির্দেশ দেন। ফুসফুসজনিত রোগের যেমন- যক্ষ্মার চিকিৎসার জন্য আবহাওয়া পরিবর্তনের ব্যবস্থা দিতেন।[১২৭]

শুধু মানুষের চিকিৎসার নয় মূর বিজ্ঞানিগণ পশু চিকিৎসার বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। Veterinary বা পশু চিকিৎসায় বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেন আবু বকর ইবনে বদর। পূর্বে বলা হয়েছে যে, শব ব্যবচ্ছেদ বা Dissection এ মূর চিকিৎসকগণ বিশেষ অবদান রাখেন এবং আবুল কাসিম মৃতদেহ প্রথম ব্যবচ্ছেদ করে যশস্বী হয়েছেন। অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে তাদের কোন সীমাবদ্ধতা ছিলনা। ইবনে যুহুর শ্বাসনালীর (tracheotomy) অস্ত্রোপচার এবং Pericarditis বা হৃদযন্ত্রের চারিপাশের ঝিল্লীর প্রদাহ প্রভৃতির মৌলিক বিবরণের জন্য অশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেন।

শল্য এবং চক্ষু চিকিৎসার ক্ষেত্রে আরব তথা মূরদের সর্বাধিক অবদান লক্ষ করা যায়। চক্ষু বিশেষজ্ঞগণ কমপক্ষে নয়টি ছানি বা cataract এর বিবরণ দিয়েছেন এবং এগুলোর অস্ত্রোপচারের নিয়মাবলিও তারা লিপিবদ্ধ করেছেন। তারা ছানী তুলে দিতে পারতেন অথবা নতুন চোখ (কর্ণিয়া) বসিয়ে দিতে পারতেন। মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত চোখে সূচ ফুটিয়ে তার চিকিৎসা করা হত। তারা গোলাকার অথবা ত্রিকোণাকার সূচ ব্যবহার করতেন। এগুলো কখনও ফাঁপা আবার কখনও কাঁচের তৈরি হত। নাসারোগ (Polyhi) উৎপাটনের জন্য তারা ধাতুর তৈরি আকঁড়া (hook) ব্যবহার করতেন।

ঐতিহাসিক S.P.Scott বলেছেন, "এমব্রুজ প্যারের চারশত বছর পূর্বে আরবগণ ধমনী রন্ধন প্রক্রিয়া জানত এবং seton অর্থ্যাৎ শরীর থেকে পুজ বা দূষিত রক্ত বা রস বের করার জন্য ঘোড়ার বলমচি বা রেশমী সূতার পলিতা তাদের আবিষ্কার"।[১২৮] ("The Arabs were the first to performance the important operation of lithotomy and to reduce old dislocations. They kney how to ligature the or teries four centuries before Ambrose pare. The seton is their invention.")

---

[১২৭] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৬।

[১২৮] S.P. Scott, *Op. cit.*, Vol.III, P. 514.

ঔষধবিজ্ঞান এবং ভেষজশাস্ত্রের সঙ্গে আরবদের বহুপূর্ব থেকেই পরিচিতি ঘটে। বিশেষ করে ডাইসকোরাইডসের মেটেরিয়া মেডিকার অনুবাদের মাধ্যমে ভেষজশাস্ত্রে (Pharmacopeoa) অগ্রগতি ব্যতিরেকে চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতি সাধিত হত না। গাছ গাছড়াই হচ্ছে ভেষজশাস্ত্রের মূল ভিত্তি। উদ্ভিদ বিজ্ঞানের পাশাপাশি ভেষজশাস্ত্রের চর্চা হতে থাকে। ইবনুল আওয়ামের গ্রন্থে কমপক্ষে ছয়শত বিভিন্ন ধরনের ওষুধ প্রস্তুতের প্রয়োজনীয় গাছ-গাছড়ার বিবরণ পাওয়া যাবে। ইবনে বায়তারও তিনশত গাছ গাছড়ার গুণাবলি সম্বলিত একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ইবনে আশুরির ভেষজবিজ্ঞান সর্বজন বিদিত ছিল।

মূর সভ্যতার অন্যতম অবদান চিকিৎসাবিজ্ঞান এবং ঐতিহাসিকদের মতে রাজধানী কর্ডোভায় কমপক্ষে পঞ্চাশটি হাসপাতাল ছিল। ঐতিহাসিক E.Gibbon বলেন, "মূরদের চিকিৎসা কৌশলের উপরই স্পেনের ক্যাথলিক শাসকদের জীবন নির্ভর করত।"[১২৯]

ঐতিহাসিক S.Lanepoole বলেন, "গ্যালেনের পর থেকে শত শত বছরের মধ্যে চিকিৎসাবিজ্ঞানের যে উন্নতি আন্দালুসিয়ার চিকিৎসক ও শৈল্য চিকিৎসকগণের আবিষ্কারের ফলে তা তদপেক্ষা অধিক সমৃদ্ধ হয়।"[১৩০] ("Medicine received more and greater addition by the discoveries of the doctors and sergoens of Andulusia than it had gained during all the centuries that had elapsed since the day of Galen.")

সঙ্গীত ও সভ্যতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে মূরদের অবদান ছিল অপরিসীম এবং অনস্বীকার্য। সঙ্গীত চর্চায় মূরদের প্রতিভা প্রতিফলিত হয়। স্পেনীয় আরবদের সঙ্গীত কলার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন জিরয়াব। জিরয়াব আরবি শব্দ; এর অর্থ সোনালি পানি। এটি প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পি আব্দুল হাসান আলী ইবনে নাফ'র ডাক নাম। তিনি আব্বাসিয় খলিফা হারুন আল রশীদের এবং তার উত্তরাধিকারীদের আমলে দরবার শিল্পী ছিলেন এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সঙ্গীত বিদ্যার প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। তিনি তার ওস্তাদ ইসহাক বিন মাউসিলির'র নিকট সঙ্গীত পাঠ নেন এবং মাউসিলি ছিলেন সে সময়ের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সঙ্গীত বিশারদ।

কথিত আছে শিষ্য জিরয়াবের খ্যাতি এরূপ বৃদ্ধি পায় যে; তাতে ওস্তাদ মাউসিলি ঈর্ষান্বিত হন। এর ফলে বাগদাদে থাকা সমীচীন মনে না করে ৮২২ খ্রিস্টাব্দে জিরয়াব উত্তর আফ্রিকায় আত্মগোপন করেন। পরে তিনি স্পেনে আসেন এবং দ্বিতীয় আব্দুর রহমানের দরবারে রাজসঙ্গীতজ্ঞ হিসেবে যোগ দান করেন।

---

[১২৯] E. Gibbon, *Op. cit.*, Vol.VI, P. 36.
[১৩০] Stanely Lanepoole, *Op. cit.*, P. 144.

কথিত আছে যে, সঙ্গীত জগতে জিরয়াবের এমনই সুখ্যাতি ছিল যে, কর্ডোভায় আগমনের পর খলিফা দ্বিতীয় আব্দুর রহমান স্বয়ং অশ্বপৃষ্ঠে শহরের প্রান্তে গিয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানান। S.M. Imamuddin এর মতে "তিনি বাৎসরিক ২০,০০০ দীনার ভাতা পেতেন। খলিফা তার জন্য কর্ডোভায় ৪০,০০০ দীনার মূল্যের এক প্রাসদোপম বাসস্থান নির্মাণ করেন।"[১৩১]

সুমিষ্ট কণ্ঠ, ছন্দায়িত মূর সঙ্গীতে পারদর্শী জিরয়াব অতি অল্প সময়ে দ্বিতীয় আব্দুর রহমানের দরবারে একজন প্রভাবশালী অমাত্য হয়ে পড়েন। সঙ্গীতে তার প্রতিভার স্ফুরণ পায় এবং অচিরেই তিনি ১০,০০০ সঙ্গীত রচনা করে প্রতিভাধর সঙ্গীত রচয়িতার মর্যাদা লাভ করেন। তার সুনাম অন্যান্য সঙ্গীত বিশারদকে ছাড়িয়ে যায়। তিনি স্পেনীয় আরব বা মূর সঙ্গীতের ধারা প্রবর্তন করেন এবং কর্ডোভায় একটি সঙ্গীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী পর্যায়ে সেভিল, টলেডো ও গ্রানাডায় অনুরূপ সঙ্গীত চর্চার নিকেতন স্থাপিত হয়। দরবারে রীতিমত আসর বসত চিত্তবিনোদনের জন্য এবং বিভিন্ন প্রকারের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হত। জিরয়াব যে একজন প্রথিতযশা সুর সাধক ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। তিনিই প্রথম ইউরোপে প্রাচ্যদেশীয় সঙ্গীত প্রবর্তন করেন। স্পেনে তিনি যে সঙ্গীত প্রচলিত করেন তা তাঁর শিষ্যগণ আরও সুদূর প্রসারী করেন। তাঁর ছয়পুত্র এবং দুই কন্যাও পিতার গুণের অধিকারী ছিলেন। জিরয়াবের শিষ্যদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আবু হাফসা কন্যা মুসাবিহ এবং মুতা; যিনি তৃতীয় আব্দুর রহমানের দরবার অলংকৃত করেন।

জিরয়াবের পর সঙ্গীত জগতে যার নাম করতে হয় তিনি হচ্ছেন আবুল কাশিম আব্বাস ইবনে ফিরনাস। তাঁকে প্রতীচ্যে প্রাচ্য সঙ্গীত প্রচলনের জন্য কৃতিত্ব দেয় হয়। হিট্টি বলেন, "জিরয়াব এবং ইবনে ফিরনাস কর্তৃক প্রবর্তিত সঙ্গীতের সূত্র এবং প্রয়োগগুলো পারস্য-আরব কিন্তু ক্রমশ এই পদ্ধতি গ্রিক ও পীথাগোরীয় সূত্রে রুপান্তরিত হয়; যখন গ্রিক ভাষা থেকে গ্রন্থাবলি আরবিতে অনুবাদ হয়।"[১৩২] এগারো শতকে আব্বাসীয় যুগের সঙ্গীত চর্চা আন্দালুসীয় সঙ্গীতের কাছে ম্লান হয়ে যায়। এ যুগে আব্বাসীয় সুলতান মুতামিদের (১০৬৮ খ্রিস্টাব্দ-৯১ খ্রিস্টাব্দ) রাজত্বকালে সেভিল কর্ডোভার স্থান দখল করে এবং সঙ্গীত চর্চার প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়।

সুলতান আল মুতামিদ কবি ও বাদ্যযন্ত্রী (flulist) ছিলেন। সেভিলে ও কর্ডোভায় বাদ্যযন্ত্র তৈরি করা হতো। এ যুগে সঙ্গীতের ওপর বিভিন্ন গ্রন্থ রচিত হয়। মুরাবিতুন যুগের দার্শনিক ইবনে বাজ্জাহ্ (১১৩৮

---

[১৩১] S.M. Imamuddin, *A Political History of Muslim Spain* (Dacca: Najmah Sons, 1969), P. 595.

[১৩২] P.K. Hitti, *Op. cit.*, P. 145.

খ্রিস্টাব্দ) সঙ্গীতের ওপর একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থটি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। মুয়াইহিদের রাজত্বকালে ইবনে সাবিন (১২৬৯ খ্রিস্টাব্দ) সঙ্গীতের নোটেশন সম্বলিত একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গ্রন্থটির নাম *কিতাব আল আদওয়ার আল মনসুর*। যার মাত্র একটি কপি কায়রোতে সংরক্ষিত আছে।

বিবেচনার সাথে সঙ্গীত ব্যবহার করতে পারলে কিরূপ ঐন্দ্রজালিক ফল পাওয়া যায় মূরেরা তা সম্পূর্ণ রূপে অবগত ছিলেন। কেবল উৎসব উপলক্ষ্যেই সঙ্গীত অপরিহার্য ছিল না; এটি শোকে সান্ত্বনা এনে দিত। রোগের উপশমে এটি অত্যন্ত উপকারী বলে বিবেচিত হত। নিদ্রাহীনতার যন্ত্রনা থেকে মুক্ত করার জন্য মূর গায়কেরা গান শুনাতেন। সঙ্গীত রোগে আরোগ্যের সহায়তা করে এটি তারা ভালভাবেই জানত। সেজন্য তারা বড় বড় হাসপাতালে অবিরত গায়ক দল পাঠাত। ধর্ম বিরুদ্ধ হলেও আরবদের ন্যায় আর কোন জাতি সঙ্গীতের এত ভক্ত ছিল না। সুনিপুন সঙ্গীতজ্ঞের পক্ষে মাত্র একটি বার গান গেয়ে দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা অর্জন করা অসাধারণ ব্যাপার ছিল না।

বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র আবিষ্কার করে আরব মূরেরা যশস্বী হয়েছেন। কথিত আছে যে, সর্বমোট তেরটি বাদ্যযন্ত্র স্পেনে প্রচলিত ছিল। এগুলোর মধ্যে বীণা, বেহালা, সারঙ্গ প্রভৃতি প্রধান। বাদ্যযন্ত্র নির্মাণের জন্য শ্রেষ্ঠ স্থান ছিল সেভিল। এজন্য প্রবাদ প্রচলিত ছিল যে, কর্ডোভার পুস্তক আর সেভিলের বাদ্যযন্ত্র সর্বোচ্চ মূল্যে বিক্রি হত। আঘাত দিয়ে যে সমস্ত যন্ত্র তৈরি হত (Percussion) তাই মূরদের বেশি পছন্দ ছিলো। যেমন-ঢাক, খঞ্জনী, (tambourine)। এগুলোর গঠনশৈলীও ছিল অভিনব। তাদের সেতার, সারঙ্গ ও Calrionet নামক প্রখ্যাত বাদ্যযন্ত্রগুলো কাঠের তৈরি ছিল। জিরয়াব কেবল একজন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত বিশারদই ছিলেন না, তিনি উদ্ভাবকও ছিলেন। বাগদাদে আব্বাসীয় দরবারে জালজাল (Zalzal) নামের একজন সঙ্গীত বিশারদ বসবাস করতেন। তিনি চার তার বিশিষ্ট একটি বীণা উদ্ভাবন করেন, যা *উদ আল সাবুত* নামে পরিচিত ছিল। জিরয়াব পরীক্ষা নিরীক্ষা করে চার তারের স্থলে পাঁচটি তার সংযোগ করে এই নতুন বাদ্যযন্ত্রটি উদ্ভাবন করেন।

জিরয়াব কাঠের *ঠুসীর* (যা দিয়ে তারে ঝঙ্কার সৃষ্টি করা হয়) পরিবর্তে ঈগল পাখির নখ ব্যবহার করতেন। এছাড়া দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ তার সিংহ শাবকের অন্ত্র দিয়ে তৈরির পদ্ধতি তিনি আবিষ্কার করেন। এর ফলে অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র অপেক্ষা জিরয়াব উদ্ভাবিত বাদ্যযন্ত্রের সুরে মোলায়েম আবেশ ও গভীরতা সৃষ্টি হয়। সঙ্গীত শিক্ষক হিসেবে জিরয়াব অশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি তার শিক্ষার্থীদের সঙ্গীত চর্চার পূর্বে কোমরে শক্তকরে পাগড়ী বেঁধে দিতেন। যাতে তারা সুরেলা আওয়াজ করতে পারে। এছাড়া তিনি তাদের মুখের মধ্যে তিন ইঞ্চি চওড়া কাঠের খন্ড প্রবেশ

করিয়ে তাদের চোয়াল প্রশস্ত করে সজোরে চিৎকার করতে বলতেন। এ পদ্ধতিটি *ইয়া হাজ্জাম* বা *আহা* নামে পরিচিত ছিল। জিরয়াব একজন প্রথিতযশা সুর সাধক ছিলেন এবং ইউরোপে প্রথম প্রাচ্য সঙ্গীত প্রবর্তন করেন।

মূরগণ যে সমস্ত পাশ্চাত্য বাদ্যযন্ত্র আবিষ্কার করে খ্যতি অর্জন করেন তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ম্যান্ডোলীন, চার্চ অর্গান, বীণা (lute), যা আরবিতে *আল উদ* নামে পরিচিত। S.P.Scott বলেন, "তারা পূর্বেই ম্যান্ডেলীন এবং অর্গানের আবিষ্কারক।"[১৩৩] ("They were the inventor of the Mandolin and and the organ.")

এছাড়া Clarionet এর কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। হিট্টি বলেন, "পরিমেয় সঙ্গীত সর্বশ্রেষ্ঠ হলেও জ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রেও আরবদের যথেষ্ট অবদান ছিল।"[১৩৪] স্পেনীশ আরবগণ ইউরোপে দুটি বাদ্যযন্ত্র প্রচলিত করেঃ একটি *আল-উদ* বা বীণা (lute) এবং অপরটি *রাবারা* বা বেহালা (violin) । রাবারা নিঃসন্দেহে আধুনিক ইউরোপে ব্যবহৃত Violin এর পূর্বসূরি। ইউরোপীয় বাদ্যযন্ত্রের অধিকাংশই মূরদের উদ্ভব। যেমন- *আনফিল* অথবা *আল-নাদির* যা পাশ্চাত্যে শিঙ্গা (trumpet) নামে পরিচিত। অন্যান্য উদ্ভাবিত বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য খঞ্জনী (tambourine) গীটার যার উৎপত্তি হয়েছে আরবি শব্দ *কিতাবা* থেকে, শিঙ্গা (horn) আরবি *আল-বুক*, তবলা আরবি *আল-তাবল* থেকে উৎপত্তি হয়েছে।

পাশ্চাত্য সঙ্গীতে আন্দালুসিয় সঙ্গীতের প্রভাব ছিল অপরিসীম। হিট্টি বলেন, "স্পেন এবং দক্ষিণ পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গীতে তের শতক থেকে এবং এর পরেও যেমন বীণা সহকারে গীতিকাব্য পাঠ এবং ঐতিহাসিক রোমাঞ্চকর কাহিনী; আন্দালুসিয়ায় উদ্ভব হয়েছে যা আরবিয়, পারস্য, বাইজান্টাইন ও গ্রিক উৎস থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।"[১৩৫] মূরদের পতনের পরেও ক্যাস্টাইল ও আরাগণের রাজদরবারে আরব সঙ্গীত বিশারদগণ চিত্ত বিনোদন করতেন।

খ্রিস্টানরা মুসলমানদের সঙ্গীতে আকৃষ্ট হওয়ার সাথে সাথে আরব দেশে গানের জনপ্রিয়তা বেড়ে যায়। ক্যাস্টিল এবং আরাগনের রাজ দরবারে মুসলিম সঙ্গীতজ্ঞদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। গ্রানাডার পতনের পরও মূরদের নৃত্যগীত, স্পেন ও পর্তুগালের মানুষের মনোরঞ্জন করেছে। প্রাচীন স্পেনের

---

১৩৩ S.P. Scott, *Op. cit.*, Vol.III, P. 301.
১৩৪ P.K. Hitti, *Op. cit.*, P. 591.
১৩৫ *Ibid*, P. 599.

যেসব বাদ্যযন্ত্রের ছবি পাওয়া যায় তা নিঃসন্দেহে মুসলিমদেরই তৈরি। এমনকি সেই সময়ের অনেক সঙ্গীত শিল্পিই ছিলেন মুসলিম।

প্রাচীন স্পেনের অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, আরব সঙ্গীত শিল্পিরা দাবা খেলেছেন। ১২৪২ খ্রিস্টাব্দ-৮২ খ্রিস্টাব্দে ক্যাস্টিল এবং লিয়ঁর রাজা দশম আলফানসোর লেখা ইউরোপীয় একটি ভাষার একটি রচনাই স্পেনে পাওয়া যায়। যা ছিল দাবা সংক্রান্ত প্রথম রচনা। খ্রিস্ট ধর্ম প্রধান স্পেনে মুসলিম শিক্ষা প্রসারের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এই রাজা আলফানসো। তাঁর আমলেই বিখ্যাত কবিতা সংকলন *ক্যান্টিগাস ডি মাল্টা মারিয়া* প্রকাশিত হয়। রিবেরার মতে, এই সব কবিতায় যে সূর দেওয়া হয়েছিল তার কৃতিত্ব মুসলিম ও আন্দালুসিয়ানদের। এই কবিতা সংকলনের সঙ্গে সঙ্গে রাজা আলফানসো গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান সংক্রান্ত একটি বিশেষ অঙ্কও তৈরি করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর তৈরি করা আইনে ইসলামের প্রভাব ছিল স্পষ্ট। বর্তমানে স্পেনের আইনও তৈরি হয়েছে রাজা আলফানসোর তৈরি এই আইনের ভিত্তিতে।

মধ্যযুগে ফ্রান্সের প্রভাঁস প্রদেশে প্রেমের গানে আরব সঙ্গীতজ্ঞদের প্রভাবের কথা ইতিমধ্যেই বলা হয়েছে। শুধু গানের ভাব বা মেজাজেই নয়, যন্ত্রানুষঙ্গের ক্ষেত্রেও এই প্রভাব ছিল স্পষ্ট। প্রভাঁসের গায়কেরা তাদের গানের যে নাম দিতেন তাও আরবি ভাষা থেকে অনূদিত। প্যারিসের সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ অ্যাডিলার্ডই সম্ভবত আল-খাওয়ারিজমির গণিত সংক্রান্ত গ্রন্থের অনুবাদক।[১৩৬]

লিবার ইয়াসগোগারাম আলকোরিসমি নামে এই গ্রন্থে সঙ্গীত সংক্রান্ত একটি অধ্যায় ছিল। লাতিন বিশ্বের সঙ্গে আরবীয় সঙ্গীতকে পরিচিত করার অন্যতম প্রধান মাধ্যমই ছিল এই গ্রন্থ। অ্যাডেলার্ডের সঙ্গীতচর্চার সময় ছিল ১২ শতকের প্রথম ভাগ। সেই সময়ের মধ্যেই সঙ্গীত সংক্রান্ত বেশ কিছু প্রাচীন গ্রন্থ এবং আল কিন্দি, আল ফারাবী, ইবনে সিনা এবং ইবনে বাজ্জার মত পন্ডিতদের গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা আরবদের হাতে এসে গিয়েছিল। এইসব মৌলিক গবেষণা লাতিন ভাষায় অনুবাদ করা হত টলেডোয়। ১২ শতকের শেষ ভাগেই তা ইউরোপে প্রচারিত হয়ে যায়। এই সময়েই তাল ও লয়ের এই প্রভাবকে প্রথম জনপ্রিয় করে তোলেন কোলনের ফ্রাঙ্কো (১১৯০ খ্রিস্টাব্দ)। তাঁর তৈরি ফ্রাঙ্কোয়ান স্বরলিপির সঙ্গে এখনকার স্বরলিপির বিশেষ ফারাক নেই। কিন্তু ফ্রাঙ্কের যুগের অন্তত চার দশক আগে থেকেই ভারতীয় সঙ্গীতে এই তাল বা ইকা'র বহুল ব্যবহার ছিল।[১৩৭]

---

[১৩৬] খন্দকার মাশহুদ-উল-হাছান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪৮।
[১৩৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪৯।

মূরগণ চারু ও কারুশিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখেছেন। কারু শিল্পের উৎকর্ষতা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে তা তৎকালীন বিশ্বে তুলনাহীনই নয়; অনুকরণ যোগ্য। স্পেনের আরবগণ মুসলমানদের দ্বারা বিভিন্ন অঞ্চলে উদ্ভাসিত অপ্রধান এবং ব্যবহারিক শিল্পের চর্চা করে । একথা অনস্বীকার্য যে ধাতব শিল্পে মূরগণ যে মৌলিকত্ব এবং শৈল্পিক চাতুর্য প্রদর্শন করে তা অন্য কোন ক্ষেত্রে সম্ভব হয়নি, অবশ্য মৃৎশিল্পে ও কম উন্নত ছিল না। নকশাকৃত ধাতবপাত্র নির্মাণ এবং সোনা, রূপার ব্যবহার (Inlay) নক্‌শাগুলো রিলিফে অলঙ্করণ একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শিল্পকলায় পালিত হয়েছে। সাধারণভাবে এ শিল্পকে দানেসীন (danescene) বলা হয়ে থাকে; এর কারণ এই যে, উমাইয়া আমলে দামেস্কে ধাতব শিল্পের উদ্ভব হয়। ধাতব পাত্রের উপর সোনা রূপার জালির কারু কার্যকে সাধারণ Filigree বলা হয়।

যন্ত্র শিল্পের যে সকল শাখায় মূরেরা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে ধাতব দ্রব্য নির্মাণ তার মধ্যে প্রধান। তারা অসাধারণ কৌশল গুরুভার ধাতু খন্ড পর্যন্ত ঢালাই করতে পারতো। পিতল ঢালাই বিশেষত বড় বড় পাত্র প্রস্তুত করতে একালে ও সর্বাপেক্ষা অধিক কৌশল প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। মূরদের এ প্রক্রিয়া নিখুঁতভাবে অবগত ছিল। গলিত ধাতু ঢালাই করার সময় সমভাবে বিতরণ করা অতি কঠিন। ইউরোপের জাদুঘর সমূহে যে সকল নমুনা রক্ষিত আছে, তা দেখে মনে হয় মূরেরা এ বিঘ্ন সম্পূর্ণ অতিক্রম করতে পেরেছিল। S. P. Scott বলেন, "তাদের প্রস্তুতকৃত দ্রব্য বর্তমানের পূর্ণোন্নত পদ্ধতিতে নির্মিত দ্রব্যের মতই নিখুঁত ও সন্তোষজনক ছিল।"[১৩৮] ("The results appear to have been as complet and satisfactory as in the perfected processes of the present day".)

মূর শাসিত সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির বসবাস ছিল। শাসক শ্রেণি; অভিজাত শ্রেণি যারা প্রশাসনে লিপ্ত ছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণি; যারা সমাজের বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্য; শিল্পকর্মে নিয়োজিত ছিল এবং সর্বশেষে শ্রমিক কারিগর; শিল্পি শ্রেণি। শিল্পিগণ শুধুমাত্র রাজকীয় আদেশেই শিল্পচর্চা করতেন না, মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনে নানা ধরনের জীবিকার সাথে জড়িত ছিলেন; কামার, কুমার, ছুতার, মৃৎশিল্পী, নানা ধরনের লোকজ শিল্পকলায়ও জড়িত ছিলেন। মাদুর ও এস্পার্টো (esparto) নামে আফ্রিকার এক প্রকার শক্ত ঘাসের তৈরি ঝুড়ি নির্মাণে অলিকান্ত শ্রেণি বিশেষভাবে খ্যাতি অর্জন করেন।[১৩৯]

[১৩৮] S.P. Scott, *Op. cit.*, Vol.III, P. 305.
[১৩৯] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৩।

নৌযান, কাঠের বাক্স, অলঙ্কিত চাদর, মাটির পুতুল, হাতের নক্‌শী পাখা, বাঁশ , বেত ও শন দিয়ে তৈরি দৈনন্দিত দ্রব্যাদি তৈরিতে মূর শিল্পীগণ বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। অপ্রধান ও ক্ষণস্থায়ী উপাদানে নির্মিত হওয়ায় সাধারণ লোকের ব্যবহার্য তৈজসপত্র, আসবাবপত্র, চাটাই মাদুর যা লোকজ শিল্প ধারাকে অব্যবহৃত রাখে; বহুপূর্বেই তা বিলীন হয়ে গেছে। মুসলিম বিদ্বেষী খ্রিস্টান শাসকবর্গ স্পেন থেকে মুসলিম সভ্যতার সকল নিদর্শনই ধ্বংস করে ফেলার চেষ্টা করে। যদিও তাদের এ ঘৃণ্যচেষ্টা সফল হয়নি।[১৪০]

একথা বলা যায় যে, আরব মূরেরা সোনা, রূপা, তামার তৈজসপত্র নির্মাণ করত। বিভিন্ন ধরনের স্ফটিক (crystal) ও কৃত্রিম পাথর দিয়ে তারা দ্রব্যাদি তৈরি করতে পারত।

স্পেনের মুসলিম কারুশিল্প ধাতব পাত্র নির্মাণে অসাধারণ দক্ষতা ও নৈপুন্য দেখিয়েছেন। তাদের স্বর্ণকারেরা এক রতি সোনাকে ৩৬ বর্গফুট পাতে জালির নক্‌শায় রূপান্তরিত করতে পারতেন। মূর স্বর্ণকাররা ধনুর তাম্রচক্র এবং ইমারীর সাহায্যে হীরা কাটা কৌশল আবিষ্কার করে । তারা স্বর্ণরেখা প্রোথিত করে ধাতব পাত্রের উপর যে সমস্ত অসাধারণ নক্‌শা তৈরি করতো তাকে ডেমাসিনিং বলা হয়। সিরিয়ার দামেস্কে এ কৌশলের উদ্ভব হলেও মূর শিল্পিদের মত অনেকেই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারেনি। S.P.Scott বলেন "They produced work little in ferior to that to the most skilled diamond cutter's of the day".[১৪১]

কৌশল ব্যতিত স্বর্ণালঙ্কার সহ বিভিন্ন দ্রব্যাদির অলঙ্করণ একেবারেই অসম্ভব ছিল। কর্ডোভাসহ বিভিন্ন শহরে guild বা কারিগরদের সংঘ ছিল এবং তাদের পেশাগত দক্ষতা ছিল। বড় বড় শহরে ঢালাই এর কারখানা ছিল এবং এ সমস্ত কারখানা লোহা, তামা, ব্রোঞ্জ, পিতল ব্যবহার করে চাবি, পাত্র, তালা, ছুরি, তরবারিসহ বিভিন্ন সামরিক ও পারিবারিক ব্যবহার্য দ্রব্যাদি তৈরি করত। ঢালাই সমাপ্ত হলে উখা বা বাটালির সাহায্যে সেগুলো মসৃণ করা হত। তরবারি ও লন্ঠন নির্মাণে মূর কারিগরেরা অসামান্য চাতুর্য দেখিয়েছেন।

উন্নতমানের তরবারির মুষ্ঠি প্রায় স্থুল সোনা দিয়ে তৈরি করা হত এবং কখনো তা মিনা করা অথবা মনিমুক্তা খচিত থাকত। তারা অসিকোষ বা খাপ ধুমাল বা উজ্জ্বল লোহিত মখমলে প্রস্তুত করত। মূর শিল্পিগণ ও মিনা কারীরা তরবারির চাকচিক্য বৃদ্ধির জন্য সোনা রূপার সুতা দিয়ে সুক্ষ্ম নকশা তৈরি করত।

---

[১৪০] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৩।

[১৪১] S.P. Scott, *Op. cit.*, Vol.III, P. 310.

গ্রানাডার শেষ সুলতান বু-আবদিলের তরবারি ছিল এরূপ, যা বর্তমান মাদ্রিদে রক্ষিত আছে। টলেডো অস্ত্র নির্মাণের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠে এবং মূরদের হাতে এ শিল্প চরম উৎকর্ষতা লাভ করে।

সেভিলেও তরবারি নির্মাণের কারখানা ছিল। তরবারি এত তীক্ষ্ম ছিল যে, তা দিয়ে লোহার দন্ড ভেদ করা যেত, কিন্তু কোন দাগ পড়ত না। তরবারির মত যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণে মূর কারুশিল্পিগণ যে সহনশীলতা দেখিয়েছেন তার প্রতিফলন দেখা যাবে মসজিদে ব্যবহৃত অসংখ্য ধাতুর লণ্ঠনে। তারা স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, পিতল প্রভৃতি ধাতু দিয়ে লণ্ঠন প্রস্তুত করত। প্রত্যেকটিতে দুই বা ততোধিক বাতি জ্বলত। গ্রানাডার তৃতীয় মুহাম্মদের জন্য এরূপ একটি লণ্ঠন তৈরি করা হয়। ছুরি, কাটা তরবারির ফলা এবং দিক নির্ণয় যন্ত্র আস্তারলেব প্রভৃতি তৈরির ক্ষেত্রে টলেডো ও সেভিল বিশেষ ভাবে আকর্ষণীয় ছিল।

ধাতব শিল্পের চরম বিকাশ লক্ষ করা যায় আরব শাসিত স্পেনে। লোহা ও ইস্পাতের বুটিদার বন্দুক, শঙ্খ ও মনি মুক্তা শোভিত সুগন্ধি কাঠের খোদাইকৃত আসবাবপত্র প্রভৃতি কারুশিল্পে প্রতিভার ছাপ রেখেছে। তারা সিন্ধুকের জটিল তালা এমনভাবে নির্মাণের কৌশল জানত যে তা কারও পক্ষে খোলা সম্ভব হত না। কর্ডোভা ও অন্যান্য শহরে নির্মিত প্রাসাদ সমূহের কাষ্ঠ নির্মিত দরজায় পিতলের নকশাকৃত আচ্ছাদন ছিল। এ সমস্ত দরজা এখনও স্পেনের অনেক গীর্জায় শোভা পাচ্ছে। তাম্র নির্মিত বাসনপত্রের উৎকর্ষ ও ইস্পাত ফলকের অতুলনীয় কাঠিন্যের জন্য আন্দালুসিয়া বিখ্যাত ছিল। এ সমস্ত সুন্দর ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য গ্রানাডা, সেভিল, টলেডো ও আলমেরিয়ার কারিগরদের কৌশলের সাক্ষ্য বহন করছে।

Philip Bamborough বলেন, "সর্বশেষ হলেও ইসলামি মৃৎশিল্পে মুসলিম স্পেন মোটেই নগণ্য ছিলনা।"[১৪২] ("Last but not the least amongst Islamic pottery are the superb ceramics of Islamic spain.") আট শতকে স্পেনে ইসলাম বিস্তার লাভ করলেও আইবেরীয় উপদ্বীপে মৃৎশিল্পের বিকাশ ঘটেছিল অনেক পরে। সম্ভবত চৌদ্দ শতকে এবং সে জন্য উত্তর আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, মধ্য এশিয়ায় ও আনাতোলিয়ায় মৃৎশিল্পের যে অগ্রগতি হয় তা স্পেনে প্রথম যুগে দেখা যাবেনা। যা হোক, ইউরোপ ভূ-খন্ডে মূরগণ সর্বপ্রথম মিনাকরা মৃৎপাত্রের ব্যবহার প্রবর্তন করে এবং সেক্ষেত্রে মালাগা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। চৌদ্দ শতকে মালাগায় মৃৎশিল্পের সর্ববৃহৎ কর্মশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া মূর্সিয়া, ভ্যালেনসিয়া, টলেডোতেও মৃৎশিল্পের কারখানা ছিল। মৃৎপাত্রে উজ্জ্বল রং (lustre) সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয় মিসরে, ব্যাপকতা লাভ করে সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ায় এবং স্পেনে পরবর্তী পর্যায়ে এক নতুন উজ্জ্বলতা লাভ করে।

[১৪২] Philip Bamborough, *Treasures of Islam* (London: Bland ford, 1976). P. 87.

মিনা করা পাত্র মূর মৃৎশিল্পিদের নিকট খুবই প্রিয় ছিল এবং তারা বিভিন্ন নক্শা ও রঙের সমন্বয়ে এ সমস্ত মৃৎপাত্রগুলোকে আকর্ষণীয় করে তুলত। নক্শা ও উপাদান, সম্পাদন প্রণালির দিক দিয়ে কুম্ভকার্যে, মৃৎশিল্পে (ceramic art) ইউরোপের অপর কোন দেশই মুসলিম স্পেনের ন্যায় উন্নতি লাভ করতে পারেন নি।

মেজর্কা দ্বীপের শহরগুলো মৃন্ময় পাত্রের জন্য বিখ্যাত ছিল। তথাকার কুম্ভকারেরা স্বর্ণ বা তাম্রের আভা বিশিষ্ট ইন্দ্র-চাপবৎ নানা বর্ণোজ্জ্বল এক প্রকার পাত্র প্রস্তুত করার কৌশল জানত। তা থেকেই ইতালির কুম্ভকার বিদ্যা (মৃৎশিল্প) মেজলিকা নাম প্রাপ্ত হয়। S. Lanepoole বলেন, "It was from the island of majorca, where the potters had attained to the art of producing a ware shining with iridlscent gold or copper lustre, that the Italian, pottery obtained its name of majolica."[১৪৩]

হিট্টি বলেন, "ধাতব শিল্পে এনামেলের বিশিষ্ট প্রয়োগ না থাকলেও মৃৎপাত্রে মিনার পাত্র খুবই আকর্ষণীয় ছিল।"[১৪৪] ভ্যালেনসিয়ায় যে মৃৎশিল্পের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় তারই প্রভাবে ফ্রান্সের পয়টিয়ার্সে অথবা তুরসে মৃৎশিল্পের কারখানা গড়ে উঠে। এভাবে সমগ্র ইউরোপে মৃৎশিল্পের প্রসারতা ঘটে। মূর মৃৎশিল্পিগণ মৃৎপাত্রে মিনার উজ্জ্বল রং (lustre) দিয়ে এক অপরূপ শিল্পকর্ম সৃষ্টি করতে পারতেন। তারা মৃৎপাত্রে চীনা রীতিতে বিভিন্ন ধাতু এমনভাবে সন্নিবেশিত করতে পারত যে এ দ্বারা স্বচ্ছতার কোন হানি হতোনা। মূল ধাতুর রং অপরিবর্তিত থাকত অথবা বাইরে ধাতুর উজ্জ্বলতা প্রকাশ পেত। এসব মৃৎপাত্রে সোনার প্রলেপ দেয়া হত। তামার সাথে রূপা মিশ্রিত করে দ্বীপ্তির আধিক্য হ্রাস পেলে পত্রটি খুবই চমৎকার দেখাত।

D.T. Rice বলেন, "সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় মৃৎপাত্র চৌদ্দ এবং পনের শতকে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং সেগুলো হিস্পানো মোরেস্ক উজ্জ্বল রঙ সম্বলিত মৃৎপাত্র নামে পরিচিত।"[১৪৫] ("The best work dates from the fourteenth and fifteenth centuries and is represented by the famous Hispano-Mauresque lustre wares.") তের শতকে মুর্সিয়া এবং আল-মেরিয়াতে এ কৌশল প্রথম উদ্ভাবিত হয়। কিন্তু তা ছিল এক রঙের (monochorme); পরবর্তী পর্যায়ে বহুরঙের রূপ নেয় দু'শতক পরে। রঞ্জিত মৃৎশিল্প একটি সৌখিন শিল্প (Luxury art) যা একমাত্র ধনাঢ্য পৃষ্ঠপোষক এবং

---

[১৪৩] Stanely Lanepoole, *Op. cit.*, P. 147.
[১৪৪] P.K. Hitti, *Op. cit.*, P. 591.
[১৪৫] D.T. Rice, *Islamic Art* (New York: Thames and Hudson, 1965), P. 153.

সুলতান ও তার সভাসদেরা তৈরি করাতেন। তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় যে বৃহদাকার মৃৎপাত্র বা vessel তৈরি হয় তা রসদ সংরক্ষণের পাত্র (storage jar) হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আল হামরায় এ ধরনের অসংখ্য বৃহদাকার মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে।

স্পেনীয় আরবদের কারুকার্য খচিত পাত্রগুলোর কেন্দ্রের উপরিভাগ অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর নিম্নভাগ তলার দিকে ক্রমশ সূক্ষ্ম, ধাতব ডান্ডা বা কাঠের ফাঁপা পাদভূমিতে রাখবার উপযোগী করে নির্মিত। তাদের বক্র রেখাগুলো অত্যন্ত মনোরম, প্রসাধন অত্যধিক যত্ন ও পরিশ্রম পূর্বক সম্পাদিত। হাতলের নক্‌শা মূল পাত্র থেকে প্রায়ই পৃথক হতো; অথচ পরস্পরের মধ্যে এরূপ সম্পূর্ণ মিল থাকত যে, অসামঞ্জস্য ধরতে হলে নিবিড় ভাবে পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন হত। মূর শিল্পিগণ নীল, কাল, সাদা, পিঙ্গল ও ধূসর রঙের ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলেন।

পাশ্চাত্য মৃৎশিল্পে মূর মৃৎ শিল্পের প্রভাব অনস্বীকার্য। ভ্যালেনসিয়া থেকে পয়টিয়ার্স এবং সেখান থেকে পঞ্চদশ শতকে সুদূর হল্যান্ডে মূর মৃৎপাত্র অনুকরণ করে প্রস্তুত করা হত। মুসলিম স্পেন থেকে ইতালিতে মৃৎপাত্র প্রসারতা লাভ করে। অবশ্য এ সমস্ত মৃৎপাত্রে ইসলামি ও খ্রিস্টান কুলজী সম্বন্ধীয় উপাদান (heraldic) সংমিশ্রিত হয়েছে।

আর্নেস্ট কুহনেল বলেন, "তবে স্পেনের চীনামাটির বাসন শিল্প প্রাচ্যের বিলাস বহুল বাসন পত্রের সাথে তুলনায় কোন অংশেই নিকৃষ্ট ছিলনা। সেভিলের একটি বৈশিষ্ট্যই ছিল বড় আকারের পানির জালা এবং খাদ্যের বাসনপত্র উৎপাদন। মসৃণ ও উজ্জ্বল বাসনপত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে সারা বিশ্বে মালাগার খ্যাতি ছিল। চৌদ্দ শতকে যে সময় রায়, কাশান, ও কায়রোর শিল্প অবনতির পথে চলেছে, মালাগা ইসলামের মৃৎশিল্প ভান্ডারে একটি নতুন ও স্বতন্ত্র ধরনের অবদান সংযোজন করে। এ দশা কখনও হালকা এবং কখনও ঘন সন্নিবিষ্ট হলেও মালাগার শিল্পিদের অলঙ্করণ পাত্রের সারা গা জুড়ে বিরাজ করত। ইরানের মত এখানেও গ্লেজের উপর নীল রং এবং ধাতব রং ব্যবহৃত হতো। আল হামরার অলংকার শিল্পে অনুকরণের ঝোঁকটা থাকত আরবি নক্‌শার দিকে। তবে এর সাথে জীব জন্তুর মোটিফ ও অনেকসময় ব্যবহার করা হতো।"[১৪৬] পুরাতন কায়রোর ধ্বংসস্তুপে প্রাপ্ত তৈজসপত্র দেখে

---

[১৪৬] আর্নেস্ট কুহনেল, *ইসলামী শিল্পকলা ও স্থাপত্য*, মূলঃ *Islamic Art and Architecture*, By E. Kuhnel (New York: Cornell University Press, 1967), বঙ্গানুবাদঃ বুলবন উসমান, চট্টগ্রাম, ১৯৭৮, পৃ. ১৩০-১৩১।

ধারণা করা হয় যে, এসব দ্রব্য স্পেন থেকে আমদানি করা হত। এমনকি "আভে মারিয়া গ্রাসিয়া প্লেনা" লিখিত বাসনপত্র আমাদানিতে ও কোন আপত্তি উঠতো না।[১৪৭]

মালাগা, ভ্যালেনসিয়া ছাড়াও বাসন শিল্পের অপর একটি কেন্দ্র ছিল প্যাটর্নো। এখানে চৌদ্দ এবং পনেরো শতকে সাদাসিধা ধরনের বাসনপত্র তৈরি হত। এসমস্ত তৈজস পত্রে গথিক মোটিফের সঙ্গে আকর্ষণীয় পশু মূর্তি অঙ্কিত হত। সাদা পটভূমিতে ম্যাংগানিজ, বাদাম, সবুজ রং এর ব্যবহার খুবই জনপ্রিয় ছিল।

একথা বলা যায় যে, মূরদের উদ্ভাবিত মৃৎশিল্প ইতালি তথা সমগ্র ইউরোপে বিশেষ প্রভাব ফেলে। তের শতকের মধ্যভাগে মালাগায় স্পেনীশ মৃৎশিল্পের স্বর্ণ যুগের শুরু হয় এবং এ ধরনের সোনালি তৈজসপত্র (golden ware) গ্রানাডায় সমাদৃত হয়। সিসিলি, মিসর এমনকি ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে রপ্তানি করা হত।

বয়ন শিল্পে মূরগণ তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমানিত করে। S.P.Scott বলেন, "লিনেন এবং কার্পাস জাতীয় পোশাক সম্বন্ধে তাদের যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। আরবদের আবিষ্কৃত কার্পাস বস্ত্র তখনও ইউরোপে প্রবর্তিত হয়নি।"[১৪৮] ("Linen and Cotton garments were unknown. The Arabs by whom they were invented had not yet introduced them to the knowledge of Europe.")

ঐতিহাসিক Draper একই কথার পুনরাবৃত্তি করে বলেন, "আরবগণই প্রথম ইউরোপে কার্পাস বস্ত্র তৈরির পদ্ধতি প্রবর্তন করে। প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতিতে হাতে চিত্রিত করে যে ছিট কাপড় তৈরি করা হতো আরবগণ কাঠের ব্লকের সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের নক্শার ছাপ দিয়ে ক্যালিকো, ছাপার পদ্ধতির উন্নতি সাধন করে।"[১৪৯] ("The cotton manufacture was first introduced into Europe by the Arabs. The Arabs were also the authors of the printing, of calicos by wooden block, a great improvement on the old indian operation of painting by hand.")

মধ্যযুগে আরবগণ বয়ন শিল্পের যে উৎকর্ষ সাধিত করে তাতে মূরদের অবদান ছিল। হিট্টি বলেন, "রেশম ও কার্পাস বস্ত্র উৎপাদনে মূরেরা অসামান্য অবদান রাখলেও কার্পেট তৈরির ক্ষেত্রে প্রাচ্যের বাজারে পারস্য কার্পেটের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারেনি।"[১৫০] Philip Bambourgh যথার্থই

---

[১৪৭] আর্নেস্ট কুহনেল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩১।
[১৪৮] S.P. Scott, *Op. cit.*, Vol.III, P. 507.
[১৪৯] J.W. Draper, *Op. cit.*, Vol.II, P. 386.
[১৫০] P.K. Hitti, *Op. cit.*, P. 572.

বলেন যে, “ধর্ম প্রবর্তনের পাশাপাশি স্পেনে বস্ত্রশিল্পের প্রতি আরবদের যে চিরাচরিত মোহ ছিল তাও প্রবর্তিত হয়।”[১৫১] (“The Islamic taste for rich fabrics was introduced into Spain simultaneously with the religion.”)। কার্পাস ও রেশম বস্ত্র উৎপাদনে মূর শিল্পিগণ অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। নয় ও দশ শতকে আন্দালুসিয়ায় কমপক্ষে আট হাজার তাঁত উৎপাদনে ব্যবহৃত হত। এ সমস্ত তাঁতের কারখানা সেভিল, মালাগা, আলমেরিয়া, গ্রানাডা, অলিকান্ত, মুর্সিয়া এবং বালজায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিলাসিতার প্রতীক হিসেবে রেশম বস্ত্র ব্যবহার নিষেধ করেন। কিন্তু মুসলমান তাঁতী ও রেশমবস্ত্র প্রস্তুতকারকগণ রেশমের সাথে কয়েক গাছা পশম বা কার্পাস সুতা মিশিয়ে দিত; যাতে ধর্মের অনুশাসন বিঘ্নিত না হয়। রেশমের বস্ত্র তৈরির পাশাপাশি সূতীর কাপড়ও উৎপাদন অব্যাহত ছিল। মূরেরাই সর্ব প্রথম বিভিন্ন প্রকারের নক্শায় ও কাউন্টের সূতায় বিচিত্র ধরনের পোশাক তৈরি করতে জানত। লুসিটানিয়ার কোমল মেশিনে পশম এবং আন্দালুসিয়ার তুলা তখন দীর্ঘকাল পর্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। এ সমস্ত কাঁচামাল থেকে প্রস্তুত সূতা ও বস্ত্র অত্যন্ত সূক্ষ্ম, স্থায়ী, শক্ত ও মোলায়েম হত। স্পেনে প্রস্তুত এসব বস্ত্র ভূমধ্যসাগরের তীবরর্তী বন্দরগুলোতে বিক্রি হত।

আর্নেস্ট কুহনেল বলেন, “সারা মধ্যযুগে আন্দালুসিয়ার কারখানায় রেশমী বস্ত্র উৎপাদন প্রাচ্যের সাথে তাল মিলিয়ে অগ্রসর হয়। বাগদাদে পালের্মো এবং কায়রোর মত এখানকার রেশমী বস্ত্রেও পৌনোপুনিক নকশা থাকত এবং লিপিমালার সাহায্যে গঠিত বৃত্তের মধ্যে মুখোমুখি দন্ডায়মান বস্তুর ছবি থাকত।”[১৫২]

Musee de clunny-তে সংরক্ষিত বারো শতকের এরূপ একটি নক্শাকৃত ও বোনা রেশমী বস্ত্রে যে প্রতিকৃতি দেখা যায় তা হচ্ছে উপরিভাগে লাল ও সোনালি রঙের একজোড়া মুখোমুখি মূয়র এবং নিম্নাংশ হলুদ ও পিঙ্গল রঙের অপর এক জোড়া ময়ুর। রেশম শিল্পের ব্যপকতা এরূপ ছিল যে, একমাত্র সেভিলের রেশম শিল্পের কারখানায় এক লক্ষ ষাট হাজার কারিগর নিয়োজিত ছিল। এ কথা সত্য যে, মূরদের পূর্বেই সিসিলিতে রেশম বস্ত্র প্রস্তুত হত। রেশমী সূতা লাভের জন্য গুটি পোকার চাষ করা হতো এবং গুটি পোকার বংশ বৃদ্ধির জন্য তুঁতের গাছের চাষ করা হত।

---

[১৫১] P. Bamborough, *Op. cit.*, P. 123.
[১৫২] আর্নেস্ট কুহনেল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩২।

সিসিলি ও আন্দালুসিয়ায় উৎপাদিত রেশমী বস্ত্রের মান এতই উঁচু ও কারিগরি নৈপুন্য এতই সূক্ষ্ম ছিল যে, এ দু'টোর মধ্যে পার্থক্য করা যেতনা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ভিসির জাদুঘরে সংরক্ষিত একটি স্টাইলাইজড নক্‌শা, যেমন- জ্যামিতিক এবং লতাপাতার অলঙ্করণে জীবজন্তুর প্রতিকৃতি বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। D.T.Rice বলেন, "এটি আন্দালুসিয়া না সিসিলিতে বোনা হয়েছিল, তা সঠিকভাবে বোঝা যাবে না।"[১৫৩]

S.P.Scott বলেন, "সৌন্দর্য ও কমনীয়তায় অপর কোন জাতির বস্ত্রই সিসিলির মূরদের প্রস্তুতকৃত দ্রব্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলনা।"[১৫৪] ("No people surpassed the sicilion in the delicacacy and beauty of their fabrices.") পালের্মো ছিল সিসিলির রাজধানী এবং খ্রিস্টান রাজা দ্বিতীয় রজারের (১১৩০ খ্রিস্টাব্দ-৫৪ খ্রিস্টাব্দ) রাজত্বকালে রেশমী বস্ত্র উৎপাদন এক আকর্ষণীয় শিল্প সৃষ্টির মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

রেশমী বস্ত্র উৎপাদন আন্দালুসিয়ায় যে প্রচারের ব্যাপকতার সৃষ্টি হয় তা বিভিন্ন শহরে প্রতিষ্ঠিত কারখানা এবং কর্মরত কারিগরদের সংখ্যা থেকেই প্রতীয়মান হয়। সেভিলের কারখানায় একলক্ষ ষাট হাজার শ্রমিক কাজ করত। এদের মধ্যে একদল তেরাজ নামের রাজপোশাক (কিংখাব) তৈরি করত। আলমেরিয়ার আটশত রেশমের কারখানায় আট হাজারের অধিক তাঁত ছিল। আলমেরিয়ায় উৎপাদিত বেশির ভাগ রেশমি বস্ত্র ইউরোপে রপ্তানি হত।[১৫৫]

আলমেরিয়ার পতনের পর তার স্থান দখল করে মালাগা। এখানে প্রকান্ড প্রকান্ড অট্টালিকায় রেশমের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মালাগার দক্ষ ও নিপুন বস্ত্র শিল্পিদের উৎপাদিত দ্রব্যাদি সাথে সাথেই বিক্রি হয়ে যেত। আধুনিক শিল্প কৌশল কখন ও গ্রানাডার রেশমের ন্যায় সুন্দর ও উৎকৃষ্ট সুতা প্রস্তুত করতে পারেনি। কেবল রেশমি কাপড় বিক্রির জন্যই আল-কায়সারিয়া বা রেশম বাজারে দু'শ দোকান ছিল। এ নগরের বুটিকদের পর্দা ও কিংখাব তন্তুবারের কৌশলের আশ্চর্যজনক নমুনা। পরবর্তীকালে ফ্রান্স ও ইতালির শিল্পিরা এদের নক্‌শা আদর্শরূপে গ্রহণ করেন।[১৫৬]

---

[১৫৩] D.T. Rice, *Op. cit.*, P. 154-157.

[১৫৪] S.P. Scott, *Op. cit.*, P. 562.

[১৫৫] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৭।

[১৫৬] *তদেব*।

আন্দালুসিয়ায় প্রস্তুত কার্পাস ও রেশমি বস্ত্র গুণ ও মানে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ছিল। কিন্তু হালকা হলেও এ সমস্ত বস্ত্র ছিল খুবই মজবুত ও টেকসই। এ সমস্ত উৎপাদনে কারিগর অপরিসীম শৈল্পিক অভিব্যক্তি, দক্ষতা ও কৌশল প্রদর্শন করেন। লাস নেভাসের যুদ্ধে (১২১২ খ্রিস্টাব্দ) খ্রিস্টানগণ মুসলমানদের যে পতাকা হস্তগত করে তা বার্গোসের নিকটস্থ লাস হুয়েলগাসের মঠে সংরক্ষিত আছে। এ পতাকাটি তন্তুবারের কৌশলের এক অপরূপ নিদর্শন। রক্তবর্ণ রেশমি বস্ত্রের উপর তারা সাদা, নীল, পীত ও সবুজ বর্ণের লেখা, বড়পদক ও সম্মিলিত বক্র রেখা বুনা হয়েছে। যার ফলে নকশার চমৎকারিত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

মূরদের তৈরি রেশমি বস্ত্র ইউরোপীয় রাজন্যবর্গরা ব্যবহার করত। আল্লাহর নাম বুনা হলেও কুফী লিপি শৈলীতে তারা এসব বস্ত্র ব্যবহার করতে দ্বিধা করতেন না। এর মনোরম নকশাকার গোলক ধাঁধায় আল্লাহর নাম স্বর্ণরঞ্জিত হয়ে শত সহস্রবার দেখা দেয়। রাজন্য বর্গের এসব পোশাক পরিচ্ছদে মূল্যবান পুষ্পময় বুটি ও উজ্জ্বল কোরান বাণীর সাথে পূর্ণ কৌশলে স্বাভাবিক রঙে মালিকের ছবিও চিত্রিত থাকত। মাদ্রিদের ঐতিহাসিক সমাজের (Historical Society) জাদুঘরে রক্ষিত খলিফা দ্বিতীয় হাকামের তেরাজ বা অঙ্গ রাখাই এখন জগতে মূর বয়ন শিল্পের এই বিখ্যাত শাখার একমাত্র নিদর্শন। একথা স্বীকার করে S.P.Scott বলেন, "আধুনিক বিজ্ঞানের সর্বপ্রকার উন্নতি সত্ত্বেও বাঁধন (বুনোট) এবং মসৃণতায় উপদ্বীপের মূরদের বস্ত্রের সমতুল্য হতে পারেনি।"[১৫৭] ("Modern science with all its improvements has never been able to equal in strength and delicacy of texture the products of the Moorish looms of the peninsula.")

স্কট, হিট্টি, রাইস এবং কুহনেল ইউরোপীয় বস্ত্র শিল্পে মূর বয়ন শিল্পের প্রভাব স্বীকার করেছেন। হিট্টি বলেন, "বস্তুত বারো শতকের গোড়া থেকে ইউরোপীয় তাঁতীদের ইসলামী মোটিফ অনুকরণ প্রায় সার্বজনীন রূপ গ্রহণ করে এবং এ সময় থেকে বহু ইউরোপীয় চিত্রকর্ম এবং বস্ত্র আলঙ্কারিক প্রয়োজনে আরবি (কুফী) লিপির অহেতুক অনুকরণ দেখা যায়।"[১৫৮] একথা স্মরণ করতে হবে যে, ইসলামী শাসনের অবসান হলেও আন্দালুসিয়া ও সিসিলিতে মুসলিম শিল্প, স্থপতি, কারিগর, খ্রিস্টান রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় তাদের সৃজনশীল শিল্পকর্ম অব্যাহত রাখেন। ফলে খ্রিস্টান ও ইসলামি উপাদানের সংমিশ্রণে মুদিজার (Mudejar) নামে এক নতুন শিল্পধারা প্রবর্তিত হয়। সিসিলিয় শিল্প কলার নরম্যানদের রাজত্বকালে স্থাপত্য, চারু ও কারুশিল্প মুদেজার ধারা লক্ষ করা যাবে। মুদেজার

---

[১৫৭] S.P. Scott, *Op. cit.*, P. 589.

[১৫৮] P.K. Hitti, *Op. cit.*, P.311.

শিল্পি ও কারিগরেরা মৃৎপাত্র, কাষ্ঠ খোদাই ও বয়নশিল্পে নিয়োজিত ছিল। এখনও সিসিলির ছুতার মিস্ত্রিগণ তাদের ব্যবসায় যে সমস্ত শব্দ ব্যবহার করে তা আরবি থেকে গৃহীত হয়েছে।

ঐতিহাসিক আর্নেস্ট কুহনেল বলেন, “সম্ভবত ১৫শ শতকে ভ্যালেনসিয়া এবং সেভিলের বস্ত্র জগতে মুদেজার রীতি প্রবর্তিত হয়। এখানে তৈরি বস্ত্রে অবিচ্ছিন্ন রেখার পাতা এবং পদ্মফুলের ছবি এবং মাঝে মাঝে সিংহ ইত্যাদি মোটিফ থাকত। পুরাতন সূচিকর্মের নমুনাও সংরক্ষিত হয়েছে। এর মধ্যে টলেডোর ক্যাথিড্রালে আছে চতুর্দশ শতকের একটি মেরিনীয় যুদ্ধের পতাকা। বার্গোসের নিকটবর্তী লাস হুয়েল গাস এ আছে একটি বহু রংয়ের জটিল সূচিকর্ম বিশিষ্ট তাবুর পর্দা। লাস নাভাস এর যুদ্ধে (১২১২ খ্রিস্টাব্দ) মোহেদদের থেকে লুণ্ঠিত দ্রব্য হিসেবে এগুলো সংগৃহীত হয় যা পূর্বে বলা হয়েছে।”[১৫৯]

ডি.টি.রাইস সিসিলির রাজা দ্বিতীয় রজারের জন্য প্রস্তুত একটি অভিষেক আবরণ (Coronation mantle) এর উল্লেখ করেন। মূলত এটি একটি এমব্রয়ডারী কিন্তু দেখে মনে হবে যে বোনা রেশমী কাপড়। এই শিল্প কর্মের প্রধান আকর্ষণ দুটি জন্তু সিংহ এবং উট । মধ্য ভাগে একটি লতাপাতা বিশিষ্ট গাছ এবং এর দু'ধারের ‘মিরার ইমোজা’র অর্থ্যাৎ বিপরীতমূখী প্রতিচ্ছবির মত একটি নিরীহ উটকে আক্রমণরত সিংহের দৃশ্য বোনা হয়েছে। D.T.Rice বলেন, “পালের্মোতে গ্রিক শিল্পির পাশাপাশি মূর কারিগরেরা কর্মরত ছিল। এতদসত্ত্বেও এ শিল্প কর্মকে রাইস “বাইজান্টাইন না বলে ইসলামি শিল্পকলা” (More Islamic than Byzantine) বলেছেন।”[১৬০]

অপরাপর কারুশিল্পের মত স্পেনের মূর শিল্পিগণ কাঠের খোদাই কাজে অপরিসীম দক্ষতা দেখিয়েছেন। লৌহ ও ইস্পাতের বুটিদার বন্দুক, শঙ্খ ও মনিমুক্তা শোভিত সুগন্ধি কাষ্ঠ খচিত আসবাবপত্র প্রভৃতি মূর ও অসংখ্য শ্রম শিল্পে মূরেরা তাদের কৌশল ও প্রতিভার সাক্ষ্য রেখে গেছে। মুসলিম বিদ্বেষী খ্রিস্টান শাসকবর্গ ও সাধুগণ মুসলমানদের তৈরি মনি মুক্তা খচিত কাঠের কফিনে তাদের দেহাবশেষ রাখতে কুণ্ঠিত হতো না। জেরানার গির্জার উঁচু বেদীতে এরূপ একটি কাসকেট রক্ষিত আছে। হিট্টি বলেন, “দ্বিতীয় হাকামের সময়ের (৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ-১০০৯ খ্রিস্টাব্দ) রূপার প্লেটিং করা (repouse) কাঠের কাসকেটটিতে খলিফার নাম উল্লেখ আছে। খোদিত লিপি থেকে জানা যায়

[১৫৯] আর্নেস্ট কুহনেল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩২।
[১৬০] D.T. Rice, *Op. cit.*, P. 106.

যে, এই অতুলনীয় কারুশিল্পের নির্দশনটি তৈরি করেন বদর এবং তারিক। এই কাসকেটটি উত্তরাধিকারী হিশামের জন্য একজন সভাসদ তৈরি করান।"[১৬১]

অন্যান্য ক্ষেত্রের মত মূর শিল্পিদের অসামান্য মৌলিকত্ব ও শৈল্পিক দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যাবে হাতির দাঁতের খোদাই শিল্পে। আন্দালুসিয়া ও সিসিলি থেকে প্রাপ্ত কতিপয় শিল্প সামগ্রীতে তাদের শৈল্পিক নৈপুন্য ভাস্বর হয়ে রয়েছে। বারো শতকে কর্ডোভায় হাতির দাঁতের ওপর বিভিন্ন ধরনের নক্শা বা শিল্প সামগ্রী তৈরির একটি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। হিট্টি বলেন, "এ সমস্ত দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে বিশেষভাবে আকর্ষণীয় কাসকেট সমূহ এবং বিভিন্ন ধরনের বস্ত্র। এ সমস্ত শিল্প সম্ভার সম্পূর্ণ রূপে খোদিত ছিল অথবা কোন কোন অংশে নকশা করা হত। খোদাই এর অংশে অন্য কোন মূল্যবান পাথর বা দ্রব্য বসান (inlay) হতো এবং রঙের প্রলেপ দেয়া হতো।"[১৬২]

কুফী রীতিতে একটি লিপি খোদিত হয়। এ সমস্ত কাসকেটে মিষ্টান্ন রাখা হতো। কর্ডোভায় গোলাকার কাসকেটটি ঢাকনায় কুফী রীতিতে শিল্পলিপি খোদিত রয়েছে। এ অপূর্ব হাতির দাঁতের গোলাকার কাসকেটটি খলিফা দ্বিতীয় হাকাম তাঁর স্ত্রীকে উপহার প্রদানের জন্য তৈরি করান। হাতি ছাড়া ময়ূর ও অন্যান্য পাখির প্রতিকৃতি রয়েছে। ফিলিপ বামবরো একটি কাসকেটের ছবি প্রকাশ করেছেন যা নিশ্চিতভাবে স্পেনীয়। তিনি বর্ণনা দেন যে, "এটি প্রাণী ও জীব জন্তুর প্রতিকৃতি সম্বলিত স্পেনীয় কাসকেটের অপূর্ব নির্দশন।"[১৬৩] ("Superb example of a sapnish ivory casket with figurative and animal decoration.")

D.T.Rice বলেন, "সিসিলিতে হাতির দাঁতের খোদাইকৃত শিল্প সামগ্রী প্রস্তুতের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল। এখানকার বেশ কয়েকটি কাসকেট আবিষ্কৃত হয়েছে যা স্পেনীয় দ্রব্যসামগ্রী সাপেক্ষে মোটেই নিম্ন মানের বলে মনে হয়না। এগুলোতে নাসখ অথবা কুফী রীতিতে খোদাই লিপি রয়েছে এবং এতে নির্মাণ তারিখ রয়েছে। সিসিলির এবং আন্দালুসিয় আইভরির দ্রব্যাদি নির্ণয় করার একমাত্র উপায় হচ্ছে যে, High relief বা খুব উচুঁ করে খোদাইকৃত দ্রব্যাদি স্পেনীয় এবং Low relief এবং স্বল্প অগভীরভাবে খোদিত সাধুর মোটিফ এবং বাইজান্টাইন রীতিতে খোদিত একটি কাসকেট, যা দ্বাদশ শতকে প্রস্তুত করা হয়। এ প্রতিকৃতিগুলো পালের্মোর পালাটিনা চ্যাপেলের মূর্তিগুলোর সাথে সামঞ্জস্য

---

[১৬১] P.K. Hitti, *Op. cit.*, P. 591.
[১৬২] *Ibid*, P. 593.
[১৬৩] P. Bamborough, *Op. cit.*, P. 153.

রয়েছে। দ্বিতীয় কাসকেটটি তের শতকে তৈরি করা হয় এবং এর লতাপাতা, জ্যামিতিক ও জীবজন্তুর প্রতিকৃতি ধাতব পাত্রের নক্শার সাথে মিল রয়েছে। তৃতীয় কাসকেট টি এগারো শতকে তৈরি করা হয় এবং খুব গভীর ভাবে খোদিত পশুপাখির প্রতিকৃতিগুলো দেখে ধারণা করা হয় যে, এটি সিসিলিতে নয় স্পেনের মূল ভূ-খন্ডে প্রস্তুত করা হয়।"[১৬৪]

মূরদের নির্মিত অপর একটি কাসকেট লন্ডনের ভিক্টোরিয়া এবং এ্যালবার্ট জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। দশম শতকের এই শিল্পকর্মটির প্রধান আকর্ষণ একটি বৃক্ষের দু'পাশে; দুটি গ্রিফিনের প্রতিকৃতি। ঐতিহাসিক R.A. Jairaz Fhoy বলেন, "মুসলিম গ্রিফিনের ক্ষেত্রে এ দু'টি পৌরাণিক পশু চার পায়ের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে এবং গাছের সম্মুখে তারা তাদের কোন পা উপরে উঠাচ্ছে না।"[১৬৫] ("In the case of Muslim griffins the fabulaus beasts are standing foursquare and are not raising one paws in adoration of the tree.")

স্পেনীয় আরবদের বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকান্ডের অন্যতম অপরিহার্য অঙ্গ কাগজ উৎপাদন। কাগজ উৎপাদনে স্পেনীয় মুসলমানগণ অপরিসীম কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। তারাই প্রথম ইউরোপীয় অর্থ্যাৎ স্পেনে কাগজ উৎপাদন শুরু করে। মুসলিম স্পেনে কর্ডোভার কাগজ প্রস্তুত কারখানা ছিল। এটিকে বিশেষজ্ঞগণ ইউরোপের প্রথম কাগজের কারখানা হিসেবে অভিহিত করেছেন। কেননা গ্রন্থ রচনার একমাত্র মাধ্যম কাগজ। স্থানীয়ভাবে কাগজ উৎপাদিত না হলে, যা ইউরোপে ইসলামের হিতকর অবদানের অন্যতম আন্দালুসিয়ার এরূপ পর্যাপ্ত সংখ্যক গ্রন্থের সমাবেশ সম্ভবপর হতো না।

একথা স্বীকার করতে হবে যে, পনের শতকে জার্মানিতে মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কার ও ব্যবহার কাগজ ব্যতীত সম্পূর্ণ অচল হয়ে যেত। কাগজে মুদ্রিত গ্রন্থাদিই পান্ডুলিপির তুলনায় শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারে অধিকতর সহায়ক ছিল এবং পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করেছেন যে মূরগন কাগজের প্রচলন না করলে ইউরোপে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিস্তার ঘটত না, এমনকি রেনেসাঁর উদ্ভব হতো কিনা সন্দেহ।

প্রাচ্যদেশ থেকে চীনা কাগজ উৎপাদনের প্রক্রিয়া প্রথমে বাগদাদে অনুপ্রবেশ করে এবং পরবর্তী পর্যায়ে সেখান থেকে বারো শতকের মধ্যভাগে স্পেনে প্রচলিত হয়। সাতিভা বা জাতিভা (Jativa) কাগজ উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র ছিল। উল্লেখ্য যে, ইংরেজি শব্দ রীম (Ream) মূলত আরবি শব্দ

---

[১৬৪] D.T. Rice, *Op. cit.*, P. 106.

[১৬৫] R.A. Jairaz Fhoy, *Oriental influences in western Art* (New York: Asia Publising House, 1965), P. 259.

'রিজম' (Rizmah) বা বান্ডিল থেকে উদ্ভব হয়েছে। সিসিলির মাধ্যমে তের শতকে ইতালিতে (১২৬৮ খ্রিস্টাব্দ-৭০ খ্রিস্টাব্দ) কাগজ উৎপাদনের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। তৃতীয় আব্দুর রহমানের সচিব এক টুকরো কাগজে সরাসরি ফরমান লিপিবদ্ধ করে তা ব্লক প্রিন্টিং এর মাধ্যমে অনেক কপি তৈরি করতেন এবং সেগুলো লোক মারফৎ বিভিন্ন প্রদেশে পাঠাতেন। স্পেন থেকে কাগজ উৎপাদনের প্রক্রিয়া ফ্রান্সে প্রসারিত হয়।

S.P.Scott বলেন, "খ্রিস্টান ইউরোপের লেখক গোষ্ঠী যখন ক্লাসিক্যাল গ্রন্থাকারদের লেখা উঠিয়ে ফেলে নিজেদের ধর্ম কাহিনী লিপিবদ্ধ করার জন্য চামড়ার কাগজ সংগ্রহ করত, তখন জেটিভার কারখানাসমূহে প্রচুর কাগজ প্রস্তুত হতো। বুনট ও ঘষামাজার এ কাগজের অধিকাংশ বর্তমান শতকের সর্বোন্নত প্রণালীতে প্রস্তুত কাগজ অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিলনা।"[১৬৬] ("At a time when the scribes of christian Europe were reduced to the necessity of erasing the works of classic authors to obtain perchments the mills of xative were producing great quantities of paper much of which in texture and finish, will compare not favourably with that obtained by the most improved not favourably with that obiained by most impoved processes of modern manufacture".)

স্পেনের মূর কারিগরেরা সর্বপ্রথম তুলার কাগজ উদ্ভাবন করেন। ৭১০ খ্রিস্টাব্দে মক্কায় কাগজ ব্যবহৃত হয়। ৭৯৪ খ্রিস্টাব্দ-৯৫ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে কাগজের কল স্থাপিত হয়। তখন পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত ইউরোপে কাগজের ব্যবহার অজ্ঞাত ছিল কারণ তখনও প্রিন্টিং প্রেস আবিষ্কৃত হয়নি। স্পেনে কাগজ প্রচলন হবার পর ইউরোপে তা প্রসারিত হয়।

একথা বলা যায় যে, যেখানে চীনে রেশমের সাহায্যে কাগজ তৈরি করা হতো সেখানে তুলা ব্যবহার করে মূরেরা প্রথম কাগজ উৎপাদন করতে থাকে। ঐতিহাসিক Draper বলেন, "স্পেনীয় মুসলমানদের তুলোর সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহারের মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান আবিষ্কার হচ্ছে কাগজের প্রচলন।"[১৬৭] ("One of the most valuable spanish application of cotton was in the invention of cotton papers".)

---

[১৬৬] S.P. Scott, *Op. cit.*, P. 387.
[১৬৭] J.W. Draper, *Op. cit.*, Vol.II, P. 386.

এগারো শতকে তুলা দিয়ে প্রস্তুত কাগজে লিখিত একটি পাণ্ডুলিপি মাদ্রিদের এস্কুরিয়াল (escurial) লাইব্রেরীতে পাওয়া গেছে। ঐতিহাসক Lecky বলেছেন- স্পেনীয় মুসলমানেরা ১০০৯ খ্রিস্টাব্দের প্রথম ভাগে তুলার কাগজ ব্যবহার করে। অথচ তের শতকের শেষভাগের পূর্ব পর্যন্ত (১২৬৮ খ্রিস্টাব্দ-৭৬ খ্রিস্টাব্দ) খ্রিস্টান জাতিসমূহ এর অস্তিত্ব জানতো বলে মনে হয় না। (Cotton paper was in use among them as early as 1008. Among christian nations it apear's to have been unknown till late in the thirteenth century.)

উন্নত কালির ব্যবহারে উৎকৃষ্ট লিপির প্রয়োগে পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও চমৎকার চামড়ার বাঁধাই দ্বারা সব গ্রন্থ স্থায়িত্ব করবার ফলেই পাশ্চাত্য মুসলিম সভ্যতার বিকাশ সম্ভব হয়েছে। এক্ষেত্রে মাদ্রিদের এস্কুরিয়াল (escuril) লাইব্রেরীর উল্লেখ করতে হয়। বর্তমানে পৃথিবীর সমস্ত গ্রন্থাগারে পাঠ্য অপর কোন সংগ্রহ শালায় এরূপ বিপুল পরিমাণ আরবি পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত নেই। কথিত আছে যে, সতের শতকের প্রথম ভাগে মরক্কোর সুলতান শারিফ জায়দান দেশত্যাগের পূর্বে তাঁর মূল্যবান পাণ্ডুলিপিগুলো একটি জাহাজে অন্যত্র সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করেন। কিন্তু ম্যার্শে বন্দরের কাছে স্পেনীশ জলদস্যুদের কবলে পড়ে। পরে স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপসের আদেশে এ সমস্ত পাণ্ডুলিপি এস্কুরিয়াল (Escurial) লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত করে।

পুস্তক বাঁধাই একটি উৎকৃষ্ট শিল্পচর্চার পর্যায়ে স্বীকৃতি লাভ করেছে। পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের পর তার স্থায়িত্বের জন্য নিখুঁতভাবে বাঁধাই করা হতো। প্রধানত চামড়ার বাঁধাই অধিক প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন ধরনের নক্শাকৃত বাঁধাই এর একটি বিশিষ্ট নাম ছিল। মরক্কো নামে বই বাঁধাইয়ের এই কৌশল সম্ভবত মরক্কোতে উদ্ভাবিত হয় এবং এ কারণে নামকরণ হয়েছে মরক্কো। পুস্তকের মলাট হত খুবই চাকচিক্যপূর্ণ। চন্দন, মুসব্বর, দেবদারু, আবলুস প্রভৃতি মূল্যবান পাঠের তাকে এসব অমূল্য সাহিত্য রত্ন রক্ষিত হতো। স্বর্ণকার ও জহুরিরা অত্যধিক নৈপুন্যের সাথে রত্ন, গজদন্ত, cameos, বৃহৎ পদক, তম্রাঙ্গারক, ঘোর নীল বর্ণের প্রস্তর, (Lapis lazuli) ও স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু গ্রথিত করে পুস্তকের আচ্ছাদন সুশোভিত করতো।

পাণ্ডুলিপির বাঁধাই এমন চিত্তাকর্ষক ছিল যে, তা দেখলেই প্রতীয়মান হবে। বাঁধাই এর উৎকৃষ্ট উপাদান সুন্দর নক্শা, উজ্জ্বল রঙের প্রাচুর্য সকলকে আকৃষ্ট করতো। এর ফলেই বাঁধাইকৃত গ্রন্থ বর্তমানে দুর্লভ। বারবারেরা কর্ডোভা লুণ্ঠন করার সময় অমূল্য পাণ্ডুলিপির চামড়া বাঁধাই দিয়ে জুতা তৈরি করেছিল। খ্রিস্টানেরা অবশিষ্টগুলোর স্বর্ণরত্ন খুলে নিয়ে পাণ্ডুলিপিসমূহ অবজ্ঞাভরে দূরে ফেলে

দেয়। তাদের হাত থেকে যা কোনরূপে রক্ষা পায়। তন্মধ্যে প্রায় দশ লক্ষ পুস্তক একই দিনে জিমোনসের কোপানলে ভস্মীভূত হয়।

শিক্ষা দীক্ষার সম্প্রচারে কাগজ ও কালির অবদান অনস্বীকার্য। কালি ব্যতীত কাগজে প্রয়োজনীয় ফরমান, সাহিত্য ও কবিতা, লিপিবদ্ধ করা সম্ভব ছিলনা। এজন্য কাগজ উৎপাদনের পরেই উচ্চমানের কালি প্রস্তুতও অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। মূরেরা নানা প্রকার কালি প্রস্তুত করার পদ্ধতি ও কৌশল জানতো। S.P.Scott বলেন, "ঔজ্জ্বল্য ও স্থায়িত্বের দিক থেকে তাদের কালি বর্তমান যুগের কালি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল।"[১৬৮] ("Their (ink) brilliance and durability exceeded those of any known to modern manufacture".)

উন্নতমানের কালি ছাড়া রাজকীয় ফরমানে এবং জ্ঞান বিজ্ঞান বিস্তারে রচিত গ্রন্থাদি স্থায়ী হতে পারতোনা। লিপিকার উজ্জ্বল, স্বচ্ছ ও গভীর কালির ব্যবহারে সুন্দর ও নির্ভুলভাবে সরলরেখা ক্রমে তাদের কর্তব্য সম্পাদনা করতেন। লেখক বা লিপিকারদের লেখন ভঙ্গি, লিপিশৈলী এরূপ উন্নতমানের ছিল যে, তা ছাপার অক্ষরের মত স্পষ্ট ও নিখুঁত ছিল।[১৬৯]

শুধু কালো কালির সাহায্যেই লিপিকার লিপিকলার উন্নতি সাধন করেননি, প্রয়োজনে এবং গুরুত্ব উপলব্ধি করে সোনার পানি দিয়ে কুরআনের অনুলিপি প্রস্তুত করা হত। কখনও কখনও রাজকীয় ফরমানও তরল সোনা দিয়ে লেখা হত। যে কৌশলে তারা পান্ডুলিপি সুশোভিত করতো তা ফ্রান্স ও ইতালিতে মধ্যযুগীয় সন্ন্যাসীগণ অনুকরণ করতেন। জ্যামিতিক ও পুষ্পের নকশা ব্যতিত তারা আশ্চর্যজনক নিপুনতার সঙ্গে বৃহৎ পদক এমনকি মানুষ ও জীবজন্তুর ছবি পর্যন্ত অঙ্কিত করত। মূর শিল্পীদের প্রতিভা ও কৌশলের ছবি পর্যন্ত অঙ্কিত করত। মূর শিল্পীদের প্রতিভা ও কৌশলের এসব সৃষ্টি খ্রিস্টানদের প্রতিহিংসার কারণে সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।[১৭০]

খ্রিষ্টানদের ধ্বংসযজ্ঞের কারণে মূরসভ্যতার অনেক নিদর্শনই বিলিন হয়ে গেছে। খুব অল্প সংখ্যক চর্মশিল্পের নমুনা পাওয়া গেছে যা তাদের কারুশিল্পের অপূর্ব দক্ষতার প্রমাণ দেয়। কাঁচা চামড়ার পাকা বা tanning করে ব্যবহারের উপযোগী করার পদ্ধতি মূরেরা জানত। চামড়ার বিভিন্ন দ্রব্য তৈরী করা হত এবং এগুলোর উপর ধাতুর নক্‌শা, রঙের প্রলেপ দেওয়া হত। চামড়ার তৈরি বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে

---

[১৬৮] S.P. Scott, *Op. cit.*, Vol.III. P. 570.
[১৬৯] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯২।
[১৭০] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯২।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল ঝালর। স্বর্ণ, রৌপ্য খচিত ও বিভিন্ন রঙে রঞ্জিত কর্ডোভার চামড়ার ঝালর রাজধানীর নামে 'কর্ডোভা' নামে পরিচিত ছিল। এগুলো উঁচু দামে বিক্রি হত। কারণ এগুলোর শিল্পগত মান ছিল খুবই উঁচুতে। মূরদের কারুকার্য খচিত কয়েকটি ছিন্ন ও নিস্প্রভ টুকরা পাওয়া গেছে, যা তাদের নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়, যার সাথে বর্তমানকালের সর্বাপেক্ষা দক্ষ দপ্তরীর কাজ কদর্য বলে মনে হবে। মূর শিল্পিরা ছাগ চর্ম ব্যবহার করতেন এবং তাতে তাদের শৈল্পিক অভিব্যক্তি প্রকাশ করতেন।[১৭১]

মূর শাসিত স্পেনে মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকান্ডের মধ্যে লিপিকলা নি:সন্দেহে সর্বাধিক পরিমার্জিত ও সুষমামন্ডিত। আরবদের মতো অন্য কোন জাতি লিখন পদ্ধতিতে শিল্পকলার মাধ্যম হিসেবে গভীর মনোনিবেশের সাথে ব্যবহার করেনি। জীবিত প্রাণীর মূর্তি অর্জনের অস্বাভাবিক পরিণামের ভীতির ফলে লিপিকাররা কুরআন শরীফের নকল প্রণয়ন করতে থাকেন । এ সমস্ত হস্তলিপিতে কুরআন শরীফ লিখন চাতুর্য, সৌন্দর্য এবং অপরূপ লালিত্যে অনুপম অতুলনীয় । মুসলিম লিপিকার বিভিন্ন রীতির উদ্ভব করেন। যেমন- কুফী, নাসখ, সুলস, মুহাককাক, রায়হানী, তাউকী, রিকা, গুবার, গুলজার, তাউস, লারঞ্জা, তালিক, নাসতালিক, তুঘরা, জুলফ ই আরুস ইতাদি। তবে একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, কুফী এমন এক চিত্রকলায় পরিণত হয় যে তা মৃৎপাত্রে ধাতব পাত্র, মুদ্রা, স্থাপত্য শিলালিপি, আলঙ্কারিক রীতিতে দেখা যায়। মুসলিম বিশ্বের সমস্ত অঞ্চলের মত স্পেনে মূরদের শাসনামলে লিপিকলা চরম উৎকর্ষতা লাভ করে।[১৭২]

আলংকারিক রীতি নক্শা ক্ষেত্রে ইউরোপে মুসলমানদের কাছে থেকে যা গ্রহণ করেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে লিপিকলা ভিত্তিক অলংকরণ। আরবি লিপিমালা তাদের কাছে অলংকরণ হিসেবে এরূপ আকর্ষণীয় হয়ে উঠে যে মর্সিয়ার খ্রিস্টান রাজা ওফ্ফা (৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ-৯৬ খ্রিস্টাব্দ) কুফী রীতিতে মুসলমানদের 'কালিমা' তার মুদ্রায় খোদিত করেন। অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হচ্ছে খ্রিস্টিয় নবম শতকে খোদিত একটি ব্রোঞ্জ ও সোনার আইরিশ ক্রস, যার মধ্য ভাগে কুফী রীতিতে 'বিসমিল্লাহ' শব্দটি রয়েছে। এ এইচ ক্রিষ্টি বলেন- এই উভয় ক্ষেত্রেই কারিগরেরা যে অস্বাভাবিক লিপিমালা অনুকরণ অথবা গ্রহণ করেছে তার অসীম গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন নি; কারণ মুসলিম ('কালিমা' অথবা 'বিসমিল্লাহ') সম্বলিত লিপিমালা জ্ঞাতসারে একজন খ্রিস্টান রাজার মুদ্রায় অথবা

---

[১৭১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৩।
[১৭২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৪।

পবিত্র প্রতীকে খোদিত করা একেবারেই অসম্ভব। কেবল আলঙ্কারিক লিপিমালায় নয়, বরং মুসলিম শিল্পকলা থেকে আহৃত অন্যান্য আলঙ্কারিক মোটিফ খ্রিস্টান ইউরোপের অসংখ্য কারুশিল্পে ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে।[১৭৩]

হস্তলিপি শিল্প স্পেনে চরম উৎকর্ষতা লাভ করে। তাদের সর্বোৎকৃষ্ট স্থাপত্য ও অলংকরণ শিল্পের নিদর্শন হচ্ছে আল হামরা প্রাসাদ। ধ্বংসাবস্থায়ও পৃথিবীতে এর কোন তুলনা নেই। জে. স্টাইগসকী বলেন, শিল্পকলার ইতিহাসে এর মর্যাদা অপরিসীম এবং আল হামরা অদ্বিতীয়। অতি সুক্ষ্ম কারুকার্য, জটিল খোদাইকাজ এবং অতি উজ্জ্বল মোসাইকের সঙ্গে মনোরম ও আকর্ষণীয় কুফী ও অন্যান্য লিপি স্টাইলের সংমিশ্রণে অলংকরণ এক অভিনব রূপ ধারণ করেছে। লিপিমালা জ্যামিতিক নক্‌শার পেঁচান ব্যান্ডের সাথে এমন দক্ষতায় খোদাই করা হয়েছে যে দর্শকদের নজরে রং বেরঙের ধাঁধার সৃষ্টি করে। অক্ষরগুলো পরস্পরকে জড়িয়ে এমন সুন্দরভাবে উৎকীর্ণ করা হয়েছে মনে হবে একটি ফোয়ারা থেকে পানি নির্গত হচ্ছে।

আরবি লিপি মালা খুব ঘন ও ঝুলন্ত লতাপাতা ও ছোট ডালপাল দ্বারা পরিবেষ্টিত, যা মূরদের শাসনামলে স্পেনে উৎকর্ষতার সর্বোচ্চ শিখরে উঠেছিল। খিলানাকৃতি কুলুঙ্গীতে যে কলম আছে তাতেও শিলালিপি উৎকীর্ণ রয়েছে। মহান আল্লাহর ইচ্ছা এরূপ যে অসামান্য সৌন্দর্যে এটি যেন অপরাপর সবকিছুকে অতিক্রম করে। আল হামরার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কুলুঙ্গীতে স্থাপিত এবং লিপিমালা দ্বারা সুশোভিত কলসি। আল হামরা প্রাসাদের চতুর্দিকে এক সময় উৎকীর্ণ ছিল : "আল্লাহ ব্যতীত অপর কেউ পরাক্রমশালী নয়।"

পাদুয়ার এরেনা গীর্জায় লাজারাসের পুনরুত্থান নামক একটি ইতালিয় চিত্রকর্মে যিশুখ্রিষ্টের ডান কাঁধে একটি ফিতা কুফী লিপির অনুকরণে অলঙ্কৃত ফ্রা-এঞ্জেলিকা এবং ফ্রা-লিপি আরবি লিপিমালার প্রতি মোহাবিষ্ট ছিলেন এবং কুমারী মেরীর হাতের আস্তিন এবং পোশাকের বর্ডারে এ ধরনের অলঙ্করণ দ্বারা শোভিত করেন।

পারস্যের মত স্পেনেও নীল এবং সিন্দুর রঙ দ্বারা মসজিদ ও প্রাসাদসমূহ অলংকৃত করা হয়। কখনও কখনও সমস্ত পৃষ্ঠদেশ লাল অথবা নীল রং দ্বারা শোভিত হতো এবং তারপর বিভিন্ন রঙের সমাবেশে নীল অলংকরণ করা হতো। পৃষ্ঠদেশ লাল হলে লিপিমালা, লতাপাতা ও রৈখিক নকশা নীল, সবুজ ও

---

[১৭৩] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৪।

হলুদ দ্বারা খোদিত হতো। আল হামরায় প্রাপ্ত একটি সমাধি ফলকে নীল পটভূমির উপর সোনালি অক্ষরে উৎকীর্ণ লিপিমালা দেখা যাবে। স্থাপত্যকে অলংকরণের পরিকল্পনায় যেমন মূল উপাদানে বিশেষ ভূমিকা পালন করে, অনুরূপ বর্ণাঢ্য নক্শাবলির প্রধান উৎস হিসেবে পাণ্ডুলিপি চিত্রায়নে চিহ্নিত করা হয়। দেওয়ালের গাত্রে উচুঁ মার্জিন দ্বারা আয়তাকার প্যানেলে বিভক্ত করা হয় এবং এই সমস্ত প্যানেলগুলো অতি সুক্ষ্ম খোদাই কাজ, অথবা মিনা করার টালি অথবা উজ্জ্বল মোসাইকের নক্শা দ্বারা অলংকৃত করা হতো। সমস্ত দেওয়ালের ওপর থেকে নিম্নাংশ পর্যন্ত বর্ণাঢ্য রং দ্বারা শোভিত হয়েছে।[১৭৪]

গাঢ় নীল অথবা লাল রঙের পটভূমিতে বহুল ব্যবহৃত হয়; সোনালি আভার মত হলুদ, সাদা, কাল, পান্না এবং ফিরোজা রঙের সাহায্যে অলংকরণ করা হয়। গাঢ় নীল রঙের পটভূমিতে সাদা অথবা সোনালি কুফী অথবা নাসখী লিপি শৈলী এরূপ অলংকারিক মোটিফ সম্বন্ধে A.U. Pope বলেন, "আরাবেস্ক এবং নক্ষত্রের অনুরূপ মেডালিয়ন বা পদক; রাজন্যবর্গ অথবা উৎফুল্ল ও লম্ফমান ঘোড়ার সওয়ারী, অথবা ছন্দায়িত স্টাকো বা খোদাই কাজের সূক্ষ্ম কুফী লিপিমালার যখন সোনালি, ধাতু রং, সবুজ, ফিরোজা, তামাটে এবং কালো রঙের সংমিশ্রণে সৃষ্ট নক্শা প্রভৃতি এক অনিন্দ্যসুন্দর রূপসজ্জায় পরিণত হয়। সনেটের মত বিষয়বস্তু, উপাদান, রঙ এবং নক্শাবলি সম্পৃক্ত ও সৌন্দর্যমন্ডিত হয়েছে।"[১৭৫]

স্পেনীয় আরবগণ সর্বপ্রথম চামড়ার দ্রব্যাদি দিয়ে কাগজ প্রস্তুত করার কৌশল উদ্ভাবন করেন। চামড়া পাকা করার পরে চামড়াকে সোনা অথবা রূপার প্রলেপ দেয়া হয় এবং পরিশেষে এমনভাবে পালিশ করা হয় যে, এর একদিকে তাকালে আয়নার মত মুখমন্ডল প্রতিফলিত হয়। এই উপকরণের উপর সিন্দুর, সবুজ, কাল অথবা নীল রঙের সাহায্যে লিপিমালা উৎকীর্ণ রয়েছে। তারা যে ধরনের কালি প্রস্তুত করতো তা তখনও ইউরোপে অনুকরণ করা হয়নি। পুস্তকের মলাট সোনা অথবা রূপা দিয়ে রঞ্জিত করা হতো এবং কখনও কখনও বহুমূল্যবান পাথর দ্বারা খচিত থাকত। অতি সাধারণ অথবা জটিল অলংকরণ নক্শায় হোকনা কেন, আরবি লিপিমালা ম্যাজিকের মত দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এটি অ্যারাবেস্ক হিসেবেই ব্যহৃত হয়েছে এবং ইতালি, স্পেন ও ফ্রান্সের গির্জা ও সমাধির অলংকরণে অতি সাবলীল লিপিকলার মোটিফ হিসেবে প্রয়োগ করা হয়েছে।

---

[১৭৪] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৫।

[১৭৫] Arthur Uphan Pope, *Persian Architecture* (New York: Oxford University Press, 1969), P. 14.

এভাবে, S.P.Scott বলেছেন যে, "অজান্তেই কুফী লিপিশৈলীর মাধ্যমে কুরআনের বাণী গীর্জার প্রাচীরে উৎকীর্ণ করা হয়েছে। একজন ফরাসি লেখকের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি মন্তব্য করেন যে সেন্ট পিটারের প্রসিদ্ধ গীর্জার সুউচ্চ ফটক আরবি লিপিতে মুসলিম ধর্মের স্বীকারোক্তি ('কালিমা') দ্বারা শোভিত রয়েছে। কাজেই বলা যায় যে, এই আরবি লিপিতে এমন কোন শৈল্পিক অভিব্যক্তির সার্বজনীন রূপ ছিল যা শিল্পীর মনকে আন্দোলিত করে, নতুবা খ্রিস্টানগণ কখনই তাদের পবিত্র উপাসনালয়ে এ ধরনের আরবি লিপিমালা সংযোগ করতেন না।"[১৭৬]

আরবি লিপিকলার এরূপ উদার প্রচলন ও ব্যাপক ব্যবহারকে অবজ্ঞা করে ই হারজফেল্ড মন্তব্য করে বলেন যে, "মুসলমানদের পক্ষে এটি নিঃসন্দেহে তাদের ধর্মান্ধতার পরিচায়ক যে তারা তাদের প্রত্যেকে উন্নত কারুশিল্পের মূর্ত প্রতীক ব্যবহার্য দ্রব্যাদিতে কুরআনের বাণী লিপিবদ্ধ করতো।"[১৭৭]

এ সমস্ত শিলালিপি বা লিপিমালার মধ্যে তিনি (হারজফেল্ড) ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্বলিত লিপিমালাগুলো কৃতজ্ঞতা সহকারে গ্রহণযোগ্য মনে করেন। অন্যথায় এ ধরনের লিপিকলা তার কাছে "নিছক আলঙ্কারিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত বিভিন্ন চিহ্ন মাত্র যা 'কালিমা' অথবা অহেতুক অসংখ্য ধর্মীয় নীতিবাক্য অথবা স্তুতিবাক্যের সমষ্টি। মুসলিম ধর্ম বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি বা 'কালিমা' যা কয়েকটি অক্ষরের সমন্বয়ে ইসলাম ধর্মের মূলমন্ত্রে পরিণত হয়েছে; তা স্বভাবতই একজন নিবেদিত প্রাণ মুসলমানের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আদ্যক্ষরে রূপান্তরিত করলে এই স্বীকারোক্তি মাত্র তিনটি অক্ষরে দাঁড়াবে। যেমন - (আলিফ, লাম, মীম) এই তিনটি অক্ষর দিয়েই পবিত্র কুরআন শরীফের সূচনা। এই তিনটি অক্ষর আলঙ্কারিক নক্‌শার অসাধারণ কৌশল অবলম্বনে স্থাপত্যকে অলঙ্করণের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মোটিফে পরিণত হয়েছে।[১৭৮]

ধর্মের প্রতীক ও মূলমন্ত্র হিসেবে খুব কম মুসলমানই (আলঙ্কারিক রীতির ফলে) অক্ষর তিনটিতে 'কালিমা'র সন্ধান পাবেন কিন্তু সকল ধর্মের অনুসারীরা এই লিপিমালাকে নিঃসন্দেহে সুষমামন্ডিত বলে মনে করেন। ই হারজফেল্ড স্বীকার করেন যে, এই সমস্ত অক্ষরের আলঙ্কারিক গুরুত্ব রয়েছে তাদের লীলায়িত অঙ্গ, সৌষ্ঠব এবং ভারসাম্য। অপরদিকে লিপিকার আলংকারিক গুরুত্বকে তুচ্ছ করে তিনি পরিতাপের সঙ্গে বলেন যে, এই সমস্ত বর্ণমালা, যার প্রকৃত রূপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত ধারণা

---

[১৭৬] S.P. Scott, *Op. cit.*, Vol.III, Ch. 29, quoted by M Ziauddin, P. 10.

[১৭৭] E. Herzfeld, *Encyclopedia of Islam,* Vol.I (Netherlands: Leiden University Press, 1960), P. 304.

[১৭৮] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৬।

রয়েছে। সেগুলো অমুসলমান শিল্পীদের সৃষ্ট দ্রব্যাদিতে পাওয়া যাবে, বিশেষ করে যেগুলো আরব শিল্প কর্মের পাশ্চাত্য অনুকরণ।

পরবর্তী পর্যায়ে এই আলংকারিক লিখন পদ্ধতি এক ধরনের রৈখিক নক্সায় রূপান্তরিত হয়। যাতে অক্ষরগুলোর মূল গঠন ও উপলব্ধি লোপ পায়। এ ধরনের বিবর্তন একেবারে অস্বাভাবিক ছিলনা। আরব মননশীলতার অনুপম বৈশিষ্ট্য প্রকৃতির অসামান্য অবদানসমূহের বিমূর্ত ভাব ধারায় প্রকাশ পেয়েছে এবং এর ফলে এক স্বকীয় ও স্বাধীন সত্তা লাভ করেছে। তারা অসীম দক্ষতার সাথে লিপিকার রৈখিক লীলায়িত ভক্তিগুলোর বিমূর্ত প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে এবং বর্ণমালা লীলায়িত গুণাবলি জ্যামিতিক নক্‌শায় (অ্যারাবেস্ক) প্রয়োগ করেছে।[১৭৯]

স্পেন থেকে মূরদের বিতাড়িত করার পর মুসলিম কারিগরদের গীর্জা ও সমাধি নির্মাণে নিয়োগ করা হয়। তাদের কোন পারিশ্রমিক দেয়া হতনা। কেবল সংখ্যালঘুদের দেয়া কর থেকে তারা অব্যাহতি লাভ করে। এই সমস্ত মুসলিম স্থপতিগণ খ্রিস্টানদের আমলে উদ্ভাবিত স্থাপত্য রীতিতে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করে এবং অমুসলমান ইমারতে আরবি লিপিকলার প্রচলনে সহায়তা করে। প্রকৃতপক্ষে স্পেনে মুসলিম শাসনের অবসান হলে খ্রিস্টান স্থাপত্যকলার উদ্ভব হয়। ওয়েন জোনস বলেন, “মুসলমানগণ তাদের ইতিহাসের শুভ লগ্নেই তাদের সৃজনশীলতায় পুষ্ট এক ধরনের শিল্পকর্ম উদ্ভাবন ও উৎকর্ষ সাধন করেন। এ কথা বলা যাবে না যে, বারো অথবা তের শতকের পূর্ব পর্যন্ত খ্রিস্টধর্ম তার নিজস্ব স্থাপত্যরীতিতে উদ্ভব করেছিল। যাতে পৌত্তলিকতার কোন চিহ্ন ছিল না।”[১৮০] এম.এস.বিগ্রস মন্তব্য করেন, “গথিক শিল্প কর্মের শেষ পর্যায়ে আলংকারিক রীতিতে খোদিত উৎকীর্ণ শিলালিপি মুসলিম শাসনাধীনে দক্ষিণ ফ্রান্সে অনুপ্রবেশ করে এবং অলংকরণের অসাধারণ দৃষ্টান্ত এমনকি ইংল্যান্ডেও আরব প্রভাব লক্ষ্য করা যাবে।”[১৮১]

ওয়েস্টমিনিস্টার আবীর প্রধান বেদীর পিছনে যে আলংকারিক শিল্পকলা রয়েছে তা মুসলিম লিপিকলার প্রভাবের প্রতিফলন। যে সমস্ত দেশ মুসলিম শাসনাধীনে আছে বা ছিল সে সমস্ত দেশে মুসলিম শিল্পকলার বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে, কেবল স্পেনই এর ব্যতিক্রম। এর কারণ স্পেনের বর্বর

[১৭৯] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৬।
[১৮০] Owen Jones, *The Grammar of Ornaments* (Germany: Deutsch Press,1856), P. 57.
[১৮১] Martin Shaw Briggs, *The Legacy of Islam* (Germany: Leipzig University Press, 1913), P. 178.

খ্রিস্টানগণ মানব সভ্যতার ইতিহাসে নজির বিহীন নিষ্ঠুরতা ও বৈরীতার সাথে মুসলিম স্পেনের সমস্ত গ্রন্থাগার, মসজিদ, প্রাসাদ, স্নানাগার এমনকি কারুশিল্পের সামান্যতম নির্দশনাদি ধ্বংস করে।

খ্রিস্টান যাজক সম্প্রদায় আরবি লিপিমালাকে ভৌতিক সূত্র বলে ঘোষণা করেন। স্পেন থেকে সেগুলোর নিশ্চিহ্ন করার জন্য আইন প্রণয়ন করা হয় এবং এভাবে শিল্পকলার সর্বাপেক্ষা মূল্যবান দ্রব্যাদি ও নিদর্শনাদি কালের গহ্বরে বিলীন হয়ে গেছে। বহু মূল্যবান ও দুস্প্রাপ্য গ্রন্থাদি আহরণ করে ক্রুসের আকৃতিতে সাজিয়ে প্রজ্বলিত করা হয়। চতুর্থ ফার্ডিনান্ড এবং পঞ্চম চার্লস স্পেনে মুসলিম সংস্কৃতির সমস্ত চিহ্ন ধুলিসাৎ করার ঘৃণ্য পরিকল্পনা করেন। দ্বিতীয় ফিলিপ এমন ও আদেশ দেন যে, "পাথরে খোদিত আরবি শিলালিপিসমূহ যেন টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়।"

সত্যই অবাক হতে হয় এই জেনে যে, স্পেনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খলিফা দ্বিতীয় হাকামের আমলে তৈরী কুফী রীতির অপূর্ব লিপি সম্বলিত একটি রূপালি গিল্টির কাসকেট কিভাবে জেরোনার গির্জার প্রধান বেদীতে স্থান পেয়েছিল। উল্লেখ্য যে, আরবি লিপিতে এই কাসকেটের মালিকের প্রতি স্তুতি বাণী ছিল। ফিলিপ বামবরো বলেন, "৭১১ খ্রিস্টাব্দে আরব বিজয়ের পর আন্দালুসিয়ায় আরবি লিখন (Script) ইসলামের সাথে সনাক্তই করেননি বরং ল্যাটিন খ্রিস্টান সংস্কৃতিকে অতিক্রম করে তার স্থান দখল করেছে এমন একটি সংস্কৃতির সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করেছে। আন্দালুসিয়দের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আরব সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার পরবর্তীকালে আরব পোশাক, ভাষা ও লিপি এমন এক গোষ্ঠী দ্বারা অনুসৃত হয় যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।"[১৮২] এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, উত্তর আফ্রিকায় যে মাগরীবী রীতির উদ্ভব হয় তাই পরবর্তী কালে স্পেনে বহুল প্রচারিত হয়।

পাশ্চাত্য চারু ও কারুকলার ক্ষেত্রে আরবি লিপিকলার অসামান্য প্রভাব রয়েছে। যেমন- সিসিলির বহিমুন্ডু একজন ক্রুসেডার ছিলেন। তার সমাধির দরজা ব্রোঞ্জ দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল এবং নক্শাবলির মধ্যে অ্যারাবেস্ক ও কুফীলিপি প্রাধান্য পায়। এছাড়া ১১৩৮ খ্রিস্টাব্দে সিসিলির রাজা দ্বিতীয় রজার যে মুদ্রা ছাপান তাতে ল্যাটিনের পাশাপাশি আরবি কুফী লিপি লক্ষ করা যায়। বার্সেলোনার কাউন্ট বারেনগুয়ার (১০১৭ খ্রিস্টাব্দ-৬৫ খ্রিস্টাব্দ) সর্বপ্রথম খ্রিস্টান রাজা যিনি মালাগার দীনারের (স্বর্ণযুগ) অনুকরণে স্বর্ণমুদ্রা ছাপান। মুর্সিয়ার রাজা ওফ্ফা (৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ-৯৬ খ্রিস্টাব্দ) আব্বাসিয় দীনারের

[১৮২] P. Bamborough, *Op. cit.,* P. 15.

অনুকরণে যে স্বর্ণ মুদ্রা প্রচলন করেন তাতেও কুফী রীতিতে আরবি লিপি এবং হিজরি ১৫৭ (৭৭৪ খ্রিস্টাব্দ) উল্লেখ ছিল। দক্ষিণ ইতালির সান নিকোলার গির্জায় বেদীর ওপর স্টাইল কুফী রীতিতে অলঙ্করন দেখা যাবে । এটি লতাপাতা মিশ্রিত কুফী Floreated kufic বলা যায়।

R.A.Jairaz Fhoy বলেন, "যদি ছদ্মবেশধারী কুফী অলঙ্করণে দু'টি আরবি হরফের 'আলিফ' এবং 'লাম' অনুকরণে করা হয়েছে যা খাড়া রেখাগুলো ক্রমশ অন্যান্য অক্ষরের চেয়ে উপরে বেড়েছে তা হলে আমরা ধরে নিতে পারি যে বারীর মোসাইকে অক্ষরগুলোর সমন্বয়ে যে শব্দ সৃষ্টি হয়েছে তা 'আল্লাহ'।"[১৮৩] ("If it is admitted that pseudo kufic ornaments is an iminattation of the Arabic letters Alif and Lam whose vertical strokes constantly rise above the rest, then it may be that in the Bari mosaic we have the combination of the very letters that spelt the name of Allah".)

নয় শতকে বাইজান্টাইন মৃৎপাত্রে Pseudo কুফীর অলঙ্করণ দেখা যায়। এথেন্সের একটি সিংহের রিলিফে কুফী বর্ডার রয়েছে। প্যারিসের বিবলিউথিক ন্যাশনালে রচিত (১১১৮ খ্রিস্টাব্দ) Manuscript Homilies of John Chrysostome- এ পাতার বর্ডার আলঙ্করিক কুফী দ্বারা সজ্জিত। ১০৪৪ খ্রিস্টাব্দে এথেন্সে বাইজান্টাইন আমলে নির্মিত Chureh of S. Nicodemehus এ ইটের নক্‌শায় কুফী লিপি পাওয়া গেছে। এথেন্সের অপর একটি গির্জা Church of Hosias Leucas (৭৪২ খ্রিস্টাব্দ-৭৪ খ্রিস্টাব্দ) এ 'আলিফ' ও 'লাম' হরফ দুটি লতাপাতার (Pal mette) সাথে জড়িত অবস্থায় হয়েছে।

এগারো শতকে আরাগণের রাজা প্রথম মস্কো আরবিতে স্বাক্ষর দিতেন। Oviedo Cathedral-এর Camara sancta'র দেবদারুর একটি বাক্সে চারধারের বর্ডারে কুফী লিপি ব্যবহৃত হয়েছে। মিলসের খ্রিস্টান মঠে এনামেলের নক্‌শায় প্যামেটের সাথে সংমিশ্রিত আরবি হরফ মিম ও আলিফকে স্পষ্টভাবে দেখা যাবে। বিবলিউথিক ন্যাশনালে রক্ষিত Apocalyse of S.Sever-এর পাতায় কুফীর ব্যবহার দেখা যায়। গ্রন্থটি ১০৪৭ খ্রিস্টাব্দে গ্যাসমনী পুরোহিত এতট গ্রেগরীর সময়ে লিপিবদ্ধ হয়। নির্মিত St.Pierre de Redes গির্জার পোটালের লিনটেলে, 'আলিফ' ও 'লাম' হরফ দুটির আলঙ্কারিক ব্যবহার দেখা যাবে। Le puy তে নির্মিত কাঠের দরজায় আরবি লিপি খোদিত রয়েছে। একই ধরনের

[১৮৩] R.A. Jairaz Fhoy, *Op. cit.*, P. 71.

লিপিবাণী দেখা যাবে La Voute chilhac de Blesle, Chamliers sur Loive-তে। লিউঁতে একটি পাথরে খোদিত বালকের মূর্তির চারপাশ কুফী রীতিতে অলঙ্কৃত।[১৮৪]

১১৭৫ খ্রিস্টাব্দে রাভেল্লোতে Church of St. Giovanni deltro'র মিসরে গোলাকৃতি সিরামিক টালি রয়েছে যার ভেতরে কুফী হরফ 'লাম' ও 'আলিফের' সাহায্যে নক্‌শা করা হয়েছে। টলেডোর convent of the conception এর অষ্টকোণাকার গম্বুজে যে জ্যামিতিক নক্‌শা দেখা যায় তার ফাঁকে ফাঁকে আরবি লিপি শৈলী লক্ষ করা যায়। দশ শতকে প্যারিসের St. Germain des pres এ যে পুরোহিত সমাহিত হয়েছিলেন তার আরবি আলখাল্লা ধরনের পোশাকে আরবি লিপিকলার নিদর্শন ছিল। ভিক্টোরিয়া এন্ড আলবার্ট জাদুঘরে গথিক যুগের তের অথবা চৌদ্দ শতকে নির্মিত সিল্কের একটি টিস্যুতে কুফী রীতির অলঙ্করণ রয়েছে।[১৮৫]

ভিক্টোরিয়া এন্ড আলবার্ট জাদুঘরে রক্ষিত একটি গথিক আমলের কাঠের সিন্দুকের ঢাকনায় নাসখি রীতিতে সম্ভবত কোন সূরা খোদিত হয়েছে। চৌদ্দ শতকের নর উইচের (ইংল্যান্ডের) একটি গির্জার বেদীতে জ্যামিতিক নক্‌শার সাথে লিপিকলার মিশ্রণ দেখা যাবে। তের শতকের S.Pier গির্জার (পিসা, ইতালি) ফ্রেস্কোতে যে মৃতপ্রায় সাধুর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তার পিছনে যে পর্দা আছে তাতে আরবি লিপি ব্যবহৃত হয়। এমনকি জ্যাটো (Giotto) আসিসির একটি গির্জায় যে ফ্রেস্কো অঙ্কন করেন তা আরবি হরফ বা Kuficized border দিয়ে অলঙ্কৃত। মিলানের Brera Gattery-তে সংরক্ষিত Paolo Veneziano'র একটি তৈলচিত্রে বস্ত্রের যে ব্যবহার হয়েছে তার প্রধান আকর্ষণ কুফী লিপির নক্‌শা সম্বলিত বর্ডার।

Fra Angelio প্রাচ্যদেশীয় পোশাক, কার্পেট, বর্ডার অলঙ্করণের যে চাতুর্য দেখিয়েছেন তার মূল উৎস আরবি লিপিমালা। ভেরোনার S.Zero গীর্জায় Andrea Mantegna যে দেওয়াল চিত্র অঙ্কন করেন তার স্বর্গীয় দেবদূতের (Angel) হ্যালো অর্থ্যাৎ মাথার পিছনের বলয় এবং হাতের ব্যান্ডে কুফীর নকশা রয়েছে । কুফী রীতির ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে পাশ্চাত্যে শিল্পী ল্যাটিন শব্দগুলোকে কুফীকরণ করেছেন। যেমন : ভিনিসিয় শিল্পি Giovanni Bellini। জ্যাকব বেলনী যে ভিনিজিয় বস্ত্রশিল্পি উদ্ভাবন করেন পনের শতকের প্রথমার্ধে তাতে আরবি লিপিকলার কার্তুশ (Cartouche) রয়েছে।

ফ্লোরেন্সের Uffrizi গ্যালারীতে সংরক্ষিত জ্যাকব বোলনীর একটি চিত্রে ভার্জিন মেরী ও শিশু যীশুর যে প্রতিকৃতি রয়েছে তাতে তিরাজ দেখা যায়। তিরাজ আরবি লিপিতে অলঙ্কৃত একধরনের বস্ত্র।

[১৮৪] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৯।
[১৮৫] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৯।

মাদ্রিদের Prado জাদুঘরে সংরক্ষিত সেন্ট ক্যাটলনীয় যে প্রতিকৃতি Fernando Yanez de la Almedine অঙ্কিত করেন তা দেখে একজন মূরীশ পোশাক পরিহিত মহিলা বলে মনে হবে। কিন্তু এ চিত্রের প্রধান আকর্ষণ জামার আস্তিন এবং পোশাকের নিম্নাংশে (hem) কুফী রীতির কার্তুশ রয়েছে।

মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের মত স্পেনে চিত্রকলার বা পান্ডুলিপি চিত্রায়ন বিশেষ প্রসারতা লাভ করেনি। কার্পেট নির্মাণে মূরগণ বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারেন নি। আর্নেস্ট কুহনেল বলেন, "বহু ধর্ম নিরপেক্ষ বিষয়ের গ্রন্থে ও ক্ষুদ্রাকার চিত্র সন্নিবেশের সংখ্যা বিরল। সম্ভবত এর কারণ গোঁড়া মতবাদ সম্পন্ন বার্বার আমলে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে যায়। আল-হামরা প্রাসাদের দেয়াল ও ছাদের চিত্রের যুক্তি দিয়ে এ বক্তব্য খন্ডন সম্ভব নয় কারণ এসব চিত্র দেখে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, সেগুলো ছিল বিদেশী শিল্পীদের দ্বারা অঙ্কিত।"[১৮৬] মেসোপটেমীয়, ইলখানি, তৈমুরি, সাফাভি, তুর্কি, মুঘল, ফাতেমীয় চিত্রশালার বিকাশ ঘটে কিন্তু কি কারণে মিনিয়েচার স্পেনে মুসলিম আমলে উৎকর্ষতা লাভ করতে পারেনি তা বলা সত্যিই কঠিন।

ইসলামে ভাস্কর্য বা Three-dimensional art সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হলেও মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র জীবজন্তুর ভাস্কর্য দেখা যায়। উমাইয়া যুগে খিরবাত আল-মাফজারে ভাস্কর্য মূর্তি পাওয়া গেছে। অনুরূপভাবে পারস্যে সেলজুক আমলে স্টাকোয় একটি ভাস্কর্য তৈরি করা হয়েছে তের শতকে। মুঘল আমলে জীবজন্তু বিশেষ করে হাতির প্রতিমূর্তি নির্মিত হয়েছে ফটকের দু'পাশে। এরূপ ভাবে স্পেনেও ভাস্কর্য মূর্তি নির্মিত হয়। খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমান তাঁর স্ত্রী জোহরার জন্য নির্মিত প্রাসাদ মদিনাতুজ্জ জোহরায় সম্রাজ্ঞী জোহরার প্রস্তর মূর্তি নির্মাণ করেন এবং ফটকের পাশে তা স্থাপন করা হয়। এ ধরনের মূর্তির কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে। এগুলোর মধ্যে মানুষ ও জীবজন্তুর মূর্তিই প্রধান। জোহরার মূর্তি ছাড়াও সিংহ এবং একটি হরিণের মূর্তিও পাওয়া গেছে।

আল হামরা প্রাসাদের চত্বরে ফোয়ারার চারিদিকে কয়েকটি সিংহমূর্তি দেখা যাবে যা ফোয়ারার কাজ করছে। কর্ডোভায় ও অন্যান্য শহরে অনেক উদ্যান তৈরি করা হয় এবং এ সমস্ত উদ্যানের জন্য অনেক উদ্যান ভাস্কর্য মূর্তি বা Garden Sculpture শিল্পিগণ প্রস্তুত করেন। ব্রোঞ্জের বা অন্যকোন ধাতুতে নির্মিত মূর্তি যেমন আরবদের দান (Incense burner) ঢালাই করে করা হতো। এ সমস্ত দুর্লভ ও চিত্তাকর্ষক মূর্তিগুলো প্রস্রবন বা বাগানে শোভা পেত। ভাস্কর শিল্পি অত্যন্ত দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে ভাস্কর্য মূর্তি তৈরি করতেন। এগুলোর উপর আরবি বাণী কুফী রীতিতে উৎকীর্ণ থাকতো। এ সমস্ত মূর্তির চোখ তৈরি করা হতো মূল্যবান মনিমুক্তা দিয়ে। এ ধরনের অনেক ভাস্কর্য নিদর্শন বিভিন্ন

---

[১৮৬] আর্নেস্ট কুহনেল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৯।

জাদুঘরে সংগৃহীত রয়েছে। S.P.Scott বলেন, "এগুলোর নির্মাণ কৌশল বর্তমান যুগের সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন অপেক্ষা মোটেই নিম্নমানের ছিলনা।"[১৮৭] ("The mechanical execution is not inferior indelicacy to that of the best examples of the present age".)

আর্নেস্ট বলেন, "ব্রোঞ্জের সাহায্যে ভাস্কর্য শিল্প নিদর্শন তৈরির জন্যও এসময় কিছুটা চেষ্টা করা হয়। একই ধরনের অলঙ্করণ বিশিষ্ট এসময়ের যে দু'টি কলসীর সন্ধান পাওয়া গেছে আল হামরা প্রাসাদের সিংহ ফোয়ারা ফটকের সাথে তার বিশেষ তফাৎ নেই।"[১৮৮]

পাথরে খোদাই করে বা লিখে যে নক্শা করা হয় তাকে খোদাই শিল্প (Glyptic art) বলে। মূর শিল্পিগণ এক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তাদের খোদিত প্রস্তর গুলো লেখার তীক্ষ্মতা, নমুনার অঙ্গ সৌষ্ঠব এবং প্রসাধন প্রণালির সৌন্দর্য ও মাধুর্যের জন্য বিখ্যাত। এদের অধিকাংশ অঙ্গুরীয়ক, কবচের সংখ্যা ও কম নয়। প্রাচীনকালের কোন ভাষারই ক্যামিও (cameo) শব্দটির সন্ধান পাওয়া যায় না। এটি আরবি কমহ (কুঁজ বা প্রক্ষেপন) শব্দ থেকে নিষ্পন্ন বলে বোধ হয়। এতদসত্ত্বেও আরবেরা সম্ভবত ক্যামিও পদ্ধতি অবলম্বন করেননি। কিন্তু এরূপ অনুমানের কোন সঙ্গত কারণ নেই। ক্যামিও শব্দের অর্থ পাথরে উঁচু করে কোন ধরনের নক্শা যা মেডালের মত মনে হয়।

কালের স্বাক্ষর ও মুসলিম ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হিসেবে স্পেনে আট শতক থেকে পনের শতক পর্যন্ত সাতশত বছর ধরে অসংখ্য ইমরাত তৈরি হয়েছে; যার অধিকাংশ বর্বর ও মুসলিম বিদ্বেষী খ্রিস্টানগণ ধ্বংস করে ফেলেছে। একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, উত্তর আফ্রিকা ও আন্দালুসিয়ায় মুসলমানগণ অসামান্য স্থাপত্যিক মেধা ও কারিগরি জ্ঞান প্রদর্শন করেছিলেন। মূর স্থাপত্য বিদ্যাকে মোটামুটি তিন পর্যায়ে ভাগ করা যায়। (ক) স্পেন বিজয় থেকে শুরু করে উমাইয়া খিলাফত পর্যন্ত; (খ) খিলাফতের পতনের পর বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ; (গ) নাসিরিয় বংশের আমলে স্থাপত্য কর্ম।

প্রথমটিকে উন্মেষের, দ্বিতীয়টিকে পরিবর্তন ও অগ্রগতির এবং সর্বশেষ পর্যায়ে গ্রানাডায় চরমোন্নতির যুগ বলা হয়। মুসলিম স্পেনের যে সমস্ত ইমারত এখনও অক্ষত রয়েছে মূল্যায়ন ও স্থাপত্যিক গুরুত্ব নিরূপনের জন্য শ্রেণিবিভাগ প্রয়োজন। সমগ্র মুসলিম বিশ্বে স্থাপত্যকীর্তিগুলো প্রাথমিকভাবে ধর্মীয় (Religious) এবং জাগতিক (Secular) পর্যায়ে ভাগ করা যায়। ধর্মীয় ইমারতের মধ্যে মসজিদ,

---

[১৮৭] S.P. Scott, *Op. cit.*, Vol.III, P. 576.

[১৮৮] আর্নেস্ট কুহনেল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০।

সমাধি, মাদ্রাসা, মিনার প্রভৃতি অন্তর্ভূক্ত রয়েছে; অন্যদিকে জাগতিক ইমরাতসমূহকে দূর্গপ্রাসাদ, বেসামরিক ভবন, উদ্যান প্রাসাদ, তোরণ, সরাইখানা, পুল, স্নানাগার, চৌবাচ্চা ইত্যাদি।[১৮৯]

একথা বলা যায় যে, স্পেনে মুসলিম স্থাপত্যের সূচনা হয় উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠার পর অর্থ্যাৎ ৭১১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৭৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্পেনে মুসলমানদের স্থাপত্যরীতির কোন নিদর্শন পাওয়া যায়নি; যদিও একথা বলা উচিত হবেনা যে, মুসলিম সেনাপতি ও শাসকবর্গ নামাজগৃহ বা মুসাল্লা নির্মাণ করেননি। সম্ভবত সেগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। উল্লেখ্য যে উল্লেখিত সময়কালে দামেস্কের উমাইয়া খলিফার অধীনে কমপক্ষে বিশজন প্রাদেশিক শাসনকর্তা শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে তারা গড়ে দুই থেকে আড়াই বছর শাসন করেন। রাজনৈতিক অচলাবস্থা ও নৈরাজ্য অর্থনৈতিক সঙ্কট এবং পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে প্রাক-আমিরাত যুগেই স্থাপত্যকলার উন্মেষ ঘটেনি। তখন বন্দর নগরী সেভিলে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৯০]

পরবর্তী পর্যায়ে চতুর্থ গভর্নর আস সামাহ কর্ডোভায় ৭১৯ খ্রিস্টাব্দে রাজধানী স্থানান্তর করেন। এরপর থেকেই কর্ডোভা একটি তিলোত্তমা নগরীতে রূপান্তরিত হতে থাকে। কর্ডোভা জামে মসজিদ, সেভিল জামে মসজিদ, সেভিলের জিরাল্ডা, টলেডো জামে মসজিদ, সারাগোসার মসজিদ, সেভিলের আল কাযার ইমারত, সারাগোসার আল জাফরিয়া প্রাসাদ, সেভিলের স্বর্ণবুরুজ, কর্ডোভার মদিনার আল যাহরা, গ্রানাডার আল হামরা প্রাসাদ তৎকালীন অন্যতম বিখ্যাত স্থাপত্য সমূহ।

৭১১ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম বাহিনী স্পেন অধিকার করে কর্ডোভা নগরীতে অবস্থিত সেন্ট ভিনসেন্ট গির্জার অর্ধেক অংশে প্রথম মসজিদ স্থাপন করেন। বাকি অংশ গির্জা হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম আব্দুর রহমান (৭৫৬ খ্রিস্টাব্দ-৭৮৮ খ্রিস্টাব্দ) স্পেনে উমাইয়া বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। কর্ডোভা মসজিদটিতে স্থান সংকুলান না হওয়ায় তিনি গির্জার অংশ ক্রয় করে নিয়ে নতুন পরিকল্পনায় একটি বিশালাকার মসজিদ নির্মাণ করেন।

বর্তমানে আদি কর্ডোভা মসজিদটি পুন:পুন: সংস্কার, পরিবর্ধন ও পুনর্নির্মাণের জন্য সঠিকভাবে চিহ্নিত করা খুবই কঠিন। সেন্ট ভিনসেন্ট নামে ভিসিগথিক গির্জা মসজিদে রূপান্তরিত হয়। ৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম আব্দুর রহমান কর্ডোভার আদি মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। এই ইমারতটি নির্মাণে ব্যয় হয় ৮০,০০০ দীনার এবং এক বছর সময় লাগে। লিওয়ানের পরিমাণ ১২১ ফুট × ২৪১

---

[১৮৯] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০২।
[১৯০] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০২।

ফুট। এটি দশটি খিলানরাজি দ্বারা এগারোটি আইলে বিভক্ত ছিল। প্রতি খিলান সারিতে এগারোটি খিলান ছিল এবং এগুলো কিবলার দিকে লম্বালম্বিভাবে নির্মিত হয়। এই মসজিদের অন্যতম আকর্ষণ হচ্ছে মার্বেলের তৈরি সরু ও মসৃণ স্তম্ভ; যার ক্যাপিটাল করিন্থিয়ান এবং ক্যাপিটালের উপর একটি প্রস্তর খন্ডের (abace) উপর থেকে নির্মিত গোলাকার অশ্বনালাকৃতি খিলান।[১৯১]

ছাদ উঁচু করার জন্য গোলাকার স্তম্ভের উপর চতুষ্কোনী পাথর খন্ড বা পিলার সংযোগ করা হয়েছে, যা থেকে নিচের খিলানের ঠিক উপরে আর একটি অর্ধবৃত্তাকার খিলান তৈরি করা হয়েছে। উত্তরের খিলান গাঁথনী করে তার উপরে কাঠের ছাদ নির্মাণ করা হয়। বলাই বাহুল্য যে, এই খিলান রাজী স্থাপত্যের শ্রীবৃদ্ধিই করে নি বরং লিওয়ানটিকে সুদৃঢ় করেছে। কায়রোয়ান মসজিদের অনুকরণে কর্ডোভা মসজিদে ও অশ্বনালাকৃতি খিলান ব্যবহৃত হয়েছে। একটির পর একটি করে একবার ইট ও একবার পাথর দিয়ে খিলান নির্মিত হয়। মেঝে থেকে ছাদের উচ্চতা ৩২$\frac{১}{৪}$ ফুট। নিচে সমতল ছাদ আছে এবং তার উপরে এগারটি টালির চালা ছাদ (gable roof) দেখা যাবে। সীসা দ্বারা মজবুত ও ওয়াটার প্রুফ করা হয়েছে। পানি বের করার জন্য নালা বা গাথাইল নির্মিত হয়।

প্রথম আব্দুর রহমানের সময় মসজিদটিতে ২৪০ ফুট × ১৯৭ ফুট অঙ্গন ছিল ; কিন্তু এর চারদিকে কোনো রিওয়াক ছিলনা। কিবলা দিক ব্যতীত অন্য তিন দিকে প্রবেশ তোরণ ছিল; উত্তর দিকে ক্ষমতা তোরণ (Puerta del perdon), পশ্চিম দিকে অধিকর্তা তোরণ (Puerta Delos Deanes) এবং পূর্ব দিকে সেন্ট ক্যাথেরিন তোরণ। এ ছাড়া পশ্চিম দিকে সেন্ট স্টিফেন তোরণ নামে আর একটি দরজা ছিল। কর্ডোভা মসজিদটির বহি:প্রাচীরে চতুষ্কোণী বুরুজ ছিল।

প্রথম আব্দুর রহমানের পুত্র প্রথম হিশাম (৭৪৮ খ্রিস্টাব্দ) কর্ডোভা মসজিদটির সংস্কার ও সংযোজন করেন। মসজিদের অসম্পূর্ণ কাজ সমাধান করা ছাড়াও ৪০ ফুট উঁচু একটি মিনার নির্মাণ করেন। এটি ছিল চতুষ্কোনী।

প্রথম হাকামের পুত্র দ্বিতীয় আব্দুর রহমান (৮২২ খ্রিস্টাব্দ- ৮৫৬ খ্রিস্টাব্দ) মসজিদটি দক্ষিণ কিবলার দিকে সম্প্রসারণ করেন। সম্প্রসারিত অংশের পরিমাণ ১৫০ হাত প্রশস্ত এবং ৫০ হাত গভীর। এই অংশে ৮০টি স্তম্ভ ছিল। প্রথম আব্দুর রহমানের নির্মিত দশটি স্তম্ভরাজী সম্প্রসারণ করে প্রতি সারিতে

[১৯১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৩।

আটটি স্তম্ভ সংযাজন করা হয়। তিনি হিশামের মিনারে একটি কিয়স্ক এবং উপরে উঠার সিঁড়ি নির্মাণ করেন।[১৯২]

দ্বিতীয় আব্দুর রহমানের পুত্র প্রথম মুহম্মদ (৮৫২ খ্রিস্টাব্দ- ৮৮৬ খ্রিস্টাব্দ) পিতার অসম্পূর্ণ কাজ সম্পন্ন করেন এবং পশ্চিম দিকে সেন্ট স্টিফেন নামে আর একটি তোরণ নির্মাণ করেন। সংস্কার অলংকরণের ফলে কর্ডোভা মসজিদের অঙ্গ সৌষ্ঠব বৃদ্ধি পায়।

প্রাসাদ থেকে মসজিদে অবস্থিত মাকসুরায় যাওয়ার জন্য আব্দুল্লাহ (৮৮৮ খ্রিস্টাব্দ- ৯১২ খ্রিস্টাব্দ) পশ্চিম দিকের দরজার সাথে একটি পাকা রাস্তা তৈরি করে কর্ডোভা মসজিদের পুনর্নির্মাণে তৃতীয় আব্দুর রহমান (৯১২ খ্রিস্টাব্দ- ৯৬১ খ্রিস্টাব্দ) অসামান্য অবদান রেখেছে। তিনি মসজিদের সম্মুখভাগ বা ফাসাদ পুনর্নির্মাণ করেন এবং হিশামের মিনারটি ৯৫১ খ্রিস্টাব্দ- ৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ভেঙ্গে ৭২ হাত উঁচু করে পুন: সংস্কার ও সংযোজন করেন। পাথরের তৈরি এই চতুষ্কোণী মিনারটিতে তিনি দুটি সিঁড়ি নির্মাণ করেন। মিনারটিতে গম্বুজ ছিল এবং চূড়াটিতে সোনা রূপার তৈরি আপেলের নক্শা ছিল। অলংকরণের দিক দিয়ে বিচার করলে মসজিদটি সুশোভিত ও সুষমামন্ডিত করেন তৃতীয় আব্দুর রহমান।[১৯৩]

কর্ডোভা মসজিদের সংস্কারে দ্বিতীয় হাকাম (৯৬১ খ্রিস্টাব্দ-৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ) কর্ডোভা মসজিদের সংস্কারে দ্বিতীয় হাকাম বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেন। তিনি প্রাসাদ থেকে মসজিদ পর্যন্ত তৈরি রাস্তাটি ভেঙ্গে দক্ষিণ দিকে সম্প্রসারিত করেন। তিনি একটি নতুন প্রাসাদ তোরণ নির্মাণ করে মসজিদ থেকে প্রাসাদ পর্যন্ত যাতায়াতের ব্যবস্থা করেন। হাকামের অপর একটি অসামান্য কীর্তি হচ্ছে মিহরাব। ৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত এই মিহরাব খুবই আকর্ষণীয়। দ্বিতীয় হাকাম মিহরাবের সামনে একটি মাকসুরাও নির্মাণ করেন। অর্ধ আটকোণী মিহরাবের দুই পাশে দু'টি চ্যালেন আছে। মিহরাবের পরিকল্পনা করা হয়েছে খাঁজ কাটা (cusped) খিলান দ্বারা এবং একটি ঝিনুকের আকৃতিতেও আচ্ছাদন (rupola) দ্বারা আবৃত। কুপুলাটি রিবড অথবা গ্রইন্ড (ribbed or groined) ভল্ট দ্বারা নির্মিত। চতুষ্কোণী এলাকা থেকে অর্ধকোণী এলাকায় নিয়ে যেতে আটটি খিলান সম্মিলিতভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

---

[১৯২] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৩।
[১৯৩] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৩।

কর্ডোভা মসজিদের সর্বাপেক্ষা সম্প্রসারণ হয় দ্বিতীয় হিশামের (৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ-১০০৯ খ্রিস্টাব্দ) রাজত্বকালে। বিশেষ করে তাঁর মন্ত্রী ইবনে আল মনসুরের প্রচেষ্টায়। দক্ষিণ দিকে গুয়াডালকুইভার নদী পর্যন্ত বিস্তৃত থাকায় মসজিদটির সম্প্রসারণ করা হয় পূর্ব দিকে। মনসুর মসজিদে আরও ৮টি আইল নির্মাণ করেন এবং এর ফলে মসজিদের প্রস্থ ২৩০ হাতে দাঁড়ায়। প্রতি আইল ১০ হাত প্রশস্ত ছিল। আইলের সংখ্যা দাঁড়ায় উনিশে। আড়াই বছরে ৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ- ৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে এই কাজ সম্পন্ন হয়।

কর্ডোভা মসজিদ একটি বিশাল আয়তাকার এলাকা জুড়ে নির্মিত হয় এবং এর পরিমাপ দাঁড়ায় ৫৮৫ ফুট উত্তর দক্ষিণে এবং ৪১০ ফুট পূর্ব-পশ্চিমে। পীত রঙের পাথর দিয়ে নির্মিত মসজিদের দেওয়াল ৩৪ ফুট উঁচু এবং উপরে কাঙ্গুরা রয়েছে। দেওয়ালের চারপাশে বুরুজগুলো খুবই সুদৃশ্য ও সুদৃঢ়। অঙ্গনের তিন দিকে রিওয়াক রয়েছে। মসজিদের ফাসাদে সতেরটি অশ্বনালাকৃতি খিলান দেখা যায়। যার একটি ছাড়া অন্যগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। নামাজগৃহ লিওয়ানে প্রবেশের জন্য একটি গেট রয়েছে। লিওয়ান ১৮টি খিলান দ্বারা ১৯টি আইলে বিভক্ত। আইলগুলো কিবলার দিকে লম্বালম্বিভাবে স্থাপিত হয়েছে। পঞ্চদশ শতকে এই মসজিদের অভ্যন্তরে একটি গির্জা নির্মিত হয়।[১৯৪]

অলংকরণের দিক দিয়ে কর্ডোভা মসজিদ অতুলনীয়। নীল, গোলাপি, কালো, ধূসর রঙ্গের মার্বেল গ্রানাইটের তৈরি প্রায় এক হাজার স্তম্ভ মসজিদের অভ্যন্তরে একটি মনোরম দৃশ্যের সৃষ্টি করে। কোনোটি গোল, আবার কোনোটি পেঁচাল ও শিরাল ধরনের স্তম্ভ রয়েছে। করিন্থিয় এবং মিশ্রিত ধরনের শীর্ষের (ক্যাপিটাল) ব্যবহার দেখা যায়। স্তম্ভের উপরের খিলান, লাল ও ফিকে পীত রঙের জেব্রা ডোরা কাটা। দ্বিতীয় হাকামের মিহরাবটি একটি আয়তাকার ফ্রেমে আবদ্ধ এবং মোজাইক দ্বারা অলঙ্কৃত এর উপর খাঁজ কাটা খিলানের (Sta;actote) ব্যবহার দেখা যায় এবং দুই পাশে দুই জোড়া গোলাকার স্তম্ভ আছে। এটি লতাপাতা ও কুফী লিপি দ্বারা অলংকৃত। মিহরাবের সামনে খাঁজকাটা গম্বুজ রয়েছে।[১৯৫]

স্থাপত্য রীতির দিক থেকে মুসলিম শিল্পকলায় অনবদ্য অবদান রেখেছে কর্ডোভা মসজিদ। স্থাপত্য শৈলী ও অলঙ্করণের সংমিশ্রণে নির্মিত এই ইমারতটি স্থানীয় মুসলিম স্থাপত্যের অনন্য কীর্তি। এটিতে প্রাচ্য অর্থ্যাৎ মেসোপটেমীয় এবং প্রতীচ্য অর্থ্যাৎ রোমীয় বাইজান্টাইন সিরিয় উপাদানের সংমিশ্রণ দেখা যায়।

---

[১৯৪] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৪।

[১৯৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৫।

চালাছাদ, গোলাকার ও চতুষ্কোণী স্তম্ভের পর্যায়ক্রমে ব্যবহার, বিশেষ করে রিওয়াকে, তিনটি প্রবেশ পথে প্রভৃতিতে যেমন উমাইয়া প্রভাব রয়েছে; অন্য দিকে বুরুজ খাঁজকাটা খিলান, কিবলার দিকে লম্বালম্বিভাবে স্থাপিত খিলান সারিতে আব্বাসীয় রীতির প্রতিফলন দেখা যায়। দামেস্কের মসজিদে ব্যবহৃত অশ্বনলাকৃতি খিলান কর্ডোভা মসজিদে দেখা যাবে। D. T. Rice বলেন, "এই মসজিদের আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো বিভিন্ন ধরনের খিলান; যেমন বহু খাঁজ (multifoil), তিনটি খাঁজ (trefoil), পাঁচটি খাঁজ (Cinquefoil), অর্ধ গোলাকার, কৌণিক ও অশ্বনলাকৃতি। এছাড়া, দুই স্তরে নির্মিত খিলান রাজি ও সুশোভিত।"[১৯৬]

কর্ডোভা মসজিদের প্রভাব স্পেনীশ ও উত্তর আফ্রিকার মুসলিম স্থাপত্যেই প্রতিভাত হয়নি; বরং মধ্যযুগীয় ইউরোপের খ্রিস্টান স্থাপত্যেও এর প্রভাব দেখা যায়। কর্ডোভার মদিনাত আজ জাহ্‌রা, গ্রানাডার আল হামরা, এবং সেভিলের আল কাযার ও জিরাল্ডা ছাড়াও উত্তর আফ্রিকার রাবাতের সুলতান হাসানের মসজিদ ও তিউনিসিয়ার জামে মসজিদ আয্ যাই তুনে কর্ডোভার জামে মসজিদের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

এছাড়া ইউরোপীয় গথিক স্থাপত্য রীতির উন্মেষে গ্রইন ভল্ট ও খাঁজকাটা কৌণিক খিলানের প্রভাব কর্ডোভা মসজিদ থেকে এসেছে। ভায়ার ডট নরফোকের গির্জায় কর্ডোভার মসজিদের ব্যবহৃত বহুপত্র বিশিষ্ট খিলানের উল্লেখ করেন। এ ধরনের স্থাপত্যিক উপকরণ সলসবেরী গির্জার প্রবেশপথেও লক্ষণীয়। শিরাযুক্ত ভল্টের ব্যবহার প্রসঙ্গে বলা যায় যে, কর্ডোভার মসজিদের প্রভাব ফ্লোরেন্সের সেন্ট লরেঞ্জোয় রয়েছে। পেভসোনার এ কথা উল্লেখ করেন। পি.কে.হিট্টি বলেন, "Another contribution of Arab cordova which was truly original was the system of vaulting based on intersecting arehes and visible intersecting ribs."[১৯৭]

সেভিলে আল মুওয়াহিদদের আমলে একটি সুন্দর মসজিদ নির্মিত হয়। ১১৪৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২৬৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মুওয়াহিদগণ রাজত্ব করেন। সেভিলে প্রতিষ্ঠিত মসজিদটি দৈর্ঘ্য ৪২৯ ফুট এবং প্রস্থে ১২০ ফুট। কায়রোয়ান জামে মসজিদের অনুকরণে এর ভূমি নক্‌শা ছিল ইংরজি অক্ষর T এর মতো। উত্তর দক্ষিণে মোট সতেরটি আইল ছিল যা কিবলার দিকে সম্প্রসারিত। কিবলার দিকে একটি আছে যাতে পাঁচটি গম্বুজ দেখা যাবে। সেভিল খ্রিস্টানদের দখলে চলে গেলে তারা এই সুন্দর মসজিদটি ধ্বংস করে এবং এর উপর গির্জা নির্মাণ করে। শুধুমাত্র মিনারটি অক্ষত অবস্থায় আছে, যা বর্তমানে গির্জার ঘন্টা বাজানোর জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। এই টাওয়ারটি জিরাল্ডা নামে পরিচিত। যেখানে লিওয়ান

---

[১৯৬] D.T.Rice, *Op.Cit.*, P.77-78.

[১৯৭] P.K.Hitti, *Op.Cit.*, P. 597.

ছিল সেটি বর্তমানে গির্জার খোলাচত্ত্বর। এটি Palio de los Naranjes নামে পরিচিত। গির্জার অংশ হলেও জিরাল্ডা মূর স্থাপত্যের অনুপম নিদর্শন। ১১৮৪ খ্রিস্টাব্দে সেভিলের জামে মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয় এবং ১১৯৮ খ্রিস্টাব্দে এর কাজ সমাপ্ত হয়।[১৯৮]

বর্তমানে ঐতিহ্যবাহী মুসলিম স্থাপত্য কীর্তির মধ্যে যে সমস্ত নিদর্শন এখনও খ্রিস্টানদের ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রক্ষা পেয়েছে তার মধ্যে সেভিলের জিরাল্ডা অন্যতম। যদিও বর্তমানে এটি গির্জার অংশ হিসেবে ঘন্টা টাওয়ার (Bell tower) হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে তবুও সেভিলের আল মুওয়াহিদ রাজবংশের অসাধারণ কীর্তি হিসেবে স্বীকৃত। মূলত সেভিলের জামে মসজিদের (১১৮৪ খ্রিস্টাব্দ-১১৯৮ খ্রিস্টাব্দ) অংশ হিসেবে জিরাল্ডা বা মিনার কালের সাক্ষী বহন করে রয়েছে। ইটের তৈরির এ মিনারটি প্রায় ২৪৩$\frac{৩}{৪}$ফুট উঁচু এবং ৬৮$\frac{৩}{৪}$বর্গফুট চতুষ্কোণাকার ভিত্তির উপর নির্মিত। আরব ঐতিহাসিকগণ চারটি বড় আকারের স্বর্ণমন্ডিত ব্রোঞ্জের আপেলের কথা উল্লেখ করেন, যা শীর্ষদেশে শোভা পেত। বর্তমানে এর স্থান দখল করেছে গির্জার টাওয়ার।[১৯৯]

১৫৬০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এ স্থানে মিনারের উপর ঘন্টাঘর নির্মিত হয়। এখানে কর্ডোভায় স্থাপিত হারনাম রুইয় পঁচিশ ঘন্টা বিশিষ্ট এ ঘন্টা ঘর (belfry) নির্মাণ করেন। বর্তমানে ঘন্টাঘর ৯৮ ফুট উঁচু অর্থ্যাৎ মিনার ও ঘন্টা ঘরসহ জিরাল্ডার মোট উচ্চতা ৩২৮ ফুট। মিনারের দেওয়াল ৮ ফুট মোটা এবং অত্যন্ত সুকৌশলে নির্মিত এবং অভ্যন্তরে উপরে উঠার জন্য পেছনে সিঁড়ি নির্মিত হয়। এটি এত প্রশস্ত ছিল যে, গাধা অথবা খচ্চরে চড়ে উপরে উঠা যেত। অভ্যন্তরে আলো প্রবেশের জন্য লম্বালম্বি জানালা মিনারে শোভা পাচ্ছে।

জিরাল্ডায় স্থাপত্যিক ও আলঙ্কারিক রীতির অসাধারণ সমন্বয় ঘটেছে। সেভিলের জিরাল্ডার দেওয়াল প্রসাধনে (অলঙ্করণ) মূর শিল্পিদের প্রতিভার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। বিরাট আকার ও অতুলনীয় সৌন্দর্যের দরুন প্রাচ্যের দূরতম দেশে ও এর খ্যাতি বিস্তৃত হয়। এটি স্পেনের মুসলিম স্থাপত্যের গৌরব। বহি:ভাগের প্রসাধনের উপকরণ মিনাদার (মিনা করা) টালির ব্যবহার এই উভয় সৌধেই প্রথম দেখতে পাওয়া যায়। তবে জিরাল্ডার টালি মসজিদ অপেক্ষা অধিক উৎকৃষ্ট। বিখ্যাত মূর মান-মন্দিরের অতি অল্প সংখ্যক টালিই এখন অবশিষ্ট আছে। কিন্তু তা হলেও অক্ষত অবস্থায় এ মহাড়াম্বর

[১৯৮] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৬।
[১৯৯] *তদেব*।

পূর্ণ বুরুজের ঊর্ধ্বদেশ উজ্জ্বল টালিতে সুশোভিত হয়ে কিরূপ সুন্দর দেখাত তা অনুমান করা হয়। আন্দালুসিয়ার সূর্যকিরণে তাদের মসৃণ উপরিভাগ মনি মুক্তার মত চক চক করত।

মিনারটির নিম্নাংশ সাদামাটা হলেও জনালাগুলোকে আয়তাকার ফ্রেমের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে অলংকৃত করা হয়েছে। এ জানালাগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য খাঁজ করা খিলান এবং এর উপর কৃত্রিম খাঁজ খিলানের (false arch) নক্শা। মুওয়াহিদদের আমলে পলেস্তারার উপর নক্শা সর্বাধিক ব্যাপকতা লাভ করে অলঙ্করণ রীতি দেখা যাবে। এ দুই প্রাসাদে লতাপাতা, পুষ্প, গাছ গাছড়া ও জ্যামিতিক নক্শা সম্বলিত (arabesque) অতি মনোরম। মূর অলঙ্করণ রীতি খ্রিস্টান আমলে ইমারতের নক্শাবলীকে প্রভাবান্বিত করে। উদাহরণস্বরূপ সেন্ট ক্যাথারীন এবং সেন্ট মার্কের গির্জার টাওয়ারগুলোর কথা বলা যায় সেভিলের জিরাল্ডা মুসলিম আমলে মান মন্দির হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

খ্রিস্টান আমলে ষোল শতকে ঘন্টা ঘরের চূড়ায় একটি Weather Colck বা দিক নির্ণয় যন্ত্র স্থাপিত হয়। স্পেনীশ ভাষায় এর নাম হচ্ছে Giraldillo. জিরাল্ডা প্রসঙ্গে S.P. Scott বলেন, “মানব প্রতিভা অদ্যাপি এ শ্রেণির এরূপ সুন্দর ও জমকালো সৌধ নির্মাণ করতে পারেনি।”[২০০] (“It (Giralda) is the most imposing and beautiful ledifice of its kind that has ever been deviesed by the genius of men.”)

চতুষ্কোণাকার পরিকল্পনার উপর ক্ষুদ্রাকৃতি মারদুনের মসজিদ নির্মিত হয় ৯৯০ খ্রিস্টাব্দে অভ্যন্তরে নয়টি বর্গাকার এলাকা রয়েছেন এবং প্রতিটি এক একটি খাঁজ কাটা গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। গম্বুজ নির্মাণে কর্ডোভা মসজিদে ব্যবহৃত কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছে। অর্থ্যাৎ Intersecting ribs যা পরস্পর ছেদকারী । দুর্ভাগ্যবশত এ মসজিদটি একটি গির্জায় রূপান্তরিত হয়েছে।

মূর শাসিত স্পেনের সমগ্র অঞ্চলেই মসজিদ স্থাপিত হয় ধর্মীয় প্রয়োজনে, যদিও বহু মসজিদ ফার্ডিন্যান্ড ও ইসাবেলার ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তির জন্য ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে অথবা গির্জায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। সারা গোসায় নির্মিত চত্ত্বর বিশিষ্ট একটি মসজিদ ইবনে জাফর মুকতাদির (১০৪৯ খ্রিস্টাব্দ-১০৮০ খ্রিস্টাব্দ) কর্তৃক নির্মিত হয়।

জাগতিক স্থাপত্য সমূহের মধ্যে সেভিলের আল কাযার এবং গ্রানাডার আল হামরা। এগুলোর অফুরন্ত এবং অপরূপ অলঙ্করণ সহ স্থাপত্য শিল্পের অসাধারণ নিদর্শন হয়ে রয়েছে। আন্দালুসিয়ার রাজপ্রাসাদ

[২০০] S.P.Scott, *Op.Cit.*, Vol.III, P.319.

হিসেবে পরিচিত আল কাযার বিভিন্ন শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়। কর্ডোভা, টলেডো এবং অন্যান্য শহরে নির্মিত আল কাযারগুলোর মধ্যে নিঃসন্দেহে সেভিলের আল কাযার বিশেষভাবে আকর্ষণীয় এবং এখনও কালের স্বাক্ষর হিসেবে অক্ষত রছে। সেভিলের আল কাযারের ইতিহাসকে প্রত্নতত্ত্ববিদেরা তিনভাগে ভাগ করেছেন। (১) মুওয়াহিদ যুগ; (২) প্রথম পেড্রোর যুগ (pedro I the Crunel) (১৩৬৪ খ্রিস্টাব্দ- ১৩৬৬ খ্রিস্টাব্দ) যা মুদেজার শিল্পিদের দ্বারা পুন:নির্মিত, (৩) পরবর্তী যুগ। পাপাডোপলো মনে করেন, ৭১২ খ্রিস্টাব্দে আরব অভিযানকারীগণ এখানে একটি দূর্গ নির্মাণ করেন। স্থানটি সম্ভবত রোমান যুগের ধ্বংসপ্রাপ্ত ইমারত।

মুসলমানগণ পরবর্তীকালে বিশেষ করে সেভিলের স্বাধীন রাজবংশ বনু আব্বাদ (১০২৩ খ্রিস্টাব্দ- ১০৯১ খ্রিস্টাব্দ) এর সময়ে আল মুতামিদ (১০৬৮ খ্রিস্টাব্দ-১০৯১ খ্রিস্টাব্দ) এ স্থানে আল কাযার প্রাসাদ নির্মাণ করেন। হিট্টি যথার্থই বলেন যে, "বর্তমানে আল কাযারের সর্বপ্রাচীন অংশ মুওয়াহিদের সময় বারো শতকে টলেডোর কারিগরেরা প্রথম পেড্রোর রাজত্বকালে ১৬৫৩ খ্রিস্টাব্দে আল কাযার পুনর্নির্মাণ করেন। স্পেনে আজ পর্যন্ত যে ইমারত মুদেজার রীতিতে নির্মিত হয়েছে সেভিলের আল কাযার তাদের মধ্যে আকর্ষণীয়। মুসলিম ভূমি নক্শা 'প্যাসিও' (Patio) অর্থ্যাৎ মধ্যবর্তী একটা খোলাচত্ত্বরের চার পাশে কক্ষগুলো নির্মাণের কৌশল আল কাযারে দেখা যাবে। সেভিলের আল কাযার পেড্রোর সময়ে কয়েকটি অংশে বিভক্ত ছিল, যার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে Patio of the maidens azulejo এর ব্যবহার মুসলিম স্থাপত্যিক অলঙ্করণের নিদর্শন বহন করেছে। খাঁজকাটা খিলানের উপর অপূর্ব এ্যারাবেস্ক মোহান্বিত না করে পারেনা । অপর একটি আকর্ষণীয় কক্ষ হচ্ছে Salon of Ambassadors অর্থ্যাৎ কূটনৈতিক প্রতিনিধিবৃন্দের জন্য হল, যাতে সনাতনী স্তম্ভ এবং এ্যারাবেস্ক নক্শা দেখা যাবে। আল কাযারের তৃতীয় কক্ষটি Patio las Maunecas অর্থ্যাৎ পুতুলদের কোট নামে পরিচিত।"[২০১]

পাপাডোপলো বলেন যে, এ কক্ষ নির্মাণে ধ্বংসপ্রাপ্ত মদিনাতুজ কোবরার প্রাসাদের স্তম্ভ ব্যবহার করা হয়েছে। পরবর্তীকালে আল কাযার প্রাসাদটি গথিক ও রেনেসাঁ যুগের স্থাপত্য রীতিতে পুনর্নির্মিত হয়।

নয় শতকে উমাইয়া শাসকবর্গ মালাগায় রোমান ধ্বংসস্তুপের উপর একটি দূর্গ নির্মাণ করেন। পরবর্তী পর্যায়ে ১০৫৭ খ্রিস্টাব্দে এবং নাসিরী বংশের রাজত্বকালে চৌদ্দ শতকের প্রথমার্ধে এটি আল কাযারে রূপান্তরিত হয়। বর্তমানে ধ্বংস প্রাপ্ত আল কাযার সেভিলের আল কাযারের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়।

---

২০১ P.K.Hitt, *Op.Cit.*, P.595-97.

হিট্রি সেভিল, কর্ডোভা এবং অন্যান্য স্পেনীশ শহরে আল কাযার প্রাসাদ নির্মাণের উল্লেখ করেন। পাপাডোপলো মালাগার আল কাযার সম্পর্কে বলেন, “অভ্যন্তরে গভর্ণরদের প্রাসাদে চিরাচরিত মূরীশ কৌণিক খিলান দেখা যাবে যা স্টাকো রিলিফ দ্বারা অলঙ্কৃত। এখানে গ্রানাডার মতো উদ্যানের প্রতি প্রচন্ড মোহ প্রকাশ পেয়েছে।”[২০২](“In its interior, the palace of the Governors has the usual carved stucco relief work. Here as in Granada the love of gardens is plain to see.”)

বাদাজোয এ ১০০৯ খ্রিস্টাব্দে আল কাযার প্রাসাদ নির্মিত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে স্থানীয় তাইফা সুলতানগণ এটি ব্যবহার করেন। এটির প্রধান আকর্ষণ আল মুওয়াহিদ রীতিতে নির্মিত আট কোণাকার প্যারাপেট দ্বারা সমৃদ্ধ টাওয়ার। পাপাডোপোলো বলেন, “অন্যান্য স্পেনীশ শহরেও মুসলিম প্রাসাদ ও দূর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়, যাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মুশিয়ের ক্যাস্টিলেজারো এবং সিগোভিয়ার আল কাযার।”[২০৩] অর্থ্যাৎ (“Vestiges of similar muslim fortifications and castles are found in numerous other spanish cities as well, most notably the castillejero in Murcia and the Al cazaor in sevogio.”)

তৃতীয় আব্দুর রহমান দশ শতকে আল মেরিয়াতে আল কাযার বা দূর্গ প্রাসাদ নির্মাণ করেন। হাজিব আল মনসুর পরবর্তীকালে পুনর্নির্মাণ করেন। পরিশেষে আল মেরিয়ার স্বাধীন সুলতান হায়য়ান এটির সংস্কার করে তার রাজপ্রাসাদ হিসেবে ব্যবহার করেন। উঁচু পাহাড়ের উপর নির্মিত আল কাযার টাওয়ারগুলো চতুষ্কোণাকার এবং এর উপরিভাগ প্যারাপেট দ্বারা অলংকৃত। এটি সুরক্ষিত করার জন্য পরপর তিনটি বেষ্টনী প্রাচীর নির্মিত হয়। অভ্যন্তরে প্রাসাদ, হাম্মাম, হারেম ও অন্যান্য কক্ষ ছিল। বর্তমানে এটি ধ্বংসপ্রাপ্ত, কেবলমাত্র ভিতটি অক্ষত অবস্থায় রয়েছে।

চৌদ্দ শতকে পুনর্নির্মিত অপর একটি দূর্গ প্রাসাদ দেখা যাবে মালাগায় যার সাথে আল কাযারের সম্পর্ক রয়েছে। আমির প্রথম ইউনুস কর্তৃক নির্মিত এই প্রাসাদটির প্রধান আকর্ষণ সুউচ্চ খিলান সম্বলিত প্রবেশ পথ যা ভল্টের সাহায্যে নির্মিত । এর অভ্যন্তরে একটি মসজিদও নির্মিত হয়। ইটের অলঙ্করণ এ ইমারতের শোভা বৃদ্ধি করেছে।

সারাগোসা শহরের পশ্চিম পার্শ্বে আল জাফরিয়া প্রাসাদ নির্মিত হয়। প্রাসাদটি সম্ভবত তাইফা নৃপতি ইবনে জাফার আল মুকতাদির (১০৪৯ খ্রিস্টাব্দ-১০৮১ খ্রিস্টাব্দ) কর্তৃক নির্মিত হয়। আল মুকতাদির

---

[২০২] Alexandre Papadopoulo, *Islam and Muslim Art* (New York: Harry N Abrams Inc, 1994), P. 504.
[২০৩] *Ibid*, P.581.

শিল্প কলার একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তার স্থাপত্য কীর্তির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দার আস মুরার বা আনন্দ প্রাসাদ। ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে এর একাংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই বিশাল প্রাসাদে মসজিদটি রক্ষা পেয়েছে। বর্গাকার এ ক্ষুদ্র মসজিদটির পরিমাপ ৭৫ ফুট।

এগারো শতকে নির্মিত সারাগোসার এ ক্ষুদ্র মসজিদটির সামনে চত্তর রয়েছে। এ মসজিদের প্রধান আকর্ষণ মার্বেলের স্তম্ভের উপর নির্মিত গম্বুজ যা ৪৫ ফুট উঁচু এবং অলঙ্কৃত মিহরাব। এ মসজিদে বর্গাকার একটি মিনার রয়েছে। এটি ৮০ ফুট উঁচু মিনার যার বুরুজটি মসজিদের সমসাময়িক বলে মনে হয়। অলঙ্করণ প্রসঙ্গে পাপাডোপলো বলেন, "স্টাকোর রিলিফে নক্‌শা অসাধারণ চাকচিক্য সম্পন্ন। এখানে বহু খাঁজ বিশিষ্ট খিলানসমূহ আরও অতিরঞ্জিতভাবে প্রকাশ পায়, যা ভীতির সৃষ্টি করতে পারে।"[২০৪] অর্থ্যাৎ ("The Carved stucco relief decoration is of exceptional richness. Here the polylobate arches became flamboyanti flamelike arabesques that contrast with the very delicate design filling all available space in accord with the aesthetic of the horror vacui.") মিহরাবটি অত্যন্ত আকর্ষণীয়। ওপরে গোলাকার অশ্বখুরাকৃতির খিলানের নিচে অর্ধগোলাকার অবতল মিহরাব (Niche) যার দুপাশে মার্বেলের সংলগ্ন স্তর রয়েছে। উভয় পাশে পরস্পর ছেদকারী দুটি খিলান সৃষ্টি করা হয়েছে। কুফীর নক্‌শা উপরিভাগে শোভা পাচ্ছে। আট কোণাকার ড্রামের উপর পরস্পর ছেদকারী দুটি খিলান দ্বারা একটি স্তর সৃষ্টি করা হয়েছে। যার উপর গম্বুজ নির্মিত হয়। স্পেনের মুসলিম স্থাপত্যিক অলঙ্করণে এ ধরনের বর্ণাঢ্য নক্‌শাকৃত মসজিদ খুবই বিরল। স্তম্ভের শীর্ষ দেশে (Capital) করিন্থিয় রীতির প্রয়োগ সহজেই লক্ষণীয়।

সেভিল বন্দরে প্রতিরক্ষা ব্যূহ হিসেবে গোয়াডাল কুইভার নদীর বাম তীরে একটি বুরুজ নির্মিত হয়। আল মুওয়াহিদ শাসনকর্তা দ্বিতীয় ইউসুফের রাজত্বকালে ১২২০ খ্রিস্টাব্দে গিল্টি করা টালির আচ্ছাদিত এ বুরুজটির নাম স্বর্ণবুরুজ (বুরুজ আল যাহাব)। নদীর অপর পাশে অনুরূপ একটি বুরুজ নির্মিত হয় যার বর্তমানে কোনো অস্তিত্ব নেই। এটি বুরুজের সাথে শিকল দিয়ে পোতাশ্রয়ের যাতায়াত বন্ধ রাখা হত। সেভিলের স্বর্ণবুরুজটি ছিল দ্বাদশ ভুজ বিশিষ্ট। উপরের দু'তলাই নিচের

---

[২০৪] *Ibid*, P.506.

তলাগুলো অপেক্ষা সরু। বর্তমানে ত্রিতলাটি গোলাকার এবং সম্ভবত এটি আঠারো শতকে নির্মিত। বুরুজের গায়ে জানালা, শরছিদ্র ও কুলঙ্গি দ্বারা সুশোভিত।[২০৫]

৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয় আব্দুর রহমান কর্ডোভার পাঁচ মাইল উত্তরে একটি বিশাল ভূ-খন্ডে সম্রাজ্ঞী জাহ্‌রার নামানুসারে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এর নির্মাণ কাজ দ্বিতীয় হাকামের রাজত্বকাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এরপর প্রভাবশালী হাযিব আল মনসুরের শাসনামলে এই বিখ্যাত প্রাসাদটির নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয় রাজনৈতিক কারণে। বাগদাদের আব্বাসিয় দূর্গ প্রাসাদের অনুকরণে মদিনাত আজ জাহ্‌রার ভূমি পরিকল্পনা করা হয়। এর আয়তন ছিল ১৬৬০ গজ × ৪১৫ গজ। চতুর্দিকে পাশ্চাত্য বেষ্টনী ছিল এবং Parapet প্রাচীরের উপরে বুরুজ নির্মিত হয়। বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত এই অনিন্দ্যসুন্দর প্রাসাদটি, যা মূর স্থাপত্যকীর্তির অনুপম নিদর্শন ছিল। দুইশত আশি একর জমির উপর তিন ধাপে নির্মিত। প্রথম ধাপে ছিল খলিফার প্রাসাদ, দ্বিতীয় ধাপে উদ্যান ও প্যাভেলিয়ন, সর্বনিম্ন স্তরে মসজিদ, দফতর, অভ্যর্থনা কক্ষ ও পরিচারক-পরিচারিকাদের বাসস্থান।[২০৬]

আল মাককারী বলেন যে, এ প্রাসাদে চার হাজার তিনশত স্তম্ভ এবং পাঁচশত দরজা ছিল। আরব ঐতিহাসিকদের তথ্য অনুযায়ী এ আকর্ষণীয় ও সুশোভিত প্রাসাদ নির্মাণে বার্ষিক রাজস্বের প্রায় এক তৃতীয়াংশ ব্যয় করা হয়েছে। এ প্রাসাদের আকর্ষণীয় ফোয়ারাগুলোর মধ্যে প্রথমটি বৃহদাকার এবং গিল্টি করা ব্রোঞ্জ নির্মিত মনুষ্য মূর্তি দ্বারা শোভিত ছিল। দ্বিতীয়টি ছিল সবুজ মার্বেলের তৈরি। এটি বারটি পশুপাখির ভাস্কর্য মূর্তি দ্বারা অলংকৃত ছিল এবং এ অপরূপ শিল্পকর্মটি খলিফার শয়ন কক্ষের সম্মুখে রাখা হত। প্রতিটি পশুপাখিই স্বর্ণ মন্ডিত এবং মনিমুক্তা দিয়ে সুশোভিত ছিল। যে সমস্ত পশু পাখি প্রাধান্য পেয়েছে এর মধ্যে সিংহ, কুমীর, হরিণ, ঈগল, শকুন, চিল, বাজপাখি, পায়রা, হাঁস ও মুরগি। একটি খোলা চত্তরের (Patio) চারপাশে কক্ষগুলো নির্মিত হয়। অক্ষত অবস্থায় কর্ডোভায় এটি ছিল চিত্তাকর্ষক ইমারত এবং বিভিন্ন ধরনের অলঙ্করণ মোসাইক রঞ্জিত টালি ও পলেস্তারার নক্‌শা এ প্রাসাদকে মহিমামন্ডিত করেছে।

১০১৩ খ্রিস্টাব্দে বার্বার বিদ্রোহের সময় মদিনাতুজ্জাহ্‌রা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে এর মার্বেলের স্তম্ভ এবং অন্যান্য অংশ, ইট,পাথর অন্যত্র নিয়ে গিয়ে নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে এ ইমারাতটির কিছু অংশ খনন করে আবিষ্কৃত হয়েছে। এই প্রাসাদটি বর্তমানে

---

২০৫ ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ, ২১০।
২০৬ *প্রাগুক্ত*, পৃ, ২১১।

Cordovala Vieja নামে পরিচিত। ঐতিহাসিকদের মতে, আব্দুল্লাহ বিন ইউসুফ, হাসান বিন মুহাম্মদ, আলী বিন সফর ও সুনাইফ এ প্রাসাদের স্থপতি ছিলেন।[২০৭]

হাযিব আল মনসুর (৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ-১০০২ খ্রিস্টাব্দ) ৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে মদিনাতুজ্জাহ্‌রা প্রাসাদের অনুকরণে মদিনাত আল যাহিরা নামে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। বলা যায় যে, এটি ছিল অনুপম সৌন্দর্যমন্ডিত প্রাসাদ।

আট শতকে যে মূর স্থাপত্যের উন্মেষ হয় তা ক্রমবিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গ্রানাডায় চরম উৎকর্ষ লাভ করে। তিলোত্তমা নগরী গ্রানাডা ছিল নাসিরী বংশের আমলে রাজধানী এবং বিশালাকার স্থাপত্যিক প্রকল্পটি প্রথম শুরু করেন প্রথম মুহম্মদ আল গালীব ১২৪৮ খ্রিস্টাব্দে। স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য এবং আলংকারিক চাতুর্য ও বৈপরিত্যে স্পেনের মূর তথা মুসলিম শিল্পকলার উজ্জ্বল ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী নিদর্শন হচ্ছে আল হামরা বা Red palace.

সেভিলের বিরুদ্ধে জয় লাভ করে প্রথম মুহম্মদ ইবনে ইউসুফ ইবনে নসর গ্রানাডায় (১২৩২ খ্রিস্টাব্দ -১৪৯২ খ্রিস্টাব্দ) একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। গ্রানাডা আন্দালুসিয়ায় মুসলিম সার্বভৌমত্বের সর্বশেষ প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। আল হামরা প্রাসাদ দু'শতক ধরে নির্মিত হতে থাকে। মুহম্মদের উত্তরাধিকারীগণ দ্বিতীয় মুহম্মদ, তৃতীয় মুহম্মদ, প্রথম ইউসুফ ও পঞ্চম মুহম্মদ আল হামরার সংস্কার ও সম্প্রসারণ করেন। চরমোন্নতির যুগের অট্টালিকার মধ্যে আল হামরা এখনও কতকটা অবিকৃতরূপে বেঁচে আছে। বিখ্যাত আরব প্রাসাদ মূর স্থাপত্যিকদের শ্রেষ্ঠকর্ম।[২০৮] এটি বিংশতি পুরুষের পরিশ্রমের পরম অবদান। এ মহাড়ম্বর পূর্ণ প্রাসাদ এক অভিনব ও আকর্ষণীয় জাঁকজমকময় স্থাপত্য পদ্ধতির আদর্শ। এটি ডবল প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। নগর থেকে এর উচ্চতম বিন্দু পর্যন্ত উচ্চতা ৫০০ ফুট। আল হামরার বহি:প্রাচীরের অভ্যন্তর ভাগ অন্ডাকৃতি; দৈর্ঘ্যে অর্ধমাইল এবং বৃহত্তম ব্যাস ৭৩০ ফুট। এ স্থানে অসংখ্য কর্মচারী, অনুচর, উজীর, ফকীহ, কাজী, মুফতি, দেহরক্ষী ও সুলতানদের আত্মীয়বর্গ প্রভৃতি বাস করতেন।

আল হামরার ভূমি নক্‌শা প্রাসাদের প্রধান অক্ষ দক্ষিণ পূর্ব থেকে উত্তর পশ্চিম দিকে বক্রাকারে বিস্তৃত। উভয় প্রান্তই ক্রমশ সরু হয়ে এর ভূমি নক্‌শা অনেকটা নৌকার আকার ধারণ করেছে। কুইন্সলেন গ্রানাডার পার্শ্ববর্তী পাহাড়ের অন্যান্য দূর্গের (আল কাযার) পাশে এটি নির্মিত হয়। এটি

---

[২০৭] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ, ২১১।
[২০৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ, ২১২।

প্রধানত প্রথম ইউসুফ (১৩৩৩ খ্রিস্টাব্দ-১৩৫৩ খ্রিস্টাব্দ) এবং পঞ্চম মুহম্মদের (১৩৫৩ খ্রিস্টাব্দ-১৩৯১ খ্রিস্টাব্দ) কীর্তি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এর অংশ বিশেষ বিধ্বস্ত হয়েছে অথবা পরে তা পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। তিন খন্ডে বিভক্ত এই পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে (১) মেশওয়ার, এটা সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল। সুলতান এখানে, বিচার কার্য পরিচালনা করতেন এবং প্রজাবৃন্দের উপঢৌকন গ্রহণ করতেন। (২)দিওয়ান; এখানে থাকতো সিংহাসন কক্ষ। (৩) হারেম, এটি ছিল শাসকের পারিবারিক বাসস্থান।[২০৯]

নাসিরিয় প্রাসাদের সংলগ্ন পরবর্তী পর্যায়ে খ্রিস্টান আমলে পঞ্চম চার্লস (১৫৪৩ খ্রিস্টাব্দ- ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দ) একটি প্রাদাস নির্মাণ করেন। আল হামরা প্রাসাদে রয়েছে ফোয়ারা ও উদ্যানের সমারোহ। নাসিরী প্রাসাদের সামনে রয়েছে সিংহ অঙ্গন, যার মধ্যেভাগে বারোটা প্রস্তর নির্মিত সিংহমূর্তির উপর স্থাপিত হয়েছে একটি ফোয়ারা। এদের প্রত্যেকের মুখ থেকে বেরিয়ে আসা জলের ধারা দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল ফোয়ারা। প্রাসাদের তথাকথিত বিচার কক্ষের ছাদের কারুকার্যও ছিল অসামান্য। চামড়ার উপর আঁকা বীর গাঁথা, শিকারের গল্প ছাড়াও ছিল ডিম্বাকৃতি এক আসনে বসে থাকা ১০ জন শাসকের ছবি। 'আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত বিজয়ী কেউ নয়', আল গালিবের এই জীবনদর্শন ও অনেক জায়গায় খোদাই করা ছিল। অন্যান্য লেখা ছিল নিছকই শোভাবর্ধনের জন্য। এতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেওয়া ভাষণের প্রাতলিপিও ছিল।

আল হামরা প্রাসাদকে জাতীয় প্রতিভার কীর্তিস্তম্ভ, জাতীয় উন্নতির প্রতিমূর্তি, মধ্যযুগের সর্বাপেক্ষা গুণ সম্পন্ন ও উন্নতিশীল জাতির কর্মকেন্দ্র বলে প্রশংসা করা হয়। স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য এবং অলঙ্করণ নক্‌শা মোসাইকের কাজ রঞ্জিত টালীর নক্‌শা, পাথরে খোদাই লিপিকলা, কাঠে খোদাই সবকিছু মিলে আল হামরা এক বিচিত্র নক্‌শার সম্ভার সৃষ্টি করেছে। খিলানের বৈচিত্র্য সহজেই নজরে পড়ে। জ্যামিতিক নক্‌শা, লতাপাতা, অ্যারাবেস্ক, মুকারনাস, স্নানাগার, দেওয়াল চিত্র যাতে প্রতিকৃতি আল হামরা অলঙ্করণের প্রধান বৈশিষ্ট্য। একটি কক্ষে দশজন নৃপতির প্রতিকৃতি অঙ্কিত হয়েছে। এসব চিত্রে ইসলামি ও ইউরোপীয় চিত্ররীতির সমন্বয় দেখা যাবে।

মৃৎপাত্রের উৎকর্ষের সাথে সাথে স্থাপত্য কলার অলঙ্করণ হিসেবে ব্যবহৃত রঞ্জিত টালী মূর শাসিত স্পেনে খুবই আকর্ষণীয় এবং শিল্প মানসম্মত ছিল। স্পেনের মুসলিম শাসনামলে অসংখ্য ইমারত নির্মিত হয়। পি.কে.হিট্টি বলেন, "মৃন্ময় শিল্পের অন্যান্য শাখায় এবং মোসাইক বিশেষ করে রঞ্জিত

---

[২০৯] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ, ২১৩।

টালি এবং নীলাকা টালি (faience) প্রস্তুতকরণে স্পেনীয় মুসলিম স্কুল বিশেষ কৃতিত্বের দাবিদার। স্পেন ও পর্তুগালে এখনও যে ধরনের রঞ্জিত টালি বিশেষভাবে সমাদৃত তা আরবদের অবদান; যার প্রমাণ 'আজুলিজো' শব্দ থেকে মুসলিম স্পেনে রঞ্জিত টালির (glazed tiles) কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়।"[২১০] আজুলিজো এ ধরনের রঞ্জিত বর্গাকার টালি, যা ইমারতের অলঙ্করণে ব্যবহৃত হয়। আর্নেস্ট কুহনেল বলেন, "১৬ শতকের পরে বর্গাকৃতির টালি (আজুলিজম) মাটির মোজাইকের স্থান গ্রহণ করে। এ টালি উৎপাদনের ক্ষেত্রে সেভিলই শীর্ষস্থান অধিকার করে। এ টালির উপর রংয়ের সংমিশ্রণ বন্ধের জন্য কুর্ডো সেকা ও মেকা এ দুটি বিশেষ কৌশল অবলম্বন করা হত। একটিতে মোম মাখানো সূতের সাহায্যে সীমানা চিহ্নিত করে দেওয়া হত এবং অপরটি কৌশলে উত্তরল রেখার সাহায্যে একটি রঙকে আর একটি থেকে আলাদা করা হত।"[২১১]

টলেডোতে তারা আল মুওয়াহিদ রীতিতে ইহুদিদের জন্য দুটি উপাসনালয় নির্মাণ করে। অশ্বখুরাকৃতি খিলান ও বিচিত্র ধরনের নক্শাও দেওয়ালের অলঙ্কার আল মুওয়াহিদ আমলের ইমারতগুলোকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বর্তমানের সান্তামেরিয়া গির্জায় রূপান্তরিত এই ইমারতটিকে দেখে মনে হবে যে স্তম্ভ বিশিষ্ট একটি মসজিদ। এই ইমারতের প্রধান বৈশিষ্ট্য এর জানালা গ্যালারী। টলোডো ছাড়াও সারাগোসায় যে গির্জা নির্মিত হয়েছে তাতেও মুদেজার রীতিতে ছাপ অত্যন্ত প্রকট। আর্নেস্ট কুহনেল বলেন, "সেভিলের বিখ্যাত ক্যাসা দ্যা পিলাটোস এবং অন্যান্য প্রাসাদে এই (মুদেজার) ঐতিহ্যের সাথে রেনেসা যুগের শিল্পরীতির সার্থক সমন্বয়ে ঘটানো সম্ভব হয়।"[২১২]

স্থাপতিক অলঙ্করণে নানা রঙের পাথরের কারুকলায় মূরগণ বিশেষভাবে পারদর্শী ছিল। সাধারণভাবে মোসাইক (Mosaic) নামে পরিচিত এই অসাধারণ পদ্ধতি মূলত অতিপ্রাচীন গ্রিক ও রোমীয় যুগ থেকে এর ব্যাপক প্রসারতা ঘটে। বাইজান্টাইন পদ্ধতি থেকে মূর পদ্ধতি ছিল পৃথক। উপাদান ও নকশার বিন্যাসে এর পার্থক্য লক্ষ্য করা যাবে। স্পেনে মুসলিম শাসনের অবসানের পর যে সমস্ত মুসলমান খ্রিস্টান শাসনাধীনে বসবাস করতো তাদের মুদেজার বলা হয়। শাসক পরিবর্তিত হলেও মুদেজার শিল্পিদের শিল্পগত ও কারিগরি দক্ষতা পূর্বের মতই ছিল। অবশ্য তা খ্রিস্টান পৃষ্ঠপোষকদের অধীনে স্থাপত্য কলার চর্চা অব্যাহত রাখে। টলেডো, সেভিল ও গ্রানাডার পতন হলে শিল্পি, কারিগর, ও স্থপতিগণ তাদের কর্মকান্ড অব্যাহত রাখে এবং মূর স্থাপত্য রীতি মূরদের শাসনের পরেও অম্লান থাকে।

---

[২১০] P.K.Hitti, *Op.Cit.*, P.572.
[২১১] আর্নেস্ট কুহনেল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৭।
[২১২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৭-১২৮।

ইউরোপের মুসলিম স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্যই ছিল ঘোড়ায় খুরের আকারে খিলান। কিন্তু মুসলিম স্থাপত্য প্রসারের আগে থেকেই উত্তর সিরিয়া, টেসিফোন সহ অনান্য অনেক জায়গার স্থাপত্যে এই খিলানের ব্যবহার দেখা গেছে। পরবর্তীকালে অবশ্য কৌণিক খিলানই ইউরোপীয় গথিক স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু ইসলামে এর প্রথম ব্যবহার ও দেখা গেছে দামেস্কের উমাইয়া মসজিদ এবং কাসর-আমরাহ্তে। উমাইয়া মসজিদে অবশ্য অশ্বখুরাকৃতির খিলানের ব্যবহারও ছিল। মুসলিম বিজয়ের আগেও স্পেনের স্থপতিরা এই খিলান ব্যবহার করত। কিন্তু কর্ডোভার মুসলিমরাই প্রথম এর শৈল্পিক ও স্থাপত্যগত উপযোগিতা উপলব্ধি করে এবং সেই অনুযায়ী তাকে উন্নত ও করে। পাশ্চাত্যে এই স্থাপত্যই মূর স্থাপত্য বলে খ্যাত। তবে, কর্ডোভার আরবদের একেবারে নিজস্ব সৃষ্টি হল আড়াআড়ি ধনুকাকৃতি ছাদ এবং দর্শন সাধ্য আড়াআড়ি শিরা।

কর্ডোভার এই স্থাপত্যশৈলী টলেডো এবং উত্তরাঞ্চলের অন্যান্য জায়গায় নিয়ে যাওয়ার কৃতিত্ব মোজারবদের। এখানে ইসলামি স্থাপত্যের সঙ্গে খ্রিস্টান স্থাপত্যের মেলবন্ধন ঘটিয়ে এক অনন্য ধারার জন্ম হয় মুদেজার শিল্পিদের হাতে। ধনুকাকৃতি খিলান ও ছাদের ব্যবহারই ছিল এর বৈশিষ্ট্য। দুই বর্ণের এই মিলিত শিল্প শৈলীই স্পেনের জাতীয় স্থাপত্যে পরিণত হয়। গোটা দেশেই এর নিদর্শন ছড়িয়ে আছে।

অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো কৃষিবিদ্যা, কৃষি পদ্ধতির উন্নয়ন এবং কৃষি উৎপাদনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া উদ্ভাবনে মূরগণ বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। S. P. Scott বলেন, "স্পেনীশ মুসলমানদের কৃষি পদ্ধতি সর্বাপেক্ষা জটিল, অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত এবং এতই নিখুঁত যে কেবলমাত্র মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি দিয়েই তা করা সম্ভব"।[২১৩] অর্থ্যাৎ ("The agricultural system of the Spanish Mohammedans perfect ever devised by the ingemity of man") একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, মূরগন কৃষিক্ষেত্রে অসামান্য সফলতা অর্জন করে কৃষি উৎপাদনে। বহু সুসভ্যজাতি যে কৃষি পদ্ধতিকে নিখুঁত বলে মনে করত মূরদের হাতে তারও উন্নতি সাধিত হয়। তারা মিসরের জলসেচন পদ্ধতি গ্রহণ করে তার বিস্তৃতি সাধন করে।

পারসিকদের চক্র তারা নিজস্ব করে নেয়। নদীর প্রখর স্রোতে দমকল চালিত করে উচ্চতর ভূমিতে জল বিতরণ করত। কোনো কোনো চক্রের ব্যাস পঁচাত্তর ফুট পর্যন্ত হত। টলেডোর একটি চক্র নব্বই হাত উঁচু ছিল। কয়েক বর্গমাইল স্থানে পাঁচশত চক্র দেখতে পাওয়া যায়। সর্বত্রই জলোত্তলক

---

[২১৩] S.P.Scott, *Op.Cit.*, P.320.

ইঞ্জিনিয়ারের কীর্তি; কূপ, বাঁধ, জলাশয়, পয়:প্রণালী স্রোতোদ্বার (Sluice), তলবত্ম (tunnel) ও বক্রনালী যন্ত্র (siphon) দেখা যেত। সাইফনের ব্যবহার প্রসঙ্গে এস.পি.স্কট বলেন যে, ফরাসিদের আটশত বছর পূর্বে আরবেরা বক্রনালী যন্ত্রের মূল তত্ত্ব জানতো। মূরীশ জলোত্তলন (hydraulic system) পদ্ধতিতে তা অত্যন্ত সফলতার সাথে ব্যবহৃত হত। জলসেচ ব্যবস্থার নিদর্শন সমগ্র স্পেনে পাওয়া যায়। জলাধার নির্মাণে মূর কৃষি বিজ্ঞানীগণ বিশেষ দৃষ্টি দেন। অলিকান্তের নিকট অন্ডাকৃতি কৃত্রিম জলাশয় বা basin এর পরিধি ছিল তিন মাইল ও গভীরতা পঞ্চাশ ফুট। ইল্চির ধার ২৬৪ ফুট দীর্ঘ, ১৪২ ফুট উচু এবং গভীরতা ১৫০ ফুট। মূরগণ রোমান পয়:প্রণালীর (aquedeuct) অনুকরণে স্পেনের সর্বত্র ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ম্যাগনেসিসের পয়:প্রনালী ৭২০ ফুট দীর্ঘ ও আটশট্টিটি খিলান দ্বারা নির্মিত।[২১৪]

মূর কৃষকেরা কোন গাছের জন্য কোন সার ব্যবহার করতে হয়, তা জানতো। আমীর ও খলিফাগণ কৃষি ব্যবস্থার উপর বিশেষ সুনজর দিতেন। তারা এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকায় প্রতিনিধি পাঠিয়ে বীজ ও চারা সংগ্রহ করাতেন। পৃথিবীর দূরতম দেশের বৃক্ষলতার উৎপন্ন দ্রব্য এশিয়ার সুসমৃদ্ধ ফল, ইউরোপের জাম (berry) ও বাদাম (nut) এবং আফ্রিকার বেলাভূমির ফলমূল আন্দালুসিয়ায় চালান হত। এছাড়া মূর কৃষকগণ অত্যন্ত নৈপুন্যের সাথে নানা ধরনের ফল উৎপাদন করতেন। যা ইউরোপে বিস্তার লাভ করেছে; এ সমস্ত ফলের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য লেবু, কলা, খেজুর, ডুমুর, ডালিম, আনার, স্ট্রবেরী। অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পোস্তা, বাদাম, ধান, তিল, স্পিনাচ্চ, আস্প্যারাগাস প্রভৃতি।[২১৫]

কৃষি বিজ্ঞানী হিসেবে মূর মনীষীগণ বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। বারো শতকে মূর কৃষিবিজ্ঞানী ইবনুল আওয়ামের গ্রন্থে স্পেনে কৃষিবিজ্ঞানে অগ্রগতি সম্বন্ধে জানা যায়। এ বিশালাকার গ্রন্থে শস্য বপন, ভূমিকর্ষণ, ফলের বাগান চাষ, বিভিন্ন ধরনের গাছ গাছড়ার উৎপাদন ও বংশবৃদ্ধির উপর তিনি গবেষণালব্ধ ও অভিজ্ঞতাপ্রসূত আলোচনা করেন। এমনকি কৃষিকার্যে ব্যবহৃত গৃহ পালিত পশু পালনের পদ্ধতিও তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। তার গ্রন্থে কৃত্রিম উপায়ে ডিমে তা (তাপ) দেওয়া (hatch), বিভিন্ন ধরনের খাদ্য প্রণয়ন যেমন জেলী, সিরাপ, মিষ্টান্ন এমনকি মদ প্রস্তুত করার নিয়মাবলীর বিস্তারিত বিবরণ ইবনুল আওয়ামের দিয়েছেন তার গ্রন্থে। শুধুমাত্র স্পেনের কৃষি ব্যবস্থাই

---

[২১৪] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ, ২১৫।

[২১৫] *তদেব*।

নয়, সিসিলিতে গিয়ে ইবনে আওয়াম সেখানকার কৃষি ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণে তার পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করেন। তিনি বলেন যে, সিসিলিতে জাফরান উৎপাদিত হত। এছাড়া আঙ্গুর বাগানের প্রসারতা লাভ করলে মদ প্রস্তুত সহজতর হয়। মেরিয়ার ঢালু স্থান গুলোতে আঙ্গুর চাষের জন্য উপযোগী ছিল।[২১৬]

পি. কে. হিট্টি বলেন যে, "ইবনে আওয়ামের রচিত 'আল ফিলাহাহ' (Al-Filahah) শুধুমাত্র ইসলামি বিজ্ঞানের অত্যন্ত ও গুরুত্বপূর্ণ নয়। বরং মধ্যযুগের কৃষিবিজ্ঞানের সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ।"[২১৭] ("Not only the most important Islamic but the outstanding medieval work on the subject.")

আংশিক ভাবে গ্রিক ও আরবি গ্রন্থাবলির ভিত্তিতে তিনি ৮৫৮টি গাছ গাছড়া এবং ৫৫টি ফলমূল উৎপাদন পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ দেন। উপরন্তু গাছের কলম করার পদ্ধতি , জমির অনুর্বরতার কারণ, গাছের রোগ, সারের উপকারিতা প্রভৃতি সম্বন্ধে তিনি আলোকপাত করেন। শুধুমাত্র কৃষি উৎপাদনেই মূরগণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেননি, উদ্যান বিজ্ঞানেও (horticulture) সমান বুৎপত্তি প্রদর্শন করেছেন। কর্ডোভা, সেভিল, মালাগাসহ আন্দালুসিয়ার সমস্ত শহরে উদ্যান প্রতিষ্ঠা করা হয়। ড্রেপার বলেছেন, "তাদের মতো অন্য কোনো জাতি প্রসাধক উদ্যানকর্ষণ এত ভালোভাবে জানতা না।"[২১৮] ("Nowhere was ornamental gardening better understood.") তারা বিভিন্ন ধরনের ফুলের চাষ করে, তারা ফুলের নির্যাস নিয়ে সুগন্ধি দ্রব্য তৈরি করতে জানত। গোলাপ চাষের ক্ষেত্রে তারা এরূপ প্রত্যেক উদ্যানে বছরের সমস্ত ঋতুতেই গোলাপের চাষ হত। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মালী এ সমস্ত উদ্যানের পরিচর্যা করতেন। তারা কৃত্রিম পাহাড়, বন বনানী, গাছ গাছড়া সৃষ্টি করে মনোরম উদ্যান তৈরি করত। গোলক ধাঁধা (Maze), কৃত্রিম গুহা, নির্ঝর তৈরি করতে জানত।

মূরেরা পোস্ত গাছ থেকে আফিং বের করার পদ্ধতি আবিষ্কার করে, কিন্তু তাদের প্রস্তুত পদ্ধতি জানা ছিলনা। উৎপাদন ক্ষেত্রে মূরেরা অসামান্য সাফল্য অর্জন করেন। সেভিলের আফ্রারাফে প্রতি বছর ২১৮৭৫০ মন তেল প্রস্তুত হত। জলপাই পাকার সময় প্রত্যহ ১২৫০০ মন তেল নগরে আসত। সমগ্র এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা দক্ষিণ স্পেন থেকে এ প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য পেত। কর্ডোভায় গোলাপ এত বেশি উৎপন্ন হত যে পঁচিশ পাউন্ড বিক্রি করলে মাত্র দুই দিরহাম পাওয়া যেত। ডোযী

---

[২১৬] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ, ২১৬।
[২১৭] P.K.Hitti, *Op.Cit.*, P.575.
[২১৮] Draper, *Op.Cit.*, P.33.

বলেন, “মূর শাসিত স্পেনে কৃষি ও উদ্ভিদ বিজ্ঞান সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান লাভের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ছাত্র ছাত্রীরা সেখানে তথ্যগত ও ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করত।”[২১৯]

মূর সভ্যতার বিকাশে অভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ডোযী বলেন, ব্যবসা বাণিজ্য এরূপ চরম উৎকর্ষ লাভ করে যে, জাতীয় রাজস্বের মোট অংক আসত আমদানি ও রপ্তানি কর থেকে। তৃতীয় আব্দুর রহমানের অর্জিত রাজস্ব প্রথম আব্দুর রহমানের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে রাজস্ব বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় বার্ষিক ৬,২৪,০০০ দীনারে। এ প্রবৃদ্ধির হার আঠারো ভাগ বেশি। ইবনে হাউকল মূর শাসিত স্পেনের ব্যবসা বাণিজ্যের অগ্রগতির বিশদ বিবরণ দেন । পুল ও সড়ক নির্মাণের ফলে যাতায়াত ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয় এবং এর ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। শকট ব্যবহৃত হয়, ফলে দ্রুত মালামাল সরবরাহ করা সম্ভব হত। ব্যবসা বাণিজ্যের অগ্রগতির মূলে ছিল শুল্ক ব্যবস্থা।

উমাইয়া খলিফাগণ উপলব্ধি করেন যে, উন্মুক্ত বাজার হলে বিনা শুল্কে জিনিসপত্র ক্রয় বিক্রয় অধিক হবে। এজন্য তারা কোনো কোনো পণ্য স্পেনের খনিজ সম্পদ আহরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যই প্রসারতা লাভ করল না, কল-কারখানাও প্রতিষ্ঠিত হয়। শিল্পজাত দ্রব্যাদি উৎপাদনে মূরগণ বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। স্পেনের রৌপ্য খনি প্রাচীনকাল থেকে বিখ্যাত। আরব শাসনের সময় পাঁচশত সুড়ঙ্গ সৃষ্টি করে খনিজ দ্রব্য আহরণ করার ব্যবস্থা ছিল। এছাড়া তরু ও টেগাসের বালুকণা থেকে প্রচুর স্বর্ণরেনু সংগৃহিত হত। পারদ উৎপাদনসমূহের সর্বাপেক্ষা লাভজনক ব্যবসা ছিল। এস্ট্রেমাদুরার পারদ ও এন্টিমনি (Antimoni) বিদেশে রপ্তানি হত। আন্দালুসিয়ার তরবারি ও তাম্র নির্মিত বাসনপত্র উৎপাদনের মূল কারণ ছিল পর্যাপ্ত তামা ও লোহার সম্ভার। ভ্যালেনসিয়া,অলিকান্তে ঝিনুক থেকে মুক্তা পাওয়া যেত।

সারাগোসার নিকট সৈন্ধব লবণের পাহাড় ছিল। আল হামা গিরিতে জিপসাম নামক খড়ি মাটিতে সর্বোৎকৃষ্ট চুনা বালি (Plastar) তৈরি হয়। সাদা মার্বেল সংগৃহিত হত মাসায়েল থেকে। স্থাপত্যিক অলঙ্করণে ব্যবহৃত মনিমাণিক্য, সাদা ও রঞ্জিত পাথর স্পেনের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আহরিত হত। লোরসায় গাঢ় নীল বর্ণের খনিজ পাথর মালাগা থেকে পদ্ম রাগ এবং কার্থাজেনা থেকে নীলমনি পাথর সংগৃহিত হত। মূরেরা এশিয়া ও ইউরোপের নানা ধরনের পণ্য দ্রব্যের সাথে খনিজ পদার্থ ও কৃষি শিল্প দ্রব্যের বিনিময় করতো। গ্রানাডার ফোম, কার্পাস ও রেশমি বস্ত্র প্রস্তুত হবার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো

[২১৯] R.Dozy, *Op.Cit.*, P.446.

ভূ-মধ্যসাগরের তটস্থ বন্দর গুলোতে বিক্রি করা হত। জেটিভায় উৎপাদিত কারুকাজ সমগ্র প্রাচ্যে রপ্তানি করা হত স্পেনের বহু স্থানে লাক্ষা, সেভিল ও টলেডোর বর্ম, তরবারি ফলক (blade), ভ্যালেনসিয়ার ফল, চিনি, তুলা, শাল বিদেশে রপ্তানি হত। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় লোরসায় বিশুদ্ধ ঔষধ তৈরির কারখানা ছিল। সেখানকার উৎপাদিত ঔষধ দেশে ও বিদেশেও ব্যবহৃত হয়।

ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মালাগার অবদান ছিল অপরিসীম। এ সমুদ্র বন্দর শুধুমাত্র রপ্তানির জন্যই ব্যবহৃত হত না, বরং এ স্থান ছিল শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনের একটি প্রধান কেন্দ্র। এখানকার উৎকৃষ্ট বাসন, হাড়ি, কলস, সিরিয়া ও কনস্টান্টিনোপলে চালান করা হত। গ্রানাডা রাজ্য চীনা বাসনপত্র রপ্তানি করে প্রভূত আয় করে। প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থার জন্য শিল্পমেলার ব্যবস্থা করা হত। বিদেশী বণিকেরা এখানে আগমন করতেন এবং পণ্য দ্রব্য ক্রয় করতেন। সাধারণ পণ্য থেকে বিলাসবহুল ও বহু মূল্যবান দ্রব্যাদি এখানে বিক্রি হত। কার্পাস ও রেশমের পোশাক বিশেষভাবে আকর্ষণীয় ছিল। আন্ত:বাণিজ্যের পাশাপাশি বর্হিবাণিজ্য বিস্তার লাভ করে। আইবেরীয় উপদ্বীপ সামুদ্রিক বাণিজ্যের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী ছিল। ভূ-মধ্যসাগর থেকে স্পেনীয় বণিকেরা ভূ-মধ্যসাগরীয় অঞ্চল ছাড়া অন্যান্য দেশে ও সমুদ্রাভিযান করতে পারতো।

S.P. Scott বলেন, "They explored maderon the canarics and the Azores four hundred years before those Island were occupied by the Europeans."[২২০] উল্লেখ্য যে দশ শতকে ভূ-মধ্যসাগরের বহির্বাণিজ্য প্রকৃত পক্ষে স্পেন ও সিসিলির বণিকদের হাতে ছিল। তাদের বাণিজ্য জিব্রাল্টার থেকে কৃষ্ণ সাগর ও এশিয়ার অন্তর্ভাগ এবং চীন সাগর থেকে মাদাগাস্কার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বিভিন্ন ধরণের পণ্য আমদানি ও রপ্তানি করা হত এবং মূরদের মতো এক্ষেত্রে কেউ পারদর্শিতা দেখাতে পারেনি। তারা শুধুমাত্র স্বদেশের খনিজ ও শিল্পজাত দ্রব্যাদিই আমদানি করত না, বরং অন্যদেশ থেকে বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করত; যেমন- উত্তর মেরুর সীমান্ত থেকে বনবিড়াল ও খেকশিয়ালেরর চামড়া নির্মিত পরিচ্ছদ, নরওয়ে ও সাইবেরিয়া থেকে হাতির দাঁত (Ivory) জার্মানি থেকে মধু ও মোম বাল্টিক সাগরের বেলাভূমি থেকে তৃণ-মনি, শিলারস ও mastic, চীন থেকে চীনা বাসন ও চা, মসলা ও চন্দন কাঠ আমদানি করা হত। দাস ব্যবসা প্রচলিত থাকায় কর্ডোভায় দাস-দাসী নিলামে বিক্রয় হত। একজন নিখুঁত সুন্দরী ক্রীতদাসী সহস্র স্বর্ণমুদ্রায় বিক্রি হত। আবিসিনিয়ায়

---

[২২০] S.P.Scott, *Op.Cit.*, P.620.

কাফ্রীদের ক্রয় করা হত খলিফাদের দেহরক্ষী হিসেবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বই ব্যবসা ছিল জমজমাট। একমাত্র কর্ডোভায় পুস্তক বিক্রেতার সংখ্যা ছিল বার হাজার।

স্পেনে পশু ব্যবসা বেশ প্রসার লাভ করে। উচ্চ বংশীয় (high breed) অশ্ব খুব চড়া দামে বিক্রি হত। গ্রানাডায় অশ্বারোহী বাহিনীর জন্য নিয়মিতভাবে একলক্ষ অশ্ব প্রতিপালন করা হত। খোজাদের ক্রয় আন্দালুসিয়াতে বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। এ সমস্ত হতভাগ্য মানুষ হেরেমে পাহারাদার নিযুক্ত হত।

আরবদের আবিষ্কার ব্যতিত সমুদ্র বাণিজ্য অথবা সমুদ্রাভিযান মোটেই সম্ভব হতনা। সেক্সট্যান্ট এবং আস্তারলেব ছাড়া সমুদ্রে দিক নির্ণয় অসম্ভব ছিল। এবং এ দুটি মুসলমানদের আবিষ্কার। এ ছাড়া নাবিক বিদ্যায় মূরগন সর্বপ্রথম চাবুক শলাকার নাবিকদের আবিষ্কার বলে বিবেচিত হত। পূর্বে ভূলবশত এটি আমালফির নাবিকদের আবিষ্কার বলে বিবেচিত হত। আরবদের নিকট থেকে ইতালির নাবিকেরা দিক নির্ণয় যন্ত্রের ব্যবহার শিক্ষা করে যার ফলে পনের শতকে তারা সমুদ্রাভিযান করতে পারে। উল্লেখ্য যে, এ দিক নির্ণয় যন্ত্র ব্যতিত কলম্বাস নতুন জগত (New world) অর্থ্যাৎ আমেরিকা আবিষ্কার করতে পারতেন না এবং অনেকের ধারণা যে কলম্বাসের জাহাজে আরব নাবিক ছিলেন। মূরদের আবিষ্কারের মধ্যে রয়েছে দাঁড়ি পাল্লা যার অবর্তমানে ব্যবসা বাণিজ্য অচল হয়ে যেত।

S.P. Scott বলেন, “যে দাঁড়ি পাল্লা না থাকলে ব্যবসায়ীদের এক মূহুর্ত ও চলেনা, তা আরবদের আবিষ্কার।”[২২১] (“The balance shose value to the merchant would not be fully apparent unless he were deprived of it, is also an invention of the Arabs.”) এছাড়া মূরেরা রৈখিক মাপ ও ওজনে মাপ দিবার পদ্ধতি জানত। ঘোড়ার বালামচি (Horse hair) মূরদের রৈখিক মাপের (linear measurement) মান বা Unit হিসেবে গণ্য করা হত। দাঁড়ি পাল্লায় ওজনের জন্য যব-দানা ছিল সর্ব নিম্ন ভারমান (weight)। চারটি যবদানা দিয়ে একটি মটর হত। আরবিতে এর নাম কারাত। মূরেরা তাদের কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে স্বর্ণ মাপার পদ্ধতিতে, যাতে কারাতের ব্যবহার দেখা যায়। ড্রেপার যথার্থই বলেছেন, “আমরা স্বর্ণের পরিমানের ক্ষেত্রে বলি থাকি আল কারাত।”[২২২] (“ We still use the gram as our unit of weight and still speak of gold as somany carats fine.”

---

[২২১] *Ibid*, P. 630.

[২২২] Draper, *Op.Cit.*, P.44.

বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডে স্পেনের নারীদের যথেষ্ট অবদান ছিল। এ সময় নারীদের স্থান ছিল অতি উচ্চে। সমাজে কোমলাঙ্গীরা প্রাচীন কালের গৃহিণী ও কুমারীদের অপেক্ষা অধিক স্বাধীনতা পেতেন। প্রকাশ্য সভায় পুরুষের ন্যায় রমনীরাও সাহিত্যিক শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্য প্রতিযোগিতা করতেন। সাহিত্য ক্ষেত্রে তাদের আবির্ভাবের ফলে আরবি কবিতা থেকে ইন্দ্রিয় সুখাভিলাস ও দৈহিক পূর্ণতার অতি প্রশংসা কমে যায়। খেলাফতের শেষ যুগের কবিতায় এর নারীর দয়া, প্রেম, রূপ, প্রীতি ও দোষ স্পর্শ-শূন্যতা এরূপ সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে বর্ণিত হয়েছে যে তা মহত্তম নাইটের উপযুক্ত।

দ্বিতীয় আব্দুর রহমানের রাজত্বে সুলতানা তারুবা, তৃতীয় আব্দুর রহমানের সম্রাজ্ঞী আজ জোহরা ছিলেন খুবই পান্ডিত্যম্মন্য। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, সাহিত্য ও শিল্পকলার পৃষ্ঠ পোষকতায় মহিলাগণ বিশেষ অবদান রাখেন। ওয়ালাদা নাম্নি পরমা সুন্দরী ও মেধাসম্পন্ন মহিলা ; যিনি ব্যক্তিগত সৌন্দর্য এবং সাহিত্যিক গুণাবলির জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি স্পেনের সফো ছিলেন, সেখানে আরব মহিলাগণ কবিতা ও সাহিত্যের প্রতি তাদের রসবোধ ও মন-মানসিকতা প্রদর্শন করেছেন। উল্লেখ্য যে, স্পেনের প্রখ্যাত কবি ইবনে যায়দুন ওয়ালাদার রূপে মুগ্ধ হয়ে কবিতা রচনা করেন।

বলা যায় যে, মূর শাসিত স্পেনে জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে রমনীগণ পুরুষদের তুলনায় পিছনে ছিলেন না। আরবি সাহিত্যে বহু মহিলা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। খলিফা, প্রাদেশিক শাসকবর্গ, অমাত্য, সভাসদদের আত্মীয়েরা বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং তারা তাদের সৃজনশীল সাহিত্যকর্ম দিয়ে তাদের প্রতিভার বিকাশ ঘটান। এমনকি তারা প্রতিযোগিতামূলক ভাবে কবিতা ও সাহিত্য কর্ম রচনা করেন। শাহজাদা আহমদের কন্যা আয়েশা কবিতা রচনা করে যশস্বী হয়েছিলেন। তাদের জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা ও রচনাবলি পুরুষ কবি ও দার্শনিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। সাহিত্য চর্চার জন্য এ সমস্ত বিদুষী মহিলাবৃন্দ নিজস্ব গ্রন্থাগার স্থাপন করেন। তাদের গ্রন্থাগার রাজ্যের সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বাঙ্গিন সুন্দর লাইব্রেরী গুলোর অন্যতম। মুয়াহিদ বংশের শাহজাদী ওয়ালাদা ছিলেন একাধারে কবি, বাগ্মি এবং সুলেখিকা। সেভিলের সোফিয়া ও আল-গাসানিয়া ও কবিতাচর্চা ও বাগ্মিতায় অশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। সোফিয়া হস্তলিপি বিশারদ ছিলেন এবং তার হস্তলিপি শুধু সুন্দরই ছিলনা, চাতুর্য এবং সৌকর্যপূর্ণ ছিল।

আল ফায়জুলীর প্রতিভাশালিনী দুহিতা মরিয়ম সাহিত্য ক্ষেত্রে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তীক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন মরিয়ম ব্যঙ্গ কবিতা রচনায় পারদর্শী ছিলেন। উম্মুল সাদ হাদিস তত্ত্বে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। কর্ডোভার সাবানা কৃতি বিজ্ঞানে জটিলতম প্রশ্নগুলোর সহজ সমাধান দিতে পারতেন। তার

খ্যাতি ও যশ এরূপ ছিল যে খলিফা দ্বিতীয় হাকামের রাজত্বকালে তিনি খলিফার একান্ত সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। সমসাময়িক ইউরোপীয় নারীদের তুলনায় মূর মহিলাগণ অনেক প্রগতিবাদী ও সংস্কৃতিমনা ছিলেন। রাজিয়া নাম্নী এক বিদুষী রমনী স্পেন সম্রাট হাকামের অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী ছিলেন। সুলতান হাকাম তাকে সৌভাগ্য সেতার নামে অভিহিত করেন। তিনি ব্যাকরণে বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। অঙ্ক শাস্ত্রে তার বেশ অধিকার ছিল। তার রচনা শক্তি দেখে সম্রাট হাকাম অতিশয় বিমুগ্ধ হতেন। ফাতেমা নাম্নী এক রমনী হস্তলিপির জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। আয়েশা এই সময়ের একজন উল্লেখযোগ্য রমনী যিনি সুলেখিকা ও সুকৃতি হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কাফেফা নামে এক মহিলা সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। তার সুমধুর কণ্ঠ সঙ্গীতে সকলের প্রাণে সমির ধারা বর্ষণ করত।

উপর্যুক্ত পর্যালোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাহিত্যকর্মের গবেষণা ও চর্চায় মধ্যযুগের স্পেনের মুসলমানগণ অনবদ্য অবদান রেখে ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। তাদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে পরবর্তীতে অনেকে বুদ্ধিবৃত্তিক ও সৃজনশীল সাহিত্যকর্মে অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন। গণিত, রসায়ন, চিকিৎসা, শিল্পকলা, ভাষাতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, জ্যোতিষশাস্ত্র, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি সকল বিষয়ে জ্ঞানের শাখায় স্পেনীয় মুসলমান গবেষক, সাহিত্যিক, চিকিৎসাবিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিদ, ভূগোলবিদ, গনিতবিদ, ভাষাতত্ত্ববিদ প্রভৃতি জনের যথেষ্ট অবদান ছিল। তাঁরা যুগে যুগে জ্ঞান চর্চা করে মুসলমানদেরকে যে পরিচিতি দিয়ে গিয়েছেন তা আজো তথাকথিত পাশ্চাত্য সভ্যতার কাছে অমূল্য অবদান হিসেবে স্বীকৃত। মুসলিম স্পেনের সুদীর্ঘ আটশ বছর মুসলিম শাসন এখন ইতিহাস হয়ে থাকলেও একথা চির অম্লান হয়ে আছে যে, স্পেন, টলেডো ও সিসিলি হয়ে মুসলিম জ্ঞান বিজ্ঞান সমগ্র ইউরোপকে প্রভাবান্বিত করে, তবুও এটাই সত্যি যে, মধ্যযুগের মুসলিম স্পেন ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ যোগাযোগ কেন্দ্র, মহাকালের এক সেতুবন্ধ, বিশ্বসভ্যতার এক অন্যতম পীঠস্থান।

পঞ্চম অধ্যায়
কর্ডোভা গ্রন্থাগার ও মুসলিম ঐতিহ্য

প্রত্যেক জাতিরই একটি গৌরবজনক অধ্যায় থাকে। তেমনি স্পেনের মুসলমানরাও মধ্যযুগে একটি সোনালি অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছিল। শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা উন্নত জাতিতে পরিণত হয়েছিল। জন্ম দিয়েছিল আধুনিক বিজ্ঞানের। মধ্যযুগের সেই সমুন্নত মুসলিম সভ্যতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর ইতিহাসের পাতায় বিধৃত রয়েছে। একথাও সূর্যালোকের মত সত্য যে, তৎকালীন বিশ্বের সর্বোন্নত সভ্যতা তথা মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংস্পর্শে এসেই ইউরোপীয় সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে রেনেসাঁ বা নবজাগরণের সূচনা হয়।[১]

শিক্ষা সম্প্রচার ও প্রকৃত জ্ঞান অর্জনের একমাত্র মাধ্যম হিসেবে গ্রন্থাগার সর্বযুগে সর্বদেশে প্রাধান্য লাভ করেছে। প্রাচীনকালের আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরী, মেসোপটেমীয় ফলকে উৎকীর্ণ কীলকাকরের গ্রন্থাবলি, মিসরের প্যাপিরাসের গ্রন্থাবলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মূর সভ্যতার অসামান্য অবদান ছিল অসংখ্য গ্রন্থ সম্বলিত গ্রন্থাগারসমূহ। রাজনৈতিক সভাসমিতি এবং থিয়েটার যা গ্রিক ও রোমীয় যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। বিবর্জিত মুসলমানদের জীবন যাত্রায় গ্রন্থাবলিই জ্ঞানার্জনের একমাত্র উপায় হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চায় মুসলমানদের উৎকর্ষের মূলে ছিল লাইব্রেরী। শাশ্বত ধর্ম ইসলামের নব উদ্দীপনা ও বিপুল প্রাণশক্তিতে বলীয়ান মুসলমানেরা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন ভাষায় রচিত মনীষী, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, আবিষ্কারকদের গ্রন্থাবলি সংগ্রহ করেন। সেগুলোই পরবর্তীকালে বিশ্ববিখ্যাত মুসলিম গবেষক, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, চিকিৎসকের আবির্ভাবের পথ তৈরি করে দিয়েছিল। অন্য দিকে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার এই প্রবাহমাত্র ধারায় মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠেছিল সমৃদ্ধ লাইব্রেরী। এর মধ্যে কর্ডোভা লাইব্রেরীটি ছিল শ্রেষ্ঠ। এছাড়া গ্রানাডা, মালাগা, সেভিলে গড়ে উঠে সুপ্রসিদ্ধ লাইব্রেরী।[২]

ইউরোপ থেকে বিচ্ছুরিত যে সভ্যতা আজকের বিশ্বকে কমবেশী সমৃদ্ধ করেছে, তা মুসলিম সভ্যতার আগুনের স্পর্শে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। নবীন আদর্শে অনুপ্রাণিত প্রাণোচ্ছল মুসলিমরা পৃথিবীর সভ্যতার কাঁচামাল সংগ্রহ করে রপ্তানীযোগ্য যে সভ্যতা সৃষ্টি করেছিল ক্রুসেডের যুদ্ধের রক্তসাগর ভেসে তা ইউরোপকে প্লাবিত করে তার জড়তা অন্ধকার দূর করে নবীন সভ্যতার সূর্যোদয়ে সাহায্য

---

[১] মোহাম্মদ সা'দাত আলী, *মধ্যযুগের লাইব্রেরী মুসলিমদের অবদান* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯০),পৃ. ৪।

[২] *তদেব*।

করে। মধ্যযুগের সেই মুসলিম সভ্যতা যে কতটা সমুন্নত হয়েছিল, সমকালীন তার উজ্জ্বল স্বাক্ষর। এই ইতিহাস সৃষ্টির পেছনে আছে স্পেনীয় মুসলমানদের জড়তা ও সংকীর্ণতামুক্ত অনুসন্ধিৎসু, কৌতূহলী এবং আবিষ্কারধর্মী মানসিকতা। তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন যে, সভ্যতা বিকাশের উৎসমূল হচ্ছে লাইব্রেরী। সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার আধার বলেই মুসলিমরা এই লাইব্রেরীকে সমৃদ্ধ করার ব্যাপক প্রচেষ্টা শুরু করেন।[৩]

পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের লাইব্রেরী বা জ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্র থেকে সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির উপর মনীষীদের ও আবিষ্কারকদের লিখিত নানা ধরনের পুস্তক সংগ্রহ করে তাঁরা তাঁদের গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধ করেন এবং গবেষক বিজ্ঞানী, পণ্ডিত ও দার্শনিকদের জ্ঞান চর্চায় সুযোগ ও সহযোগিতা করেন। এই জ্ঞান চর্চায় পরবর্তীকালে ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত ও সংস্কৃতিতে উজ্জ্বল মুসলিম ধারার উদ্ভব ঘটায়।[৪]

আরবি ভাষা ও সাহিত্য হয় জ্ঞান চর্চার প্রধান মাধ্যম। ফলে শিক্ষার প্রসার ঘটানো বেশি দ্রুতই সম্ভব হয়ে উঠে। ওয়েস্টফল থমসন বলেন, "প্রাচীন পার্সী সাহিত্য থেকে আরবি সাহিত্যের উদ্ভব। অন্যদিকে, আরবীয় বিজ্ঞান (Arabian Science) গ্রিক থেকে আগত এবং সেজন্য আরবরা গ্রিকদের নিকট ঋণী। মুসলিম গ্রন্থাগারের গোড়ার কথা সন্ধান করতে গেলে সঙ্গত কারণেই বলতে হয়, যেহেতু পার্সী সাহিত্য ও গ্রিক বিজ্ঞান থেকে আরবের মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূত্রপাত ও চর্চা আরম্ভ, কাজেই আরবগণ কর্তৃক সপ্তম শতকে পারস্য সাম্রাজ্য ও মিসর দখলের পরই মূলত মুসলমান গ্রন্থাগারের বিকাশ ঘটে।"[৫]

পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় বিভিন্ন জাতি ও নৃপতিগণ কখনো কখনো গ্রন্থাগার স্থাপন ও সমৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন, আবার পরবর্তীতে এরাই স্তিমিত হয়ে গেছেন। যতোটুকু উৎসাহবোধ ছিল তার স্থায়ীত্ব ছিল যেন বিজলীর মতো। কিন্তু মুসলমানদের গ্রন্থাগার সংগঠনের ইতিহাস সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাঁচের, ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ও ঔজ্জ্বল্যের অধিকারী। গ্রন্থাগার, সংস্কৃতি ও সভ্যতা গড়ায় তাদের প্রচেষ্টায় কোনো যতি চিহ্নের হদিস নেই।[৬]

---

৩ মোহাম্মদ সা'দাত আলী, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ৫।
৪ *তদেব*।
৫ Thomson, James westfall (ed.) *The medieval library* (New York : Hafner Publishing co., 1957), P. 347.
৬ মোহাম্মদ সা'দাত আলী, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ২১।

স্পেনের মুসলিম শাসকগণ নিজেদের ধর্মের প্রচারের জন্য, কখনো বাণিজ্যের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য পার্শ্ববর্তী অমুসলিম রাজ্যগুলোর সাথে লড়াইয়ের সম্মুখীন হয়েছেন। মুসলমানদের সামরিক শক্তি এতোই দুর্জয় ছিলো যে, সর্বত্রই তাঁরা জয়ী হয়েছেন। এভাবে রাজ্য জয়কালে, কখনো সন্ধি করার লক্ষ্যে পার্শ্ববর্তী রাজ্যের সাথে চুক্তি সম্পাদনকালে প্রচুর উপঢৌকন লাভ করেছেন মুসলিম শাসকগোষ্ঠী। এসব উপহারে প্রচুর দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন গ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত থাকতো। অন্য দেশের সাথে কূটনৈতিক বিনিময় বাণিজ্য ও অনুরূপ কার্যাদি সম্পন্ন করার সময়ে সেখানে পাওয়া যায় বিপুল পরিমাণের গ্রন্থাবলি। এ কাজ বলতে গেলে স্পেনীয় মুসলমানদের প্রায় রুটিন ওয়ার্কের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এভাবে সে সময়ে স্পেনীয় আরবে জন্মলাভ করে গ্রন্থপ্রিয় জাতি। অভিজাত পরিবারে লেখাপড়ার কদর সর্বদাই ছিল। আরবের সে সময়কার সামাজিক রাজনৈতিক পরিবেশ এভাবেই ধীরে ধীরে শিক্ষিত জনগোষ্ঠী গড়ে তোলে।[৭]

ইসলাম জ্ঞানার্জন ও জ্ঞান চর্চাকে জীবনের ব্রত হিসেবে বেছে নিতে উদ্বুদ্ধ করে। বস্তুত, সে যুগে সম্মানের দিক থেকে যুদ্ধ জয় ও রাজ্য অধিকারের পরই জ্ঞানী-গুণীদের স্থান ছিলো। যখন যুদ্ধবিগ্রহ থাকতোনা, মূলত তখন জ্ঞান সাধকরাই ছিলেন সকল আলোচনার মধ্যমনি।[৮]

স্পেনে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর কর্ডোভা নগরী খিলাফতের প্রাণ কেন্দ্র হয়ে উঠে। এ নগরী দৈর্ঘে ছিল ২৪ মাইল, প্রস্থে ছিল ১০ মাইল, জনসংখ্যা ছিল এক মিলিয়ন। মুসলিম স্পেনের কর্ডোভা নগরীতে ৩৮০টি মসজিদ, ৮০০ এর অধিক মাদ্রাসা, অসংখ্য ব্যক্তিগত এবং ৭০টি পাবলিক লাইব্রেরী বিদ্যমান ছিল। এ নগরীকে শিক্ষার ও বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের প্রাণকেন্দ্র বলা হত। বিশেষ করে তাদের কাছে; যারা পড়তে ও জ্ঞান অর্জনে পিপাসু ছিলেন। মন ও মননশক্তির বিকাশ ঘটাতো এই কর্ডোভা নগরীতে সমৃদ্ধশালী লাইব্রেরীগুলোতে বসে। সমসাময়িক কালের শ্রেষ্ঠতম কর্ডোভা লাইব্রেরী ছিল তখনকার বিদগ্ধ সমাজের বিরাট আকর্ষণ।

দশ শতকের কর্ডোভা দর্শন, কাব্য ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে ইত্যাদিতে ছিল নিবিষ্ট চিত্ত, ঠিক যেমন ঘটেছিল আঠারো শতকের প্যারিসে। স্পেনে শিক্ষা-সংস্কৃতির এই উৎকর্ষ ঘটে ইসলামিক সোসাইটির ছোঁয়াতে। মুসলিম চিন্তাবিদ দার্শনিক বা পন্ডিতগণ প্রাচীন গ্রিস ও রোমানদের সকল জ্ঞানের সুষ্ঠু সংরক্ষণ করেন। শতকের শেষ প্রান্তে এসে খলিফা দ্বিতীয় হাকাম চার লক্ষ সংখ্যক গ্রন্থ ও পান্ডুলিপির লাইব্রেরী গড়ে তোলেন। এটি অবিসংবাদিতভাবে সত্য যে, এই লাইব্রেরী তখন ইতিহাস, বিজ্ঞান ও

---

[৭] মোহাম্মদ সা'দাত আলী, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ২২।

[৮] *তদেব*।

সাহিত্যের উপর ছিলো এক অনবদ্য নির্ভরযোগ্য মনোমুগ্ধকর সমৃদ্ধিশালী লাইব্রেরী। কিন্তু পরবর্তীকালে শাসকদের কারো কারো অদূরদর্শিতার এই লাইব্রেরী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং কর্ডোভার উজ্জ্বলতম দিনগুলোর পরিসমাপ্তি ঘটে।

দশ শতকে মুসলিম খলিফাদের আমলে ইউরোপের এক অনিন্দ্য সুন্দর নগরী কর্ডোভা। আশ্-শাকুয়ান্দি (Ash-Shaquandi), একজন কবি, স্থানীয় আন্দালুসীয় ভাষায় স্তবকীর্তন করতেন। তিনি আলোকোজ্জ্বলময় রূপসী নগরী কর্ডোভা শহরস্থিত নদীর উপর নির্মিত হয়েছিল এক মনোমুগ্ধকর সেতু। সেতুটি এখনো মুসলিম গুয়াডাল কুইভার নামেই পরিচিত। নদীর তীরে তীরে ছিল বসতি। আরব, অনারব, ইহুদি, খ্রিস্টান এবং কর্ডোভা নগরীর প্রতি আকৃষ্ট আফ্রিকান, বারবারিয়ানস সবাই পাশাপাশি বসবাস করত।[৯] এছাড়া পূর্ব ইউরোপীয় কিছু ক্রীতদাস ও সেখানে বসবাস করত। জনৈক পরিব্রাজকের মতে সেখানে তখন তিনশ সরকারী গোলসখানা ছিল। অন্য একমতে, সেখানে গোসলখানা ছিল ছয়শর বেশি। দশম শতকের কর্ডোভায় পাঁচ লক্ষাধিক লোকের বাস ছিল। সেক্ষেত্রে এত লোকের জন্য উল্লিখিত সংখ্যক গোসল খানা অপর্যাপ্তই মনে হয়। সে সময় কর্ডোভা নগরীতে যে ব্যক্তির ব্যক্তিগত লাইব্রেরী থাকত; সে ব্যক্তি সমাজে একজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ হিসেবে চিহ্নিত হত।[১০]

জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চায় মুসলমানদের উৎকর্ষের মূলে ছিল লাইব্রেরী। শাশ্বত ধর্ম ইসলামের নব উদ্দীপনা ও বিপুল প্রাণশক্তিতে বলীয়ান মুসলমানেরা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন ভাষায় রচিত মনীষী, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, আবিষ্কারকদের গ্রন্থাবলি সংগ্রহ করেন। সেগুলোই পরবর্তীকালে বিশ্ববিখ্যাত মুসলিম গবেষক, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, চিকিৎসকের আবির্ভাবের পথ তৈরি করে দিয়েছিল। অন্য দিকে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার এই প্রবাহমাত্র ধারায় মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠেছিল সমৃদ্ধ লাইব্রেরী। এর মদ্যে কর্ডোভা লাইব্রেরীটি ছিল শ্রেষ্ঠ। এছাড়া গ্রানাডা, মালাগা, সেভিলে গড়ে উঠা সুপ্রসিদ্ধ লাইব্রেরীর কথাও উল্লেখযোগ্য।

একথা সুবিদিত, লাইব্রেরীগুলোতে বিশেষ করে মসজিদ পাঠাগারসহ প্রতিটি ইসলামি গ্রন্থাগারেই বিশেষ করে মসজিদ পাঠাগারসহ প্রতিটি ইসলামি গ্রন্থাগারেই আল কুরআনের বহু সংখ্যক কপি রাখা হত। আল কুরআনের ব্যাখ্যা, টীকা-টিপ্পনী ও তাফসীর (ব্যাখ্যা গ্রন্থ) সম্বলিত গ্রন্থাবলি রাখার কথা তো উল্লেখের অবকাশই নেই। লাইব্রেরীর একটা ব্যাপক অংশ জুড়ে ছিল এসব বই। ইসলামি গ্রন্থাগার সহ সমগ্র আরববাসীর লাইব্রেরী বৈচিত্র্যের আরেক অন্যতম বৈশিষ্ট্য জীবনীগ্রন্থ রাখা ও এসব থেকে শিক্ষা

---

[৯] মোহাম্মদ সা'দাত আলী, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ৩৭।

[১০] *প্রাগুক্ত*,পৃ. ৩৮।

নেওয়া ছিল রীতিমতো একটা রেওয়াজ। এসবের মধ্যে হযরত মুহম্মদ (সা:) তাঁর পরিবারবর্গ ও অন্যান্য সদস্য, খোলাফায়ে রাশেদীন ও পরবর্তী শাসক এবং বিশিষ্ট অনুগত সাহাবিদের জীবনী কখনো বাদ যায়নি।[১১]

তৎকালীন স্পেনে কর্ডোভা ছিল গ্রন্থাগারের স্বর্গরাজ্য। কর্ডোভায় বহু বাজার সেখানে শুধু বই বিক্রি হত। কেননা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য কেবল বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রথিতযশা পন্ডিতের পাঠদানই যথেষ্ট নয়। এজন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত গ্রন্থ। এসব গ্রন্থ সংরক্ষণের জন্য থাকা চাই লাইব্রেরী। স্পেনে মুসলিম শাসকগণ অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং লাইব্রেরী স্থাপন করে শিক্ষা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের বিকাশে ও উৎকর্ষ সাধনে অভূতপূর্ব অবদান রেখেছে। এছাড়া প্রাদেশিক গর্ভনর এবং স্বাধীন রাজ্যের সুলতানগণ স্পেনের বিভিন্ন স্থানে গ্রন্থাগার স্থাপন করেন। যার ফলে জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সম্প্রসারিত হয়। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি অনেক গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল। কেবল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ছিলনা, আধুনিক কালের গণপাঠাগার বা Public library স্থাপিত হয়। এটাই সত্য যে, জ্ঞান গ্রহণের পক্ষে কর্ডোভার মাটি অতিশয় উপযোগী ছিল। বই ও গ্রন্থাগারের (লাইব্রেরী) প্রতি সর্বগ্রাসী ভালবাসা সেখানকার লোকদের চরিত্রের একটি আশ্চর্যজনক বৈশিষ্ট্য।[১২]

কর্ডোভার অভিজাত আল্ভার অভিযোগ করেন যে, খ্রিস্টানগণ আরবদের কবিতা ও রোমাঞ্চ পাঠ করে; তাদের ধর্মবিদ ও দার্শনিকদের লেখা পড়ে, প্রকৃতপক্ষে প্রতিভাশালী তরুণগণ কেবলমাত্র আরবিই পড়ে, প্রভূত ব্যয়ে বৃহৎ লাইব্রেরী সংগঠন করে এবং প্রকাশ্যভাবে যোষণা করে যে, এই সাহিত্য প্রশংসার ও সমর্থনের উপযোগী।

স্পেন বিজয়ের সূচনালগ্ন থেকেই প্রাচ্য হতে বই সংগ্রহ করে লাইব্রেরী স্থাপন শুরু হয়। স্পেনে মুসলমানদের প্রথম বিখ্যাত লাইব্রেরী হল কর্ডোভা লাইব্রেরী। আর কর্ডোভা রাজকীয় গ্রন্থাগারের কাজ শুরু করেছিলেন প্রথম মুহম্মদ (৮৫২ খ্রিস্টাব্দ-৮৫৬ খ্রিস্টাব্দ) এবং তৃতীয় আব্দুর রহমান তাতে বর্ধিত আকার দান করেছিলেন।

এ সমস্ত পাঠাগার বা লাইব্রেরী বেশির ভাগই সরকার পরিচালিত ছিল। সুলতান, উজির ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণির মাধ্যমেও পরিচালিত হত। জ্ঞান বিজ্ঞানের সম্প্রচারের প্রতি আমীর দ্বিতীয় আব্দুর রহমান

---

[১১] *প্রাগুক্ত*,পৃ. ২৭।

[১২] যোশেফ হেল (অনু: মোজাম্মেল হক) *আরব সভ্যতা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, বর্ধমান হাউস, চৈত্র, ১৩৭৫), পৃ. ১৪৫।

(৮২২ খ্রিস্টাব্দ-৮৫২ খ্রিস্টাব্দ) বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় তার কর্মচারীগণ এবং সংগ্রহকারীগণ প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ থেকে মূল্যবান গ্রন্থাবলি সংগ্রহ করতো। এ সমস্ত গ্রন্থ সংগ্রহের জন্য লেভী প্রেভেনসালের মতে, আব্বাস ইবনে নাদিহ্ মেসোপটেমিয়ায় বিশেষ করে বাগদাদের পুস্তাকালয়গুলোর থেকে তন্নতন্ন করে খুঁজে পারস্য ও গ্রিক ভাষায় লিখিত গ্রন্থাবলি সংগ্রহ করেন। এ সমস্ত গ্রন্থ কর্ডোভার উমাইয়া গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধ করে এবং পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ভান্ডারে পরিণত হয়। সুলতান, উজির ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণি এজেন্টের মাধ্যমে আরবি গ্রন্থ ও দুর্লভ পান্ডুলিপি বাগদাদ, কায়রো, দামেস্কে, আলেকজান্দ্রিয়া হতে সংগ্রহ করার জন্য এজেন্ট নিযুক্ত করেছিলেন। ধনীদের মধ্যে পুস্তক সংগ্রহ ব্যাপারে পরস্পর প্রতিযোগিতা চলত। আর হঠাৎ বিত্তশালী হয়েছে এমন ব্যক্তিরা তাদেরও এক ধাপ উপরে যাওয়ার চেষ্টা করত।[১৩] বিশ্বের সকল অংশে, এমন কি, সুদূর বাগদাদে নকলনবিস্‌দের সন্ধান করা হত এবং বই বাঁধাই একটি উন্নতিশীল ব্যবসায় হয়ে উঠে।[১৪] বলাই বাহুল্য প্রত্যেক নগরীতেই গ্রন্থাগার ছিল কিন্তু খলিফার পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার ছিল সর্ববৃহৎ।

খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমান (৯১২ খ্রিস্টাব্দ-৯৬১ খ্রিস্টাব্দ) কর্ডোভা লাইব্রেরীকে সম্প্রসারিত করেন। এ সময় কর্ডোভা লাইব্রেরী আরো সমৃদ্ধ হয়ে উঠে। তিনি সর্বপ্রথম মুসলিম স্পেনে গ্রিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষায় পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং তাঁর সময় এর ব্যাপক প্রসার ঘটে। আরবিতে বহু গ্রিক গ্রন্থ অনূদিত হয় ও গ্রিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর বিভিন্ন বিষয়ের বহু মূল্যবান গ্রন্থ আরবিতে রচিত হয়। এছাড়া বিভিন্ন ভাষায় লিখিত মূল্যবান গ্রন্থগুলি আরবি ভাষায় অনুবাদ করিয়ে তিনি জ্ঞানভান্ডারকে আরও সমৃদ্ধ করেন। খলিফার নিজের এবং তাঁর সুযোগ্য পুত্র জ্ঞানতাপস হাকামেরও ব্যক্তিগত লাইব্রেরী ছিল। খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমান দ্বিতীয় আব্দুর রহমানের লাইব্রেরীর গ্রন্থ সংখ্যার সাথে আর ও গ্রন্থ যোগ করে এর সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। কর্ডোভাতে পুস্তকের জন্য স্বতন্ত্র একটি বাজারই ছিল। কর্ডোভার কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর পাণ্ডুলিপির সংখ্যা ছিল অনুন্য ৬,০০,০০০। সকলের জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত ছিল।

খলিফা দ্বিতীয় হাকামের (৯৬১ খ্রিস্টাব্দ-৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ) সময় কর্ডোভা লাইব্রেরী বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ লাইব্রেরীতে পরিণত হয়। পুস্তক সংগ্রহ ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করতে খলিফা হাকামের নিষ্ঠা ছিল অপরিসীম। তিনি গ্রন্থাগার সমৃদ্ধ করার জন্য সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। পিতার জীবদ্দশায় তাঁর

---

[১৩] যোশেফ হেল (অনু: মোজাম্মেল হক), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৫।

[১৪] R. Dozy, *Spanish Islam: A History of the Moslems in Spain* (Trans. Francis Griffin Stokes) (London: Chatto and Windless, 1919). P. 445-447.

ও তাঁর ভ্রাতা আব্দুল্লাহর জন্য পৃথক পৃথক গ্রন্থাগার ছিল। হাকাম এই গ্রন্থাগারগুলিকে তাঁর পিতার গ্রন্থাগারের সাথে একত্রিত করে ও দুষ্প্রাপ্য ও অমূল্য গ্রন্থ সংগ্রহে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। জ্ঞানের প্রতি তাঁর অনুরাগ ও পুস্তক সংগ্রহের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল প্রবল। খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর আর্থিক স্বচ্ছলতা ও স্বাধীনতা সেই আগ্রহ দুর্বার প্রবাহ সৃষ্টি করে। তিনি ছিলেন একজন প্রকৃত গ্রন্থ সংগ্রাহক। দেশ-বিদেশ হতে বহু অর্থব্যয়ে দুষ্প্রাপ্য পান্ডুলিপি সংগ্রহের জন্য বেতনভূক্ত অভিজ্ঞ সংগ্রাহক নিযুক্ত করেন। তাঁর একনিষ্ঠ পুস্তক সংগ্রাহক ফাতিমা সুদূর দামেস্ক, বাগদাদ, কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়া হতে প্রাচীন, মধ্যযুগীয় আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের মূল্যবান পুস্তকাদি সংগ্রহ করেন।[১৫]

খলিফার বই কেনা নেশা এত দূরে পৌছায় যে, দুষ্প্রাপ্য পান্ডুলিপিই তাঁর জন্য পছন্দসই রাজকীয় উপঢৌকন ছিল। ফলে মধ্যযুগের রাজকীয় লাইব্রেরীর মধ্যে খলিফা হাকামের লাইব্রেরী ছিল দুষ্প্রাপ্য পান্ডুলিপি ও অমূল্য গ্রন্থের সর্ববৃহৎ সংগ্রহশালা। কোন কোন ঐতিহাসিক পান্ডুলিপির সংখ্যা ৬,০০,০০০ লক্ষ উল্লেখ করেছেন। তবে কোন ইতিহাস লেখকই ৪,০০,০০০ লক্ষের কম উল্লেখ করেননি। অন্যদিকে মিসরের রাজকীয় গ্রন্থাগারে ছিল [আল আজিজের (মৃ.৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ) সময়ে] ২,০০,০০০, মুসতানসিরিয়া কলেজ গ্রন্থাগারে ৮০,০০০ (১২৩২ খ্রিস্টাব্দ) হাজার, সমকালীন আরব পন্ডিতগণ দ্বিতীয় হাকামের গ্রন্থাগারের দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান পুস্তক সংগ্রহের ভূয়সী প্রশংসা করেন।[১৬]

স্পেনের লাইব্রেরীসমূহে গ্রন্থ সম্ভারসহ সকল তথ্য সামগ্রীর সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত্ত করার জন্য তালিকাকরণ কার্য অপরিহার্য মনে করা হয়। বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থাগারসমূহে ক্যাটালগিং ছিল নিত্যকার কর্মসূচির অন্তর্ভূক্ত। হস্তলিখিত এই ক্যাটালগ অন্যান্য পান্ডুলিপির মতো যত্নের সাথে সংরক্ষিত হত। পরবর্তীকালে ঐ সব ক্যাটালগ অন্যান্য পান্ডুলিপির মত যত্নের সাথে সংরক্ষিত হত। পরবর্তীকালে ঐ সব ক্যাটালগের কিছু সন্ধান পাওয়া গেছে। কোনো কোনোটা দশ, কুড়ি, বা চল্লিশ খন্ড ব্যাপী বিস্তৃত। স্পষ্টত তখনকার ক্যাটালগের অন্ত:বিন্যাস ছিলো বিষয়ভিত্তিক।[১৭] পুস্তক সংগ্রহে ও বিষয়বস্তুরই ছিল প্রাধান্য, লেখক বা আকার নয়। গ্রন্থাগার অভ্যন্তরস্থ কক্ষে কক্ষে বিষয়ানুসারে বই পুস্তক সাজিয়ে রাখা হতো। আলমারীতেও তদনুরূপ। তাই আন্দাজ করতে কষ্ট হতনা, গ্রন্থাগার সংগঠনের প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জনে মধ্যযুগের স্পেনীয় মুসলমানদের লাইব্রেরী ছিল খুবই সার্থক। লাইব্রেরীগুলোতে গবেষক

---

[১৫] মোহাম্মদ সা'দাত আলী, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ৩৯।
[১৬] পি.কে.হিট্টি, *আরব জাতির ইতিহাস* (অনুবাদ: জয়ন্ত সিং, সেঁজুতি ভট্টাচার্য, সৌমিত্র সেন গুপ্ত) (কলকাতা: মল্লিক ব্রার্দাস, ২০০৫), পৃ. ৫২৯।
[১৭] মোহাম্মদ সা'দাত আলী, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ২৯।

পাঠকদের পৃথক পৃথক পাঠ কক্ষের ব্যবস্থাই ছিল, একই সাথে সভা, বক্তৃতা, বিতর্ক ইত্যাদির জন্য সুব্যবস্থা ছিলো যা আধুনিক অনেক লাইব্রেরীতেই বিরল দৃষ্টি হয়।[১৮]

ইবনে হাজমের সূত্র উল্লেখ করে ইবনে খালদূন ও মাক্কারীর মতে, তিনি হাকাম কর্তৃক মুক্ত, তাঁর লাইব্রেরী দেখাশোনায় নিযুক্ত খোজা তালিদের নিকট হতে অবগত হয়েছেন যে, লাইব্রেরীর অসমাপ্ত গ্রন্থতালিকা ৪৪ খন্ডে পরিব্যপ্ত ছিল। প্রতি খন্ডে ৫০টি শীটে বইয়ের নাম ও লেখকের নাম লিপিবদ্ধ ছিল। আধুনিক গ্রন্থাগার, বিজ্ঞানে গ্রন্থ সংরক্ষণ ও বাঁধাইয়ের নির্দেশিকাও তখন ছিল। সোনালি অক্ষরে গ্রন্থের নামগুলি সুন্দররূপে লেখা হত। খলিফা হাকামের রাজত্বকালে কর্ডোভাতে ৭২টি পাবলিক লাইব্রেরী গড়ে উঠেছিল।

স্পেনীয় মুসলিম গ্রন্থাগারসমূহে কর্মী সংখ্যার অপ্রতুলতা ছিলো না। প্রায় গ্রন্থাগারেই এই সংখ্যা শতকের কোঠা পেরিয়ে যেতো। যে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি গ্রন্থাগারিকের পদ অলংকৃত করতেন, আবশ্যিকভাবে তাঁকে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হতে হত। বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থাগারিক শাসনকর্তার নিকট থেকে উচ্চহারে সম্মাননা পেতেন। গ্রন্থাগারিক ব্যতীত অন্যান্য কর্মী অর্থ্যাৎ ছোট বড় সকল লাইব্রেরীতেই অনুলিপিকার, দপ্তরী, গৃহাভ্যন্তরে আলোকসজ্জার কাজে নিয়োজিত কর্মী, বুকসর্টার প্রভৃতিকেও 'লাইব্রেরীর' এই সম্মানসূচক নামে ডাকা হত।[১৯]

সে সময় কোথাও কোথাও বৃহদাকার লাইব্রেরী সুষ্ঠু পরিচালনার দায়িত্ব অ-গ্রন্থাগারিক; যেমন, ব্যবসায়ীদের উপরও অর্পিত হত। পন্ডিত ব্যক্তিদের চাইতে প্রশাসনিক কার্যে দক্ষ বিবেচিত হওয়ায় বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী বা অন্য কেউ লাইব্রেরীয়ান নিযুক্ত হতেন। লাইব্রেরীয়ানের সন্তান সন্ততিগণ পিতার পদ-মর্যাদার গৌরব অনুভব করত এবং নিজেরও ভবিষ্যতে অনুরূপ পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করত।[২০]

হাকাম তাঁর ভাই আব্দুল আজিজকে রাজকীয় গ্রন্থাগারের তত্ত্বাবধায়ক ও অপর ভাই মুনজিরকে শিক্ষা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োগ করেন। কখনও কখনও তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের শিক্ষিত জ্ঞানী গুণীদের সভায় সভাপতিত্ব করতেন। খোজা তালিদ ছিলেন তাঁর প্রধান গ্রন্থাগারিক। পুস্তক রাখার আলমারিগুলো তৈয়ার করা হত সুগন্ধিযুক্ত পালিশ করা কাঠ দ্বারা। আলমারির উপরে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত বাক্য, তাকে রক্ষিত পুস্তকগুলির বিষয়বস্তু নির্দেশ করত। রাজপ্রাসাদের কিছু কক্ষ অনুলিপি তৈরি ও পুস্তক দ্বারা

---

[১৮] *প্রাগুক্ত*,পৃ. ৩০।
[১৯] মোহাম্মদ সা'দাত আলী, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ২৯।
[২০] *তদেব*।

সুসজ্জিত ছিল। পুস্তক সমূহ বাঁধাই ও অঙ্গ সজ্জার জন্য সুদক্ষ নারী ও পুরুষ কর্মচারী নিয়োগ করা হত। দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোতে পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয় ও রাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যয়ে সেগুলি পরিচালিত হত।

বস্তুত: হাকাম কর্ডোভাকে একটি বইয়ের বাজারে পরিণত করেন। তিনি গ্রন্থ রচনা ও সংকলন কিংবা অনুবাদের আকর্ষণীয় পারিশ্রমিক প্রদান করেন। মৌলিক গ্রন্থের প্রথম সংখ্যা সংগ্রহের জন্য তাঁর চেষ্টা ছিল অপরিসীম। আবুল ফারাজ ইস্পাহানি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *কিতাবুল আগানি* রচনা করে এই বিদ্যোৎসাহী নরপতির নিকট হতে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা লাভ করেন। ষোল শতকে দ্বিতীয় ফিলিপস (১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দ-৯৮ খ্রিস্টাব্দ) ধ্বংসপ্রাপ্ত মুসলিম গ্রন্থাগার থেকে দু' হাজার গ্রন্থ সংগ্রহ করেন, যা পরবর্তীকালে মাদ্রিদের Escurial গ্রন্থাগারের ভিত্তি রচনা করে। কেননা ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দে স্পেনের মুসলমানদের বিতাড়িত করার সাথে সাথে খ্রিস্টানেরা লাইব্রেরীগুলোতেও অগ্নিসংযোগ করেছিল। যেটুকু দ্বিতীয় ফিলিপস রক্ষা করতে পেরেছিলেন আজও তা স্পেনের মুসলমানদের লাইব্রেরী স্থাপনের কথা স্মরণ করে দেয়।

কর্ডোভাতে সারা বিশ্বের প্রকাশিত পুস্তক ক্রয় বিক্রয় হত। কখনও কখনও প্রতিলিপির দোকানগুলি নারী কর্মচারীদের দ্বারা পরিচালিত হত। গয়না ও সিল্ক কাপড়ের দোকানগুলোর ন্যায় পুস্তক বিক্রয়ের দোকানগুলিতেও ক্রেতার ভীড় জমত। এ নগরীতে ২০,০০০ হাজার পুস্তক বিক্রয়ের দোকান ছিল। তাহলে নিশ্চিত বুঝা যায় এ নগরীর দেশে কয়েক লক্ষ টন কাগজ তৈরি হত। রোমানদের প্যাপিরাস ও চামড়ার কাগজের পরিবর্তে আরবরা তাদের নিজস্ব তৈরি কাগজ ব্যবহার করত। এর ফলে পুস্তক প্রকাশনার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং পুস্তকের মূল্য হ্রাস পাবার ফলে সাহিত্য ও বিজ্ঞান সাধকগণ উপকৃত হন।

কর্ডোভার সাহিত্যিক ও অভিধান সংকলক মুহম্মদ বিন আবি আল হুসাইন আল ফিহারী এবং জায়েনের অপর আরব পন্ডিত মুহম্মদ বিন মার্মার ছিলেন দ্বিতীয় হাকাম কর্তৃক নিযুক্ত বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের অন্যতম। যারা তাঁর গ্রন্থাগারের জন্য দুস্প্রাপ্য পুস্তক সংগ্রহে নিযুক্ত ছিলেন। নকলনবিশদের মধ্যে ছিলেন ইউসুফ আল বাল্লুতি ও সিসিলির আবুল ফজল বিন হারুন (মৃ: ৩৭৯ খ্রিস্টাব্দ/৯৮৯-৯০ খ্রিস্টাব্দ) ও আব্বাস বিন আমর এবং বাগদাদের জাফর অন্যতম। ব্যক্তিগত পুস্তক সংগ্রাহকদের মধ্যে কর্ডোভার ইবনে ফুতাইসের লাইব্রেরীর স্থান ছিল সর্বোচ্চ। এগারো শতকের প্রথম ভাগে এই লাইব্রেরীটি ৫০,০০০ দিনারের বিনিময়ে নিলামে বিক্রি হয়। লাব্বানা (মৃ. ৩৯৪ খ্রিস্টাব্দ /

১০০৪ খ্রিস্টাব্দ) গ্রন্থাগারিক তালিদের প্রধান সেক্রেটারি পরবর্তীকালে হাকামের ব্যক্তিগত সচিব নিযুক্ত হন। শিক্ষিত ও মার্জিত রুচির লেখক ফাতিমাহ ও লাব্বানাহ দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপির অনুসন্ধানে বহু দেশ ভ্রমণ করেন এবং মূল্যবান গ্রন্থে রাজকীয় গ্রন্থাগার সমৃদ্ধ করে তোলেন।

প্রতিটি বিখ্যাত লেখককে পুরস্কৃত করা হত। নতুন নতুন প্রকাশনাকে উৎসাহিত করার জন্য উদারভাবে দান করা হত। বাজারে প্রকাশের পূর্বেই লেখকের নিকট হতে কপি সংগ্রহের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা হত।বিশের সকল অংশে এমন কি মিসর, গ্রিস, সিরিয়া ও ইরান প্রভৃতি দূরদেশ হতে বিখ্যাত লেখকদের গ্রন্থ কর্ডোভায় প্রেরণ করা হত। কোন বিষয়ে কৃতিত্বপূর্ণ রচনার জন্য এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা পর্যন্ত উপঢৌকন দেওয়া হত। প্রসিদ্ধ লেখকগণ তাঁদের রচিত বহুগ্রন্থ দ্বিতীয় আল হাকামের নামে উৎসর্গ করতেন। এদের মধ্যে ৯৬১ খ্রিস্টাব্দে পঞ্জিকার উপর রচিত আবুল হাসান আবির বিন সাঈদ (মৃ. ৯৮০-৮১ খ্রিস্টাব্দ) *কিতাবুল আওয়াতিস সানাত* গ্রন্থখানি ও স্পেনে বসবাসকারী কায়রোওয়ানের মুহম্মদ বিন হারিস বিন আসাদ আল খুশানী (মৃঃ ৬৬১হিঃ/৯৭১ খ্রিস্টাব্দ) কর্তৃক রচিত *তারিক কুজাতিল কুরতবা* উল্লেখযোগ্য। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনুল কুতিয়াহ (মৃ. ৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ) স্পেনের উমাইয়া শাসকদের বংশ ইতিহাস রচনা করেন।

ইবনে জামামিন (১০০৭ খ্রিস্টাব্দ-৯ খ্রিস্টাব্দ) হাকামের লাইব্রেরীর জন্য ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে বহু পুস্তক রচনা করেন। অনান্য লেখকগণ যারা খলিফার নামে তাদের রচিত গ্রন্থ উৎসর্গ করেন তাঁরা হলেন ফানতি আওয়ারিয়া (কর্ডোভা) ইবনে মুফাররাজ, এলভিরার মুতাররিফ বিন ঈসা (মৃ. ৩৭৭ হিঃ/৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ) ও গোয়াদালজারার মুহম্মদ ইউসুফ, জায়েনের আহমদ বিন ফারাজ লিখিত *আল হাদায়েক* নামক কবিতার সংকলনটি তাঁর নামে উৎসর্গীত হয়। হাকামের পুত্র হিশামের গৃহ শিক্ষক আল জুবাইদি (মৃ : ৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ) কবি হিসাবে বিখ্যাত ছিলেন। সিরিয়ায় স্পেনের উমাইয়া খলিফাদের উপর রচিত কাব্য গ্রন্থসমূহ সংগ্রহের জন্য ইবলুস সফরকে নিয়োগ করেন। সরকারি দফতরে সেক্রেটারিদের দ্বারা বহুল ব্যবহৃত উন্নতমানের গদ্যরীতিতে লিখিত বহু পুস্তক ছিল যা এখন আর অবশিষ্ট নাই।

মূরদের আমলে স্পেনের গ্রন্থাগার সমূহে কেবল আরবি ভাষায় লিখিত গ্রন্থাবলি ছিল না, বিভিন্ন ভাষায় ও বিষয়ে লিখিত পুস্তকাদি সংরক্ষিত থাকত। প্রাচীন কালের (Classical) সমস্ত জ্ঞান এথেন্সের দর্শন, ব্যাবিলনের জ্যোতির্বিদ্যা, আলেকজান্দ্রিয়ার বিজ্ঞান এবং বর্তমানের যাবতীয়

আবিষ্কার কর্ডোভা ও সেভিলের মান মন্দিরে ও রাসায়নিক পরীক্ষাগারের দীর্ঘকালব্যাপী পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ফল সমস্তই এখানে পাওয়া যেত। ভারতের মৃৎভাষায় প্রাগৈতিহাসিক যুগে লিখিত রহস্যপূর্ণ গ্রন্থগুলোও গ্রিক ও আরবি অনুবাদের সাহায্যে সুদূর সিন্ধুতীর থেকে গোয়াডালকুইভার তটে নীত হতো। অনেক প্রাচীন গ্রিক গ্রন্থের মূল পুস্তক এখন আর পাওয়া যায়না। তাদের আরবি অনুবাদ থেকেই তা উদ্ধার করা হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এপোলোনিয়াস পার্গাসের Corie section- এর ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম খন্ডের উল্লেখ করা যেতে পারে। ৮ম খন্ড অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয়নি। মুসলিম মনীষীগণ হিব্রু, চীনা, পারসিক, সংস্কৃত বিষয়ে লিখিত গ্রন্থাবলি আরবিতে অনূদিত করে প্রাচীন জ্ঞান ভাণ্ডার সংরক্ষিত করেন।

এসময় মৌলিক গ্রন্থ রচনা ও অনুবাদের কাজ সমভাবে চলতে থাকে। গ্রিক ভাষায় লিখিত দর্শনের পুস্তক সমূহ অনুবাদ করানো হয়। সক্রেটিস ও প্লেটোর গ্রন্থাবলির প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করা হত। ইউক্লিড ও এরিস্টটলের গ্রন্থাবলি অনুবাদের জন্য অনুবাদ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। ভূ-তত্ত্বের উপর কবিতায় গ্রন্থ রচিত হয়। কৃষি মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। উদ্ভিদ বিজ্ঞান সম্পর্কে পুস্তক রচিত হয় এবং বৃক্ষের রোগ ও পুষ্টির উপর নানা প্রকারের পরীক্ষা নিরীক্ষা পরিচালিত হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণা এবং ঔষধের উপর গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক রচিত হয়। আবুল কাসেম অস্ত্রোপচার সম্পর্কে লিখিত পুস্তক *আল তাসরিকের* জন্য সুখ্যাতি লাভ করেন। আফ্রিকা, এশিয়া ও ইউরোপের জ্ঞানভান্ডার কর্ডোভায় কেন্দ্রীভূত হয়। এই সময় আন্দালুসিয়ায় গণশিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে।

বিত্তশালীরা তখন নিয়মিত লাইব্রেরী গড়তেন। লোক দেখানো কিংবা নিজস্ব ব্যবহার যেকোনো উদ্দেশ্যেই হোক, ব্যক্তিগত সংগ্রহ রাখা তখন প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গ্রন্থাগার ব্যতীত তখন আভিজাত্য প্রকাশ পেতনা। ঐতিহাসিকদের ও জীবনীকারদের লিপিবদ্ধ বিবরণ থেকে জানা যায়, সমসাময়িককালের অনেক ব্যক্তিগত সংগ্রহ উল্লেখযোগ্য প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল।[২১]

মুসলিম স্পেনের প্রায় প্রতিটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে ব্যক্তিগত পাঠগার পরিদৃষ্ট হত। এসব লাইব্রেরীর প্রকৃতি ও ধরণ দেখে অনেকেরই বিশেষ রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। কেউ সুন্দর হস্তাক্ষর সমৃদ্ধি লাইব্রেরী গড়ে তুলতেন, কেউ পছন্দ করতেন মনোমুগ্ধকর ও পরিপাটি বাঁধাই। কেউ কেউ লাইব্রেরীতে আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করতেন। এ সময় মুসলমান লিপিকারদের হাতে ক্যালিগ্রাফি বিশেষ এক কলা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। টানা হাতের লেখা অর্থ্যাৎ সুন্দর সুন্দর আরবি

[২১] মোহাম্মদ সা'দাত আলী, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ২২।

হস্তাক্ষর, লেখার ধরন ও কারুকার্য বা Cursive arabic script নামেই অভিহিত, শাসক গোষ্ঠী ও পন্ডিতবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় সমৃদ্ধির স্বর্ণশিখরে উঠে। চমকপ্রদ রঙে রঞ্জিত, বহুরঙ কালিতে দৃশ্যময় লেখায় চিত্রিত ও শোভিত, উঁচুমানের ভেলামের (ছোট বাছুরের চামড়া) ব্যবহারে তখন সে সমস্ত উৎকৃষ্ট মানের চমৎকার নয়ন মুগ্ধকর বই পুস্তক সৃষ্টি হত তা মুসলমানদের জ্ঞান সাধনার প্রতি একান্ত আগ্রহেরই পরিচয় বহন করে।[২২]

খলিফা হাকাম এর লাইব্রেরী গড়ার পেছনে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বিদগ্ধজনকে প্রাসাদ মুখী আকৃষ্ট করা। প্রকৃত পক্ষে তখন অনেক গবেষক পন্ডিতই তাঁর এই লাইব্রেরীর প্রতি প্রলুব্ধ হতেন। উল্লেখ্য যে, সেকালে একটি খ্রিস্টান আশ্রমে মাত্র কয়েকশত খন্ড বই থাকলেও তাকে বিদ্যার এক বিরাট কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করা হত। খলিফার লাইব্রেরী ছিল বিশ্ব জ্ঞানভাণ্ডার বিদ্যাপীঠ। খলিফা হাকামের পৃষ্ঠপোষকতা হত। তারা এ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেরাও অনুরূপ লাইব্রেরী গড়ায় উৎসাহী হয়ে উঠেন। প্রকৃতপক্ষে খলিফা দ্বিতীয় হাকামের উদ্দেশ্যও ছিল তাই।[২৩]

মহৎ উদ্দেশ্যে প্রদত্ত শ্রম বিফলে যায়না। খলিফা দ্বিতীয় হাকামের পরিশ্রম সার্থক হয়েছিল। দেখা গেল, সুন্দর ও মনোরম কারুকার্যময় মলাটের বই, সুখপাঠ্য বই গবেষণামূলক বইপত্রে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে কর্ডোভার বই বাজার। সেকালের কর্ডোভার মুসলমানগণ কতোটা যে গ্রন্থপ্রিয় হয়ে উঠেছিল; একটি অতি সাধারণ ঘটনা থেকে সুস্পষ্টরূপে তা পরিস্ফুট হয়ে উঠে। একজন মুসলমান গ্রন্থপ্রিয় ব্যক্তি, লেখায় ও তাঁর হাতযশ ছিলো, কর্ডোভার বইপত্রের প্রাচুর্যের মধ্যে থেকে তিনি কোনটা রেখে কোনটা কিনতেন, কোনটা রেখে কোনটা পড়বেন ঠাউরে উঠতে পারেননি। অবশেষে পছন্দের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েও উষ্মা প্রকাশ করে কৌতূহলোদ্দীপক এক মজাদার বিবরণ রেখে যান। জনৈক ঐশ্বর্যশালী ব্যবসায়ী নেহায়েত তার বুক শেলফ্ সাজিয়ে রাখার জন্য পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ এই বিবরণটি কেনেন। কর্ডোভার জনগোষ্ঠীর জ্ঞান অনুন্ধিৎসা নিবৃত্ত করার জন্য একদল অতুৎসাহী নকলনবিসের বদান্যতায় এই কাহিনী গ্রন্থটির অনুলিপি হতে থাকে। পরিশেষে লক্ষ্য করা যায়, প্রতি বছরই প্রায় ৭০ হাজার অনুলিপি জাত পাণ্ডুলিপি কর্ডোভার গ্রন্থপ্রিয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিলি বন্টন হয়েছে।[২৪]

কর্ডোভার খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও ক্ষমতায় শৌর্যবীর্যের কাহিনী তখন জনপ্রিয়তার এত শীর্ষে যে, সে সময় উত্তর স্পেনের খ্রিস্টান শাসকবৃন্দ রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যা, এমনকি তাদের ব্যক্তিগত

---

[২২] *প্রাগুক্ত*,পৃ. ৩০।
[২৩] *প্রাগুক্ত*,পৃ. ৩৯।
[২৪] মোহাম্মদ সা'দাত আলী, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ৩৯।

সমস্যাবলীর ও সমাধানকল্পে বিনীতভাবে কর্ডোভার সাহায্য ও উপদেশপ্রার্থী হয়েছেন। খ্রিস্টান শাসকগণ অভীষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনে সরাসরি খলিফার আতিথ্য গ্রহণ করতেন। এমন সুযোগ পেলে বরং তারা গৌরাবান্বিত বোধ করতেন।[২৫] Sancho the Fat নামক রাজ্যহারা একজন খ্রিস্টান শাসক একবার তাঁর সিংহাসন পুনরুদ্ধার ও দেহের স্থুলতা কমানো এবং স্থুলজাতনিত রোগ নিরাময়কল্পে কর্ডোভা ভ্রমণ করেন। স্যাংকোর উভয় আবেদনই কর্ডোভার মুসলমান সরকার সহানুভূতির সাথে এবং দৃঢ়হস্তে ফয়সালা করেন। কর্ডোভা সরকার এ কাজে কৃতকার্য হন। কিম্ভুত কিমাকার সাংকোর দেহের স্থুলতা কমানোর জন্য খলিফার জনৈক ইহুদি চিকিৎসককে নিয়োগ করা হয়। অল্প সময়ে রোগী আরোগ্য লাভ করেন। ক্ষমতাচ্যুত সম্রাট সাংকোই কর্ডোভার উদারতার উদাহরণ নয়, স্পেনের বিভিন্ন সীমান্ত এবং সীমান্তের বাইরে থেকেও বহু বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিত্বের সমাবেশ ঘটতো এই কর্ডোভায়।[২৬]

মুসলিম কর্ডোভার এই ঘটনা অতি সাধারণ। দিকহারা উদ্ভ্রান্ত জন গোষ্ঠীর কেউ শান্তির ধর্ম ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় সন্ধানে, কেউ বা বিজ্ঞ মুসলিম পণ্ডিতবর্গের নিকট আরো অধিক জ্ঞান লাভের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য এখানে আসতেন। তাই কর্ডোভা অনন্য, অমর, অম্লান, অহংকার; কর্ডোভা সকলের চিত্তাকর্ষক ও রুচির মধ্যমনি। মুসলিম কর্ডোভার শাসকদের এই উদারতা অনেকেরই ঈর্ষার কারণ। বহু খ্রিস্টান পণ্ডিতও তাদের অনুসারী এমনকি অনেক মুসলিম পণ্ডিত প্রচারককেও এসব ঘটনা আশঙ্কিত করে তুলতো।[২৭]

৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে খলিফা হাকাম ইন্তিকাল করলে তার মৃত্যুর পর ইবনে আবি আমির এর উপর শাসনভার ন্যস্ত হয়। আবি আমির জনগণের নিকট আল মনসুর নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন মুসলমানদের নিকট একজন বিজেতা এবং খ্রিস্টানদের নিকট বিশ্ব ত্রাস আল মনসুর। রাজকার্যে তাঁর যাত্রা শুরু হয় খলিফা হাকামের শিশুপুত্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী হিসেবে; কিন্তু পরে তিনি নিজেই অধ্যবসায়গুণে প্রধানমন্ত্রী ও সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসাবে আত্মপ্রকাশে সমর্থ হন।[২৮]

কর্তব্যনিষ্ঠা ও ধর্মানুরাগ এবং তাওহিদী বলে বলীয়ান এই তেজ্যেদীপ্ত পুরুষ নিজ সীমান্ত রক্ষার পরে ও খ্রিস্টান সাম্রাজ্যের বহু গভীরে আক্রমণ পরিচালনা করেন ও একাধিক অঞ্চল জয় করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে এবং সৈন্য পরিচালনাকালে তাঁর হাতে থাকত আল কুরআন। তিনি একের পর এক রাজ্য জয় করে সুদূর বার্সেলোনা, লিয়োঁ, সান্টিয়াগো পর্যন্ত দখল করেন। খ্রিস্টান ঐতিহাসিকগণ তাঁর এসব

[২৫] *প্রাগুক্ত*,পৃ. ৪০।
[২৬] *তদেব*।
[২৭] মোহাম্মদ সা'দাত আলী, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ৩৭।
[২৮] *প্রাগুক্ত*,পৃ. ৪০।

সফল কার্যক্রমের উপরে এই বলে কলঙ্ক দেন যে, আল মনসুর তাঁর কর্মসূচীর যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য নির্বিচারে পার্শ্ববর্তী দেশ আক্রমণ করে বেড়ান। তাঁরা বলেন, আল মনসুর ফকীহ্‌দের সমর্থন আদায় কিংবা আশ্বস্ত করার জন্য আল হাকামের বিখ্যাত লাইব্রেরীর বহু সংখ্যক গ্রন্থ লাইব্রেরী বিশুদ্ধকরণ এর নামে ছাঁটাই বা বিনষ্ট করেন।[২৯]

খলিফা হাকামের রুচি মাফিক সংগৃহীত কবিতা, ইতিহাস, ও বিজ্ঞানের প্রচুর বই আল-মনসুরের নির্দেশে গ্রন্থাগারের বাইরে ছুঁড়ে ফেলা হয় এবং কতক মাটির নিচে পুঁতে ধ্বংস করা হয়। এতে তাঁর ঐ বিশুদ্ধকরণ অভিযানে লাইব্রেরীটি ধ্বংস হয়নি বরং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

ইবনে আবি আমিরের (আল মনসুর) ১০০২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ হয়। আল মনসুর এর ক্ষমতালিপ্সু সেনাপতি ও আল মনসুরের ছেলের মধ্যে রাজনৈতিক ও সামরিক কোন্দলে স্পেনে মুসলিম সাম্রাজ্য ভাঙ্গনের সূত্রপাত হয়। কোন্দল থেকে সংঘর্ষ। যার ফলে পরবর্তী সাতবছরে কর্ডোভা বিরান হয়ে যায়। সে সময়ে কর্ডোভার শাসনে বারবারিয়ান ও ক্যাস্টালিয়ান সেনাবাহিনী, যাদের বর্বরতায় রাজপ্রাসাদও বিরানভূমি হয়ে যায়। দুঃখজনক হলেও সত্যি, হাকাম প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরীর অবশিষ্ট সম্পদরাজি এবং অনেকের ব্যক্তিগত লাইব্রেরী বর্বর সেনাবাহিনীর ইচ্ছার নিকট পদদলিত হয়ে বিভিন্ন সময়ে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে এবং বিনষ্ট হয়ে যায়।[৩০]

খ্রিস্টান ঐতিহাসিকগণ বলেন, দুষ্ট রাহু কর্তৃক কর্ডোভার এই গ্রাস স্পেনে মুসলমানদের সভ্যতার ও সংস্কৃতির সম্পূর্ণভাবে অবলুপ্তি ঘটাতে পারেনি। যদিও আল মনসুরের পর মুসলিম সাম্রাজ্য খন্ড খন্ড ছোট রাজ্যে পরিণত হয়, তবু শিক্ষা-সংস্কৃতি শিল্পকলায় তারা দেদীপ্যমান আলোকবর্তিকা হিসেবে টিকেছিল আরো অনেক দিন।[৩১]

নয় ও দশ শতকে সিসিলি মুসলিম শাসনের অন্তর্ভূক্ত হয়। সার্দিনিয়া এবং কোরশিফা ও অনুরূপভাবে তখন মুসলিম শাসনের প্রভাবে প্রভাবিত। সাধারণভাবে বলা হয়, মুসলমানগণ রাজ্য জয় ও পার্শ্ববর্তী অমুসলিম দেশগুলোর সাথে যুদ্ধ বিগ্রহের কারণে ছোট শহরগুলোতে ও তাঁবু ফেলতেন। জীয় হলে স্থায়ী আবাস নির্মাণের জন্য চলতো উন্নয়ন কর্ম। প্রয়োজন হতো গ্রন্থাগারেরও। এভাবে ছোট ছোট শহরগুলোতেও লাইব্রেরী গড়ে ওঠে। এমন একটা সময় ছিলো যখন শহুরগুলোতেও লাইব্রেরী গড়ে উঠে। এমন একটা সময় ছিলো যখন মুসলমান শাসকরা শুধু শাসনকার্য নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন না, তাঁরা

---

২৯ *প্রাগুক্ত*,পৃ. ৪১।

৩০ মোহাম্মদ সা'দাত আলী, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ৪১।

৩১ *তদেব*।

জ্ঞান-চর্চাও করতেন। সে কারনে মুসলিম স্পেনে আরেক ঐতিহ্য ব্যক্তিগত লাইব্রেরী। উল্লেখ্য সে সময় ব্যক্তিগত লাইব্রেরী স্থাপনের হিড়িক পড়েছিল। স্পেনে তখন সেসব পাঠাগার স্থাপিত হয় সেসব কোনো না কোনোভাবে বিদ্যালয়, মসজিদ ও রাজ্যপ্রাসাদ সংশ্লিষ্ট ছিল।[৩২]

খ্রিস্টানরা ১০৮৫ খ্রিস্টাব্দে টলেডো পুনর্দখল করে। এ সময়ে তারা টলেডোতে মুসলমানদের রচিত ও অনূদিত প্রচুর সংখ্যক আরবি গ্রন্থ দেখতে পায়। পরবর্তীতে এসব গ্রন্থের কিছু পশ্চিম ইউরোপীয় বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়। অবশিষ্টাংশ বিভিন্ন কারণে ধ্বংস হয়ে যায়। এরও প্রায় বছর পনের আগে ১০৭০ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ পণ্ডিত Daniel of Morley টলেডো ভ্রমণ করেন। সেখানে অবস্থানকালে তিনি কিছু আরবিতে লেখা বিজ্ঞানগ্রন্থ সংগ্রহ করেন এবং স্বদেশে নিয়ে আসেন। জেরার্ড নামক একজন বিজ্ঞানী জীবনের অধিকাংশ সময় টলেডোতে কাটান। মুসলিম টলেডোতে অবস্থানকালে তাঁর একমাত্র তপস্যা ছিল বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা কর্ম ও অন্যান্য বিজ্ঞান পুস্তক অনুবাদ করা। তিনি আরবি থেকে ল্যাটিনে এসব অনুবাদ করতেন তাঁর অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যা সত্তরটিরও অধিক।[৩৩]

জেরার্ড সাহেবের বাড়ি ইতালির ক্রেমোনা প্রদেশে এবং তিনি জেরার্ড অব ক্রেমোনা নামেই সমধিক খ্যাত ছিলেন। এই জ্ঞানতাপের সঠিক জন্মতারিখ পাওয়া যায়না। জেরার্ড অব ক্রেমোনা অনূদিত অধিকাংশ বই মূল গ্রিক থেকে আরবি পণ্ডিতদের দ্বারা আরবিতে ভাষান্তরিত করা ছিল। তিনি নিজেও ভালো আরবি জানতেন। তাই অনুবাদ অভিযান সহজতর হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, জেরার্ড অব ক্রেমোনা শুধু আরবি গ্রন্থই বেছে নিতেন। জেরার্ড অব ক্রেমোনা কেনো টলেডোতে এসেছিলেন তাঁর পেছনে দুটি উদ্দেশ্য ছিল প্রথমত, আরবি শেখা এবং দ্বিতীয়ত, আরবি থেকে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান পুস্তক অনুবাদ করা। কারণ মুসলমানরা ছিল তৎকালীন জ্ঞান বিজ্ঞানের ধারক ও শ্রেষ্ঠ দিক দ্রষ্টা।[৩৪]

টলেডো ছিল জগৎ বিখ্যাত বিদ্যা শিক্ষাকেন্দ্র। জেরার্ড অব ক্রেমোনা জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত জ্ঞান সাধনা অব্যাহত রেখে গেছেন। চিকিৎসাবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন ও বিশেষ করে মনীষী ইবনে সিনার চিকিৎসা গ্রন্থের অনুবাদের প্রতি তিনি তৃষ্ণার্ত ছিলেন।[৩৫]

---

[৩২] *প্রাগুক্ত*,পৃ. ২১।
[৩৩] *প্রাগুক্ত*,পৃ. ৩৫।
[৩৪] মোহাম্মদ সা'দাত আলী, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ৩৫।
[৩৫] *তদেব*।

আত্মকলহ, ক্ষমতালিপ্সা মানুষকে যেমন অহংকারী করে তুলেছিল তেমনি এর পরিণতিতেও ভয়ানক বিপর্যয় ঘটায়। সে সময়ে স্পেনে মহল্লায় ও শহরতলির ছোট ছোট বসতিতেও পাঠাগার সদৃশ পাঠ কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। ফলে শিক্ষার হার বেড়েছে প্রচুর। মুসলমানদের মধ্যে জন্মেছে আরো পন্ডিত। মুসলমানদের এ গৌরবোজ্জ্বোল দিনগুলোর ইতিহাস ঐতিহাসিকদের বিভিন্ন ইতিবৃত্তে মূর্ত হয়ে উঠে। অথচ ষোড়শ শতকের স্পেনে, মুসলমানদের বিতাড়নের পর তখন শত বছরও পেরোয়নি। রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ Escurial Library প্রতিষ্ঠাকালে সমগ্র স্পেন জুড়ে একটি আরবি পান্ডুলিপি ও তাঁর সংগ্রহের দু:খ মর্মে মর্মে অনুভব করা যায়। রাজা ফিলিপ প্রতিবেশী দেশ মরক্কো থেকে স্পেন সম্পর্কিত চার হাজার আরবি পান্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। মধ্যযুগের মুসলমানদের লাইব্রেরী উন্নয়ন, সমৃদ্ধি ও সম্পদরাজির এত প্রাচুর্য ছিলো যে, এসবের ধ্বংসযজ্ঞে ঐতিহাসিকগণ মর্মাহত না হয়ে পারেননি।[৩৬]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আটশতক থেকে শুরু করে পনের শতক পর্যন্ত খ্রিস্টান ইউরোপ ভূ-খন্ডে ইসলামের জ্ঞান বিজ্ঞানের মশাল প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল। জ্ঞান বিজ্ঞানের ছোঁয়ায় ভরপুর হয়ে উঠেছিল মুসলিম স্পেন। কর্ডোভা লাইব্রেরীসহ স্পেনের অলিতে গলিতে গড়ে উঠেছিল বইয়ের বাজার। যে কেউ এক নজর দেখলেই বুঝতে পারত মুসলিম স্পেন জ্ঞান-গরিমা ও বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডে কতটা সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। ইতিহাসের যে সময়টায় গোটা ইউরোপ ডার্ক এজ তথা অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, তখন প্রায় সমগ্র পৃথিবী শাসন করেছে মুসলমানগণ। অথচ আজকের মুসলিম বিশ্ব অবক্ষয়ের চোরাবালিতে নিমজ্জিত। ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে অন্যান্য জাতির ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটেছে। ভারতীয়, চৈনিক, গ্রিক, রোমান ও খ্রিস্টিয় সভ্যতা একে একে এ পথেই নিজেদের নিঃশেষ করেছে। কিন্তু ইউরোপ কয়েক শতক অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকার পর বহুলাংশে আরব মুসলিমদের মাধ্যমে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত হয়ে অবাধ জ্ঞান-চর্চার এবং মুক্তবুদ্ধির উপযোগী করে গড়ে তোলে নিজেদের। এই পুনরাবির্ভাবই রেনেসাঁ যা বিজ্ঞানকে, প্রকৃতপক্ষে সত্যকে, দ্বিধাহীন চিত্তে স্বীকারের মাটি প্রস্তুত করে সারা ইউরোপে। জ্ঞানগরিমায় ভরপুর বর্তমান ইউরোপ সম্পূর্ণ তৎকালীন মুসলিম স্পেনের অবদান।

---

[৩৬] *প্রাগুক্ত*,পৃ. ৩২।

ষষ্ঠ অধ্যায়
ফাতেমীয় আমলে মিসরে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের অগ্রগতি

ফাতেমীয় বংশের উদ্যোগে মিসরে ইসলামের একমাত্র প্রধান ও শক্তিশালী শিয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। বাগদাদের সুন্নি আব্বাসিয় খিলাফত বিরোধী এই শিয়া খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সায়িদ ইবনে হুসাইন। এই বংশ সর্বপ্রথম ৯০৯ খ্রিস্টাব্দে তিউনিসে স্থাপিত হয়। আব্বাসিয় খিলাফতে ইসমাইলি সম্প্রদায়ের প্ররোচনা ও ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপের পরিণতিস্বরূপ ফাতেমীয় রাজবংশ স্থাপিত হয়। ইসমাইলি প্রচারনার অগ্রভাগে ছিলেন ইয়েমেনের অন্তর্গত সাধারণ অধিবাসী আবু আব্দুল্লাহ আল হুসাইন আশ শি'য়ী। আবু আব্দুল্লাহর গুরু ছিলেন দক্ষিণ পারস্যবাসী আব্দুল্লাহ বিন মায়মুন। তিনি আব্বাসিয় স্বার্থবিরোধী কার্যে লিপ্ত থাকেন এবং আহওয়াজ ও সিরিয়া অঞ্চলে ইসমাইলিয় শিয়া মতবাদ প্রচারের জন্য দাই অর্থ্যাৎ প্রচারক প্রেরণ করেন। তাঁর চেষ্টায় বার্বার ও কাতামা গোত্রের মধ্যে ইসমাইলি মতবাদ প্রসারিত হয়।

৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে আব্দুল্লাহর মৃত্যু হলে তাঁর সুযোগ্য প্রতিনিধি ও শিষ্য আব্দুল্লাহ আল হুসাইন ইসমাইলিয় মতবাদ প্রচার করতে থাকেন এবং নবম শতকে উত্তর আফ্রিকায় একটি শক্তিশালী দূর্গ নির্মাণ করেন। উত্তর আফ্রিকার সুন্নি আগলাবিয় রাজবংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান জিয়াদাতউল্লাহ (৯০৩ খ্রিস্টাব্দ-৯০৯ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর রাজ্যের ইসমাইলিয় মতবাদ প্রচার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং প্রচারিক সা'য়িদ ইবন হুসাইনকে কারারুদ্ধ করেন। আব্দুল্লাহর তৎপরতায় সা'য়িদ মুক্তি লাভ করেন। ৯০৯ খ্রিস্টাব্দে জিয়াদাতউল্লাহর সাথে আব্দুল্লাহর সংঘর্ষ বাধে এবং জিয়াদাতউল্লাহ পরাজিত হন। এর ফলে আগলাবিয় বংশ লোপ পায়।

আব্দুল্লাহর সামরিক সাফল্যের ফলেই আগলাবিয় বংশের স্থলে উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমীয় রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। আব্দুল্লাহর আহ্বানে সা'য়িদ ইবনে হুসাইন ওবায়দুল্লাহ আল মাহদি উপাধি ধারণ করে কায়রোয়ানের নিকটবর্তী রাক্কাদায় ফাতেমীয় রাজবংশের সিংহাসনে উপবেশন করেন।[১] ওবায়দুল্লাহ ফাতেমীয় বংশীয় কিনা সে বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে। মাকরিজি, ইবনে খালদুন, ইবন উল আমির প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ তাঁকে ফাতেমীয় বংশোদ্ভূত মনে করলেও ইবনে খাল্লিকান, সুয়ূতি, ইবন-তাগরিবিরদি বিরোধি তাঁদের সাথে হযরত আলী (রা:) এর সম্পর্কের কথা অস্বীকার করেন। এই

---

[১] খন্দকার মাশহুদ-উল-হাছান, *আরবের ইতিহাস* (ঢাকা: জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, বাংলা বাজার, ২০০৩), পৃ. ৪৫৮।

মতানৈক্যের সূত্রপাত হয় ১০১১ খ্রিস্টাব্দে যখন আব্বাসিয় খলিফা আল কাদির প্রখ্যাত সুন্নি ও শিয়া আলেমদের দ্বারা স্বাক্ষরিত একটি ফরমানের ভিত্তিতে ঘোষণা করেন যে, সমসাময়িক ফাতেমীয় খলিফা হাকিম হযরত আলী (রা:) এর এবং বিবি ফাতেমার বংশধর নন; তিনি আসলে দাইসান নামক এক ধর্মবিরোধীর বংশধর। যাইহোক, বিবি ফাতেমার নামানুসারে শিয়া বংশ ফাতেমীয় বংশ নামে পরিচিত।

এই ফাতেমীয় খিলাফত ৯০৯ খ্রিস্টাব্দ হতে ১১৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত টিকে ছিল। এ সময়কালে স্পেনের উমাইয়া খলিফাদের ন্যায় মিসরের ফাতেমীয় খলিফাগণ জ্ঞান বিজ্ঞানে ব্যাপক অবদান না রাখলে ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছিল। ফাতেমীয় শাসনামলের প্রথম দিকে খলিফাগণ খিলাফত নিয়ে ব্যস্ত থাকায় জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি তেমন দৃষ্টিপাত করতে পারেননি। তবুও ফাতেমীয় খিলাফতের চতুর্থ খলিফা আল মুইজের সময় (৯৫২ খ্রিস্টাব্দ-৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ) জ্ঞান বিজ্ঞানের ব্যাপক উৎকর্ষতা লাভ করে।

খলিফা আল মুইজ জ্ঞান বিজ্ঞানের একজন উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি নিজে একজন পন্ডিত ছিলেন এবং তৎকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক আমীর আলী বলেন, "তিনি নি:সন্দেহে মুসলিম পাশ্চাত্যের মানুষ ছিলেন এবং তাঁর শাসনকালে উত্তর আফ্রিকা সভ্যতা ও সমৃদ্ধির উচ্চ শিক্ষার শীর্ষে আরোহন করে।"[২] তিনি জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে জ্ঞানী ও গুনীদের সমাদর করতেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ইয়াকুব বিন কিল্লিস, হুসান, জাফর বিন মনসুর, আল ইয়ামান কবি ইবনে হানি। খলিফা মুইজের প্রধান চিৎিসক মুসা বিন গাজাল ছিলেন একজন ইহুদি ভেষজবিজ্ঞানী। আর সাদিক বিন বিতরিক ছিলেন একজন খ্রিস্টান। খলিফা মুইজ ছিলেন খুবই সদয়, অমায়িক ও রুচিসম্পন্ন ব্যক্তি। বাগ্মিতা ও ভাষা চর্চায় তিনি বুৎপত্তি অর্জন করেন। তাঁর উৎসাহে বহু জ্ঞানী গুণী দরবারের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। তাঁর সময় আরবি থেকে বহু পুস্তক ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন।

ফাতেমীয় খলিফা আল আজিজ (৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ-৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ) ছিলেন একজন বিদ্যানুরাগী ও জ্ঞানবিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক। তাঁর সময়ে আলী ও মুহাম্মদ ভ্রাতৃদ্বয় আইন ও দাওয়ার ওপর অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি নিজেও কবিতা পছন্দ করতেন এবং তা আবৃত্তি করতেন।[৩]

---

[২] সৈয়দ আমীর আলী (অনু-শেখ রেয়াজুদ্দীন আহম্মেদ), *আরব জাতির ইতিহাস* (ঢাকা:বাংলা একাডেমী, বর্ধমান হাউস, ১৯৯৫),পৃ. ৫০৭।

[৩] খন্দকার মাশহুদ-উল-হাছান,*প্রাগুক্ত*,পৃ. ৪৬০।

খলিফা আল হাকিম (৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ-১০২১ খ্রিস্টাব্দ) নি:সন্দেহে জ্ঞান বিজ্ঞানের একজন শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; তাঁর আমলে বহু মাদ্রাসা, মসজিদ, মানমন্দির নির্মিত হয়েছিল। আবু রাকওয়ার বিদ্রোহের পর আল হাকিম জামিয়া হাকিম এবং জামিয়া রাশিদা মসজিদে ধর্মীয় বিষয়ে পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করেন। আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তিনি অধিক আর্থিক বরাদ্দ দেন। ক্বারাফাতে একটি মানমন্দির নির্মাণ করেন। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হচ্ছে বাগদাদের বায়তুল হিকমা'র অনুরূপ দারুল হিকমা প্রতিষ্ঠা। সেখানে জ্যোতির্বিদ, ব্যাকরণবিদ, দার্শনিক, ধর্মতত্ত্ববিদ, পণ্ডিত ও গবেষকদের স্থান দেন। ক্বারাফা মান মন্দিরের দায়িত্বে ছিলেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী আলী বিন ইউনুস । খলিফা আল হাকিম কায়রোর মুকাত্তাম পাহাড়ে একটি মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন; এর সাথে সমসাময়িক জ্যোতিষী হাম্মাদের নাম জড়িত রয়েছে। খলিফা আল হাকিমের দরবারে বহুজ্ঞানী গুণীর সমাবেশ হয়। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক মুসাব্বিহ, পণ্ডিত আবু বকর আল আনটাকি, চক্ষুরোগ বিশারদ ইবন আল হায়সাম প্রমুখ।

ফাতেমীয় খলিফাগণ সংস্কৃতিমনা ছিলেন। বিদ্বান ও প্রতিভাবান ব্যক্তিবর্গ স্বভাবত তাঁদের সমাদর পেতেন। কেননা ফাতেমীয় খলিফারা জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চায় উৎসাহ দান করতেন।[৪] ফাতেমীয় খলিফা মুইজ চিকিৎসা বিদ্যা ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান চর্চায় বিশেষ উৎসাহ দিতেন। তিনি ইহুদি চিকিৎসক মুসা বিন আল গাজাল কে দুই পুত্র (ইসহাক ও ইসমাইল)সহ চাকুরিতে নিযুক্ত করেন। কেবল চিকিৎসক হিসেবেই এরা খ্যাতি লাভ করেননি। মুসার ওষুধ প্রস্তুতকরণ বিদ্যা সম্পর্কে অগাধ পান্ডিত্য ছিল। তার একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগারও ছিল এ সম্পর্কিত। পিতা পুত্রদ্বয় চিকিৎসক মহলে অতিপরিচিত ছিলেন। মুসা বিন গাজাল তৎকালীন বিশ্বে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভেষজবিজ্ঞানী ছিলেন। তাঁর সময়ে আলেকজান্দ্রিয়ার ইউটিকিয়াস যাজক সাইদ বিন বাতরিক । আরবি থেকে বহু পুস্তক ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি একটি ইতিহাস রচনা করেন; ১৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে অক্সফোর্ডে তার আরবি ও ল্যাটিন সংস্করণ বের হয়।

ফাতেমীয় খলিফাদের ন্যায় উজিরগণও কবি, পন্ডিত ও আলেমদের প্রতি সহৃদয়তা ও সদাশয়তার পরিচয় দিতেন।[৫] তাদের মধ্যে ইয়াকুব বিন কিল্লিস অন্যতম। ফাতেমীয় মিসরকে জ্ঞানের আলো দেখাবার কৃতিত্ব বহুলাংশেই ইবনে কিল্লিসের। তিনি একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করেন। তিনি প্রতি মাসে এক হাজার দিনার খরচ করতেন এই প্রতিষ্ঠানের জন্য। তাঁর সময়েই বিখ্যাত চিকিৎসাবিদ

---

[৪] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *স্পেন ও উত্তর আফ্রিকার মুসলিম শাসনের ইতিহাস* (ঢাকা: উত্তরণ প্রকাশন, বাংলা বাজার, ২০০৫), পৃ. ২৮৭।

[৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৭।

মুহম্মদ আল তামিমি জেরুজালেম থেকে মিসরে আসে এ যুগের দুইজন উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক মুহম্মদ ইবনে ইউসুফ আল কিনদি ও ইবনে সালমা আল কুজায়ি।[৬]

উজির ইবনে কিল্লিস প্রতি বৃহস্পতিবার রাতে সমবেত আলেম, পণ্ডিত, আলংকারিক ও বৈয়াকরণিকদের নিকট স্বরচিত কবিতা পাঠ করতেন। কবিরাও তাঁদের কবিতা আবৃত্তি করতেন। এগুলো হত সাধারণত তাঁর স্তুতিগাঁথা পাণ্ডুলিপি নকল করার জন্য তিনি একদল কর্মচারী রাখতেন। প্রত্যহ বহু বিদ্বান ও অন্যান্য অতিথি তাঁর গৃহে আহার করতেন। তাঁর কুতুবখানার অধ্যক্ষ একখানা ইতিহাসগ্রন্থ লেখেন। সালামি এন্টিয়কের আবু কারমাক কে (১০০৮ খ্রিস্টাব্দ-০৯খ্রিস্টাব্দ) সে যুগের মুক্তা, উৎকৃষ্ট গুণের সংযোগ এবং সুদক্ষ বলে বর্ণনা করে গেছেন। তিনি ছিলেন ইবনে কিল্লিসের দরবারের অন্যতম জ্যোতিষ্ক। উজির এবং খলিফা আল মুইজ, আজিজ ও হাকিমের প্রশংসা করে তিনি অনেক কবিতা রচনা করেন। মিসরীয় ইবনে গুলাক কাজিদের একখানা ইতিহাস রচনা করেন।[৭]

প্রকৃতপক্ষে কাজি আল নোমান এবং তাঁর পুত্র ও পৌত্রেরাই ছিলেন প্রাথমিক ফাতেমীয় আমলের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত লোক। মিসর জয় থেকে খলিফা আল হাকিমের রাজত্বকালের প্রথম ভাগ পর্যন্ত তাঁরা ধর্ম ও আইন বিভাগের সর্বোচ্চ পদ অলংকৃত করেন। ফাতেমীয় খলিফারা তাদেরকে অনেক বিশেষ অধিকার দেন এবং তাদের পরিবারকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করতেন। নোমানের পরিবার ফাতেমীয় আইন প্রণয়ন করেন। কাজির ন্যায় তাঁরা কেবল সুশিক্ষিত আইনজ্ঞ ও উপযুক্ত বিচারপতি ছিলেন না; তাঁরা ছিলেন সে যুগের সর্বোচ্চ বিদ্যায় বিভূষিত। আরবি সাহিত্যের সমস্ত শাখায় তাঁদের দখল ছিল; কবি এবং ঐতিহাসিক হিসেবেও তাঁদের খ্যাতি কম ছিলনা।

খলিফা আল হাকিমের আরেকজন কর্মচারী ছিলেন আল মুসাবিহি নামে। তিনি বংশীয়ভাবে মিসরীয় ছিলেন। তিনি ২৬০০০ পৃষ্ঠায় *মিসরের ইতিহাস* নামে এক বিশাল গ্রন্থ রচনা করেন। ধর্ম, কবিতা, জ্যোতিষ, সাহিত্য, পাক প্রণালী ও ইতিহাসের অভিনব ব্যাপার সম্পর্কে তার ২৫০০০ পৃষ্ঠার পুস্তক ছিল। ফাতেমীয় খলিফাদের সময়ে বহু বিদেশি পণ্ডিত মিসরে আসেন। ইস্পাহানের একজন বিখ্যাত আলেম ও মোহাদ্দেস ছিলেন আলেকজান্দ্রিয়ার শাফেয়ি কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ। এছাড়াও ঐতিহাসিক ও আইনজ্ঞ *আলকুযাই* ও বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ আবু ইয়াকুব উল্লেখযোগ্য। কবিতা ও

---

৬ পি.কে.হিট্টি, *আরব জাতির ইতিহাস* (অনুবাদ: জয়ন্ত সিং, সেঁজুতি ভট্টাচার্য, সৌমিত্র সেন গুপ্ত) (কলকাতা: মল্লিক ব্রার্দাস, ২০০৫), পৃ. ৬১৯।

৭ পি.কে.হিট্টি, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ৬২০।

ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে লিখিত তাঁদের পাণ্ডুলিপিগুলো হয় নিজে নির্ভুলভাবে নকল করতেন, নতুবা তাঁদের সার্বিক নির্দেশ অনুযায়ী অন্য কেউ লিখে দিত। দীর্ঘকাল পর্যন্ত এগুলো ছিল মিসরের অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তক।

বৈদেশিক পণ্ডিতমন্ডলীর মধ্যে অন্যতম ইবনুল হায়সাম, যিনি ইউরোপে আল হাজেন নামে পরিচিত। তাঁর মতো আর কেউই বর্তমানে এত বিখ্যাত নয়। তিনি ৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে বসরায় জন্মগ্রহণ করেন। দার্শনিক মতবাদের দরুন স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে তিনি আল আজহারের সুধীমন্ডলীর মধ্যে স্থান গ্রহণ করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি তখন পরবর্তীকালের ন্যায় এত বিখ্যাত হয়ে না উঠলেও কায়রোর সাধারণ ছাত্র সমাজের যথেষ্ট মানসিক উৎকর্ষ সাধনে সমর্থ হয়। ১০৪০ খ্রিস্টাব্দে ইবনুল হায়সাম ফুসতাতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি অজস্র গ্রন্থ রচনা করেন। এগুলো প্রধানত দর্শন, গণিত ও চিকিৎসাবিদ্যা সম্পর্কে লিখিত। তাঁর হস্তলিখিত ইউক্লিডের জ্যামিতির একখানা কপি বডলিন লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত অছে। তাঁর আলোক বিজ্ঞানের জন্য তিনি মধ্যযুগের পাশ্চাত্যে বিশেষভাবে সুপরিচিত ছিলেন, রজার বেকন এর ল্যাটিন অনুবাদ প্রণয়ন করেন। তাঁর খ্যাতি আজও মলিন হয়নি। চশমার আবিষ্কারের দৃষ্টিশক্তি-হ্রাসপ্রাপ্ত ব্যক্তি মাত্রই তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ।

সালাহ্উদ্দিনের কাতেব কবি ইবনে খাল্লাসকে (১১৭১ খ্রিস্টাব্দ) *মিসরের চক্ষুমনি* ও স্বদেশের সমস্ত সৎগুণের প্রতীক বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি ছিলেন হাফেজের আমলে বার্তা বিভাগের অধ্যক্ষ। এখানে সর্বাপেক্ষা যত্নের সাথে বিশদ রূপে পত্রলিখন বিদ্যার অনুশীলন হত। আমসির লাফির ছাত্র, কবি ও হস্তলিপি বিশারদ ইবনুল গার্রাঁহ (১২১৯ খ্রিস্টাব্দ) ছিলেন বার্তাবিভাগের অন্যতম অলংকার। কাজি আর রশিদ, ইবনুজ জোবায়র কবি ও পণ্ডিত হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। উজির ইবনে সাল্লারের সাথে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল।

দুর্ভাগ্যবশত ফাতেমীয় আমলের কোনো কোনো অংশে বিদ্বানদের জীবন খুব নিরাপদ ছিলনা। প্রখ্যাত সভাকবি আব্দুল গাফফার মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হন। তদুপরি গোঁড়া মুসলমানেরা তাঁদেরকে ঘৃণাভরে পরিহার করে চলতেন। ফাতেমীয়দের বিদ্যোৎসাহিতা সত্ত্বেও কতটা এই নিরাপত্তাহীনতা ও বিশেষত ধর্ম সম্পর্কে মতানৈক্যের দরুন তাঁদের আমলে যথেষ্ট পণ্ডিত ও অসাধারণ প্রতিভাশালী লেখকের অভ্যুদয় হয়নি।

প্রথমদিকের ফাতেমীয় খলিফারা সংস্কৃতিমনা হলেও বিজ্ঞান এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁদের শাসনকাল ছিল নিষ্ফলা। বাগদাদ এবং কর্ডোভার অন্যান্য খলিফাদের মতো আল আজিজ ছিলেন বিদ্যোৎসাহী। তখনকার অধিকাংশ আইনজীবী, ঐতিহাসিক বা কবি, এমনকি বিচারপতিরাও ফকীহ শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন। তাই রক্ষণশীল বিজ্ঞানী বা সাহিত্যিকদের ফাতেমীয় রাজদরবার সম্পর্কে প্রবল অনীহা জন্মায়। ফলে শিল্প সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ফাতেমীয় যুগকে নিষ্ফলা বললেই চলে।[৮]

চরমপন্থী শীয়া মতবাদ শিক্ষা ও প্রচারের জন্য ১০০৫ খ্রিস্টাব্দে দার আল হিকমাহ বা দার আল ইলম (জ্ঞান অথবা বিজ্ঞানের গৃহ) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন খলিফা আল হাকিম ।[৯] শিক্ষা ক্ষেত্রে ফাতেমীয়দের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান এই প্রতিষ্ঠান। এর জন্য আল হাকিম একটি তহবিল গঠন করেন। তহবিলের ২৫৭ দিনার পান্ডুলিপি তৈরি, বইপত্র বাঁধাই ও প্রতিষ্ঠানের রক্ষণাবেক্ষণের কাজে খরচ করা হত। এই বিজ্ঞান ভবনটি গবেষণার জন্য স্থাপিত হলেও শিয়া মতবাদ প্রচলিত ছিল।[১০] এছাড়া জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন গবেষণার জন্য বহু গ্রন্থরাজি এই বিজ্ঞান ভবনে সংরক্ষিত ছিল। এটি ফাতেমীয় রাজপ্রাসাদের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং এখানে পাঠাগার ও মন্ত্রী সভা ছিল। ইসলাম সংক্রান্ত বিষয় ছাড়াও এখানে জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসা শাস্ত্র পড়ানো হয়। ধর্মবিরোধীতার অভিযোগে আল মালিক আল আফজাল ১১১৯ খ্রিস্টাব্দে এটিকে বন্ধ করে দিলেও আয়্যুবিয়দের উত্থান পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিল।

ব্যক্তিগতভাবে আল হাকিম জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। আল মুকাত্তাসে তিনি একটি মান মন্দির তৈরি করেছিলেন। মাঝে মাঝেই খলিফা তাঁর ধূসর রঙ গাধায় এই মান মন্দিরে পৌছে যেতেন ভোর হওয়ার আগে। সমকালীন ঐতিহাসিক ইবনে হাম্মাদ এই মানমন্দিরের দুটি মিনারে আল হাকিম প্রতিষ্ঠিত জ্যোতি যন্ত্রের মত তামার যন্ত্রের বর্ণনা দিয়েছেন। যা এ্যাসট্রেলের জাতীয় তাম্রযন্ত্র ছিল। এই যন্ত্রে আঁকা রাশিদ্বয়ের একেকটি রাশির দৈর্ঘ্য ছিল তিন বিঘত করে।[১১]

আল হাকিমের রাজসভায় বিখ্যাতদের মধ্যে ছিলেন মিসরের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ আলী ইবনে ইউসুফ (মৃ. ১০০৯ খ্রিস্টাব্দ) এবং বিশিষ্ট মুসলিম পদার্থবিদ ও চক্ষুচিকিৎসার ছাত্র আবু আলী

---

৮ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া, *উত্তর আফ্রিকা ও মিসরে মুসলিম শাসনের ইতিহাস* (ঢাকা:খান ব্রাদার্স এন্ড কোং, বাংলাবাজার, ২০০৬),পৃ. ৬৪।

৯ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ৬৪।

১০ পি.কে.হিট্টি, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ৬১৯।

১১ খন্দকার মাশহুদ-উল-হাছান,*প্রাগুক্ত*,পৃ. ৪৬৬।

আল হাসান (লাতিন আল হাজেন) ইবনে আল হাইসাম।[১২] ইবনে ইউনুস তাঁর পৃষ্ঠপোষক এর নামাঙ্কিত গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান জানার একটি ছক তৈরি করেছিলেন। সমকালীন যেসব ছক ছিল, তার ত্রুটিগুলি তিনি সংশোধন করেছিলেন বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে। খলিফার সুবিধার্থে তিনি প্রতিবছর নীলনদের বন্যা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করতেন। একাজে ব্যর্থ হওয়ার পর তিনি খলিফার রোষের হাত থেকে বাঁচতে মানসিক ভারস্যাম্যহীনতার ভান করেন। শুধু তাই নয়, খলিফার মৃত্যু পর্যন্ত আত্মগোপন করে থাকেন। গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, দর্শন এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের উপর তাঁর শতাধিক রচনা আছে। চক্ষু চিকিৎসা সংক্রান্ত গ্রন্থ *কিতাব আল মানাযির* ছিল তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা। মূল পাণ্ডুলিপিটি হারিয়ে গেলেও ক্রীমোনার জেরার্ডের সময় অথবা তার আগে অনুবাদ করা হয়। ১৫৭২ খ্রিস্টাব্দে এর লাতিন সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

মধ্যযুগে চক্ষুচিকিৎসা সংক্রান্ত অধিকাংশ রচনাই আল হাজেনের *অপটিকে থেসারাস* কে ভিত্তিকরে রচিত। রজার বেকন, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি এবং জোহান কেপলারের উপরেও তার প্রভাব স্পষ্ট। ইবনে আল হায়সাম তাঁর রচনায় ইউক্লিড ও টলেমির প্রচলিত তত্ত্বের বিরোধিতা করেছিলেন। এই তত্ত্বে বলা হত, চোখ থেকে বিচ্ছুরিত রশ্মি দৃশ্য বস্তুর উপর পড়ে। আপতন এবং প্রতিফলনের কৌণিক পরিমাপ জানতে তিনি পরীক্ষা চালান। কতগুলো পরীক্ষায় তিনি আতশীয় কাঁচ তৈরি তত্ত্বের কথাও জানিয়েছেন। অথচ এই আতশী কাঁচ তৈরি হয়েছিল তিন শতক পরে ইতালিতে।[১৩] আল হাকিমের আমলে মিসরে চক্ষুচিকিৎসা সংক্রান্ত আরেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচিত হয়। *আম্মার ইবনে আলী আল মাওসিলি* এর লেখা এই গ্রন্থের নাম *আল মুন্তাখাব ফী ইলাজ আল আয়ন* (চক্ষুচিকিৎসার নির্বাচিত বিষয়) গুণের বিচারে গ্রন্থটি সমসাময়িক চক্ষুচিকিৎসাবিদ ইবনে ঈসা রচিত *তাযকিরাহ*'র থেকে এগিয়ে থাকলেও বিষয়বস্তুর দিক থেকে *তাযকিরাহ* অনেক বেশি সম্পূর্ণ হওয়ায় তা ছিল অনেক বেশি জনপ্রিয়। একটি ফাঁপা শোষণ নলের সাহায্যে ছানির সম্পূর্ণ অস্ত্রোপচারের বর্ণনা দিয়েছিলেন আম্মার। এই নল আবিষ্কার করেছিলেন স্বয়ং আম্মার।[১৪]

খলিফাদের বিরাট কুতুবখানায় আরবদের পরিজ্ঞাত জ্ঞানের সর্বশাখা ও সুকুমার সাহিত্যের লক্ষ্যাধিক পুস্তক সংগৃহীত হয়। কক্ষের চতুর্পার্শ্বে তালাবদ্ধ তাকে এগুলো রক্ষিত হত। কোন কোন তাকে কী কী

---

[১২] *প্রাগুক্ত*,পৃ. ৪৬৭।
[১৩] ড. গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ৬৪।
[১৪] পি.কে.হিট্টি, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ৬২০।

বই আছে, তা একটি ক্যাটালগে লেখা ছিল।[১৫] খলিফা আযীয কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই পাঠাগারে সে সময় বইয়ের সংখ্যা ছিল দুই লক্ষ। পাণ্ডুলিপির মধ্যে ইবনে মুকলা ও অন্যান্য বিখ্যাত হস্তলিপি বিশারদদের লিখিত সুশোভিত কুরআন ২৪০০ খানা, বিরাট আরবি অভিধান ৩০ খানা, ১২০০ খন্ডে সমাপ্ত বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক তাবারির নিজ হাতে লেখা মূল পাণ্ডুলিপি, ইবনে দুরাযদের ১০০ খানা গ্রন্থ এবং আরো অনেক অনুপম গ্রন্থ ফাতেমীয় লাইব্রেরীতে স্থান পায়।[১৬]

ফাতেমীয় খলিফাগণ নয় ও দশ শতকে মিসরে একটি সংস্কৃতি কেন্দ্র গড়ে তোলেন। এটি বাগদাদ ও দামেস্ক এ গড়ে উঠা শিক্ষা শিল্পকলা সাংস্কৃতিক প্রতিদ্বন্দ্বী কেন্দ্র হিসাবে চিহ্নিত। বাস্তবিকই বাগদাদের পরেই ছিল মিসরের স্থান। এটা সব জনস্বীকৃত যে, মধ্যযুগের মুসলমানদের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিদ্যাপীঠ, স্থান ছিলো কায়রো তথা মিসর। খলিফা আল আজীজ (৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ-৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ) সকল কবি ও পন্ডিতকে নিরাপদ আশ্রয় দিতেন এবং তাঁদের ব্যবহারের জন্য ৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে বিরাট এক সংগ্রহশালা গড়ে তোলেন। কায়রোতে অধ্যয়নরত মোট পঁয়ত্রিশজন শিক্ষার্থীকে তখন এ গ্রন্থাগার থেকে বৃত্তি প্রদান করা হত। তখন কায়রোতে অবস্থিত লাইব্রেরীর ক্যাটালগগুলো সংগ্রহ করে সম্মিলিতভাবে সংকলিত করা হয়। (আজকের যুগে এই পদ্ধতিকে সমবায় তালিকাকরণ বা ইউনিয়ন ক্যাটালগিং বলা হয়।)[১৭]

পরিচিত জগতের সকল গ্রন্থাগারের সংগ্রহের একটি বিষয় ভিত্তিক গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়ন করাও ফাতেমীয় খলিফাদের এক বিশেষ অবদান। কথিত যে এগারো শতকের গোড়ার দিকে শুধু কায়রো লাইব্রেরীগুলোর সংগ্রহ সংখ্যা ছিল ১,২০,০০০০ খন্ডের উপরে। এই সংখ্যাকে অনেকে অতিরঞ্জন মনে করে। আসলে তা নয়। কারণ ১০০৫ খ্রিস্টাব্দের দিকে খলিফা হাকিম এর শাসনামলে ২৪০০ খণ্ড আল-কুরআনসহ শুধু একটি লাইব্রেরীর সংগ্রহ সংখ্যাই ছিল প্রায় ১,০০,০০০ টি। কুরআন শরীফগুলো পৃথক কামরায় রাখা হত। লাইব্রেরীটি ছিল বহুকক্ষ বিশিষ্ট। কাজেই উপরিউক্ত তথ্যও সঠিক বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে।[১৮]

---

[১৫] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ২৮৯।

[১৬] *তদেব*।

[১৭] মোহাম্মদ সা'দাত আলী, *মধ্যযুগের লাইব্রেরী মুসলিমদের অবদান* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন,১৯৯০),পৃ. ১৮।

[১৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮।

এছাড়া মিসরের ইতিহাসে গ্রন্থাগার সংগঠনের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন কালের।[১৯] আল মাকরিজী বলেন, "জ্ঞান-চর্চা, অনুশীলন ও একই সঙ্গে পৃষ্ঠপোষকতার জন্য খলিফা আল হাকিমের শাসন আমলে ১০০৪ খ্রিস্টাব্দে জ্ঞান-ভবন (হাউস অব উইজডম) এর দ্বার উন্মোচিত হয়। অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য জ্ঞান ভবনটির আইন কানুনে সহজ সরল ধারা বলবৎ ছিলো। শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় বইপত্র বাড়িতে নিয়ে যেত। সর্বসাধারণের জন্য জ্ঞান ভবন ছিল অবারিত। যার যা ইচ্ছে পড়তো। অনুলিপি করতো ইচ্ছেমতো। স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হতো না। পণ্ডিতবর্গ কুরআন, জ্যোতির্বিদ্যা, ব্যাকরণ, বিশ্বকোষ ও অভিধান এবং চিকিৎসা শাস্ত্র নিয়ে গবেষণা ও অধ্যয়ন করতেন। পণ্ডিতবর্গ ও শিক্ষার্থীদের মনোমুগ্ধকর পরিবেশে বসে লেখাপড়ায় আরো উদ্বুদ্ধ করার জন্য মেঝেতে কার্পেট বিছানোসহ সকল দরজা, জানালা, করিডোর (বিভিন্ন কক্ষের মধ্যে সংযোগ স্থাপক পথ), বারান্দা প্রভৃতি সুদৃশ্যময় করে সাজিয়ে রাখা ছিল। গবেষকদের প্রয়োজনেও গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু পরিচালনার স্বার্থে পর্যাপ্ত অধঃস্তন কর্মচারী নিয়োজিত ছিল। খলিফা আল হাকিমের গ্রন্থাগার সংগ্রহ যমকালের সকল বিজ্ঞান ও সাহিত্য এবং নিখুঁত চমৎকারিত্বপূর্ণ হস্তাক্ষর শোভিত বই পত্রে সুশোভিত ও সমৃদ্ধ ছিলো, যা পরবর্তী কালে আরো কোনো রাজকীয় সংগ্রহে একত্রে দেখা যায় না। আল হাকিম অত্যন্ত বিদ্যানুরাগী ছিলেন। তিনি কোনো প্রকার পদমর্যাদার তোয়াক্কা না করে সকল স্তরের পড়ুয়াদের গ্রন্থাগার ব্যবহারেও যেকোনো প্রকার গ্রন্থ পড়ার অনুমতি দিয়েছিলেন।"[২০]

খলিফা আল হাকিম এর বিদ্যাপীঠের গ্রন্থাগারটি কর্মচারীর দিক থেকে সম্পূর্ণভাবে স্বনির্ভর ছিলো। উল্লিখিত কর্মচারীদের মধ্যে ছিল প্রশাসক, গ্রন্থাগারিক, বাঁধাইকার, ক্যালিগ্রাফার, পাহারাদার ইত্যাদি। কায়রোর এই লাইব্রেরীটিতে আধুনিককালের মত রেন্টাল লাইব্রেরী পদ্ধতিও চালু ছিলো। বর্তমানে বাংলাদেশে শুধু প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে এই পদ্ধতি চালু আছে। এ থেকেই বোঝা যায়, তদানীন্তন মিসর জ্ঞান-বিজ্ঞান ও স্বাধীন চিন্তার বিকাশে কত উন্নত ছিলো।[২১]

আল মাকরিজী আরও বর্ণনা দিয়ে বলেছেন, এতো বড় বিদ্যাপীঠ স্থাপনের পরও খলিফা আল হাকাম অতৃপ্ত বোধ করতেন। কিভাবে পরিচিত জগতে লভ্য সমস্ত তথ্য সামগ্রী সংগ্রহ করে জ্ঞান-ভবনকে সমৃদ্ধশালী করা যায় তার চেষ্টার অন্ত ছিলনা। এতদুদ্দেশ্যে চতুর্দিকে প্রতিনিধি প্রেরিত হয়েছিলো। কোথায় কি পাঠ সামগ্রী পাওয়া যায়, সংগ্রহ করতে। তাঁর 'হাউস অব উইজডম' ছিলো লাইব্রেরী

---

১৯ *তদেব*।

২০ Al-Maqrizi, *The Libraries of the Arabs during the time of Abbasids* (Quoted in Olga Pinto), Islamic Culture. III. 1929, P. 227-28.

২১ মোহাম্মদ সা'দাত আলী,*প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯।

একাডেমী ও অডিটরিয়ামের সমন্বিত রূপ। বাগদাদের অনুরূপ এখানেও শিক্ষার্থীরা আনুসংগিক সকল খরচা পেত। খলিফা আল হাকিমের বার্ষিক বরাদ্দ দু'শ দীনার অতিক্রম করে যেতো।[২২]

S.Lanepoole বলেন, "পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত গ্রন্থাগারের মতো এই বিদ্যাপীঠকে ও ১০৬৮ খ্রিস্টাব্দে, 'হাউস অব উইজডম' প্রতিষ্ঠার মাত্র চৌষট্টি বছর পর একই ভাগ্য বরণ করে নিতে হয়েছে। কায়রোর তদানীন্তন উজির আবুল ফারাজ পঁচিশটি উঠের বোঝা বই একলাখ (১,০০,০০০) দীনারের বিনিময়ে বিক্রি করে দেন এবং তা দিয়ে যুদ্ধরত সৈন্যদের বেতন যোগান। এর কয়েকমাস পরে তুর্কী সেনাবাহিনী বইপত্রের প্রতি এতো নির্মম ছিল যে, 'আবেয়ার' (abyar) নামক স্থানে বইপত্র ছিড়েঁ ফেলে ফেলে বইয়ের ছেঁড়া পাতার স্তুপ গড়ে তুলেছিল। পরবর্তীকালে ঐতিহাসিকগণ এটিকে Hill of the Books যা বইয়ের পাহাড় নামে অভিহিত করে।"[২৩]

S.Lanepoole আরো বলেন যে, "এই ধ্বংসলীলার পর ফাতেমীয় বংশীয় জনৈক যুবরাজ বেশ ধৈর্য্য সহকারে উক্ত বিদ্যাপীঠের জন্য বইপত্র সংগ্রহ করে তাতে প্রাণ ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হন। প্রায় এক শতক পরে সালাহ্উদ্দিন যখন ১১৭১ খ্রিস্টাব্দে কায়রো প্রবেশ করেন। তিনি ১,২০,০০০ খন্ডের সংগ্রহে সমৃদ্ধ একটি রাজকীয় গ্রন্থাগার দেখতে পান। তিনি সেখানে থেকে কিছু বই নেন এবং তাঁর চ্যান্সেলর আল কাদি আল ফাযিল (Al Quadi al Fadil)-কে অর্পণ করেন।"[২৪]

সমকালীন ত্রিপলীতে একটি মসজিদ লাইব্রেরী ছিল বলে জানা যায়। গ্রন্থাগারটি প্যাডোভার বিভিন্ন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও গবেষকবৃন্দের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন মধ্যযুগের ত্রিপলীতে আল কুরআনের এক বিরাট সংগ্রহ ছিল। এই সংগ্রহে মূল কুরআন শরীফ পঞ্চাশ হাজার এবং ব্যাখ্যা ও তফসীর আশি হাজার এবং গ্রন্থাগারে পান্ডুলিপি তৈরির কাজে একশ আশিজন নকলনবিশ নিয়োজিত ছিলেন। ত্রিপলীর জনগণ তখন গ্লাস ও কাগজ উৎপাদন করে জীবিকা নির্বাহ করত। কাগজ উৎপাদনকে জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায় হিসেবে বেছে নেওয়া থেকে প্রতীয়মান হয়, তখন জ্ঞানের যথেষ্ট চর্চা হত। উক্ত গ্রন্থাগারটি ১১০৯ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান ক্রুসেডারগণ কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।[২৫]

মধ্যযুগে ফাতেমীয় মুসণমানদের গ্রন্থাগার জগতে গভীর অভিনিবেশ ইসলামের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায়। শুধু ইসলামের ইতিহাসেই নয়, বিশ্বের ইতিহাসে আজ অবধি কোনো জাতি এমন নজির সৃষ্টি

---

[২২] Al-Maqrizi, *Ibid* (Quoted in Olga Pinto), P. 232-33.

[২৩] Stanely Lane Poole, *A history of Egypt in the Middle Ages* (Now York: Charsles scribners's snons, 1901), p.149.

[২৪] *Ibid*, P. 193.

[২৫] মোহাম্মদ সা'দাত আলী,*প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০।

করতে পারেনি। কিন্তু দুঃখের সাথে উল্লেখ করতে হয়, মুসলমানেরা সে ঐতিহ্য সমুন্নত রাখতে পারেনি। হ্যারল্ড ল্যাম্ব এর ভাষায় বলা যায়, আন্তঃরাষ্ট্র কলহ ও ভ্রাতৃবিদ্বেষ মুসলমানদের পরাজয়ের কারণ।

মিসেস গেটস তদানীন্তন লাইব্রেরীর প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন, "মুসলমান ও বাইজান্টাইনদের মধ্যে পারস্পরিক কলহ বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও মুসলমানদের গ্রন্থাগার সম্পদ শত্রুদেরও আকৃষ্ট করতো। ব্যবসা ও ভ্রমণ বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হলেও জ্ঞান-অন্বেষণ ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে বিবাদ ছিলো না। সে সময়ে বিশেষ যত্নের সাথে গণিত, চিকিৎসাশাস্ত্র, প্রকৃতিবিজ্ঞান ইত্যাদি অধ্যয়ন ও গবেষণা করা হত।" [২৬]

কায়রোতে খলিফা আল হাকিম প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান ভবন অর্থ্যাৎ হাউস অব উইজডম, ছাড়াও আরো চারটি বিখ্যাত ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ছিল। বিভিন্ন ঐতিহাসিক রচিত ইতিহাস বই ছাড়াও কায়রো ভ্রমণকারী বিভিন্ন পর্যটক ও জীবনীকারদের বিবরণীতে এসব তথ্য গুরুত্ব সহকারে লিপিবদ্ধ হয়। গ্রন্থাগার চারটির একটি একজন আরবি মুসলমান যুবরাজের; একটি কায়রোর একজন ডাক্তারের, অপর দুটি দু'জন ইহুদি ব্যবসায়ীর বলে উল্লেখ করা হয়।[২৭]

এগারো শতকে ফাতেমীয় যুবরাজ মাহমুদ আদদৌলা ইবনে ফাতিক ক্ল্যাসিক্যাল বিজ্ঞানের একজন একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র, গণিত এবং দর্শনশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জনের জন্য যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষীদের নিকট অধ্যয়ন করেছেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনা তাঁকে সম্মানের উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করে। তিনি প্রচুর লিখালেখি করতেন। যুবরাজ মাহমুদ আদদৌলা সেকালের একজন সেরা শিক্ষকেও পরিণত হয়েছিলেন। ইবনে আলী উসাইবিয়া বলেন, আমি এমন অনেক পুরনো বই দেখেছি সেসব তাঁর নিজের হাতে লেখার চিহ্ন বহন করে। তাঁর সংগ্রহে প্রচুর বই ছিলো, তবে কিছু বইয়ে পানিতে ভেজার চিহ্ন বিদ্যমান।[২৮]

কায়রোর একজন বিখ্যাত তত্ত্ববিদ শেখ সাদীদ আদদীন বলেন, যুবরাজ বিন ফাতিক কঠোর বিজ্ঞান সাধনায় উৎসুক হয়ে পড়েন এবং এ উদ্দেশ্যে গড়ে তোলেন একটি মূল্যবান গ্রন্থসমৃদ্ধ গ্রন্থাগার। রণাঙ্গন থেকে ফিরে ঘোড়া থেকে অবতরনের পরই তিনি যেতেন তাঁর প্রিয় গ্রন্থাগারটির সংস্পর্শে। বইয়ের প্রতি তাঁর এই মমত্ববোধকে খতম করে দেয়া কারো পক্ষেই সম্ভব ছিলনা। তাঁর কাজ ছিল

---

[২৬] Geates, Jean key, *Introduction to Librarianship* (New York : Neal schuman publication, 1976), p. 29.

[২৭] মোহাম্মদ সা'দাত আলী,*প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪।

[২৮] মোহাম্মদ সা'দাত আলী,*প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫।

কেবল পড়া আর পড়া, লেখা আর লেখা এবং কাজটিই ছিল তাঁর কাছে অধিকতর শ্রেয়। ক্ষমতাসীন পরিবারের এক বিদূষী মহিলা ছিলেন তাঁর পত্নী।[২৯]

বিন ফাতিক যখন ইন্তেকাল করেন তখন তাঁর বিধবা পত্নী দাসী সমভিব্যহারে লাইব্রেরীতে গেলে বইপত্রের স্তুপ দেখামাত্রই তাঁর মধ্যে তাচ্ছিল্য ভাবের উদ্রেক হয়। কারণ এই বই-ই ছিলো তাঁর স্বামীর ভালোবাসার কাঁটা। এই বই-ই তাঁর কাছ থেকে স্বামীকে দূরে দূরে ঠেলে রাখতো। তিনি তখন গুণগুনিয়ে বিরহ সঙ্গীত গাইতে গাইতে তাঁর দাসীর সহযোগিতায় সকল বইপত্র গোসলখানায় বৃহদাকার পানির পিপায় (গামলা) ফেলে দেন। পরক্ষনেই (অন্য কেউ) যথাসম্ভবব বইগুলি পানি থেকে তুলে আনেন। কিন্তু অধিকাংশ পুস্তকই পানিতে ডুবে গিয়েছিল এবং এই কারণেই পুস্তকগুলিতে পানির দাগ লেগেছিল। সে সময় কায়রোর প্রতিটি রাজপরিবারের বৃহদাকার পানির পিপা থাকত। এগুলোতে একসাথে এক হাজার বই সংকুলান হত।[৩০]

কায়রোর ডাক্তারের বলে কথিত লাইব্রেরীটি স্বত্ত্বাধিকারী ছিলেন কবি ডাক্তার আল মুয়াররিফ। তিনি ছিলেন একজন মস্তবড় পণ্ডিত। তিনি **১১৩৯** খ্রিস্টাব্দে এরিস্টটলের উপর টীকা টিপ্পনী ও সমালোচনা লিখে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন। বই সংগ্রহ ও বই পড়া ছিল তাঁর এক অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যুক্তিবাদী ডাক্তার আল মুয়াররিফের গৃহে বিরাট কুঠুরীর তাকে বই পুস্তক ভর্তি ছিল। এখানে আল মুয়াররিফ তাঁর অধিকাংশ সময় বই পড়ে, অনুলিপি তৈরি করে ও জ্ঞান সাধনায় ব্যয় করতেন। তাঁর সম্পর্কে সবচাইতে আশ্চর্যের বিষয়, তিনি জ্ঞানের প্রত্যেক শাখায় হাজার হাজার বই রাখতেন। এসবের মধ্যে এমন একটি বই ও ছিলোনা, যার পেছনে সূচি সম্পর্কিত মূল্যবান বাক্যাবলী তাঁর স্বহস্তে লিপিবদ্ধ হয়নি। আমি তাঁর গ্রন্থাগারে প্রচুর ডাক্তারী ও বিজ্ঞান বই দেখতে পাই, যা আল মুয়াররিফের নিজের নাম বহন করে। কিন্তু একটি বই ও ছিলোনা, যেটি সৌন্দর্য চিকচিক করেনি এবং যাতে মূল্যবান ব্যাখ্যা লেখা হয়নি।[৩১]

মরক্কোর ফেজ নগরীর একটি গ্রন্থাগারে রোমান সাহিত্যের 'লিভি' (Roman Livy) এবং 'গ্রিক গ্যালেন' (Greek Galen) কে অন্যান্য সংগ্রহের সমপর্যায়ভুক্ত ধরে সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করা হতো। মিসরের গাজা উপত্যকা এলাকার একটি লাইব্রেরীতে প্যাপিরাসের উপর লেখা প্রচুর পাঠসামগ্রী মূল লাইব্রেরীর অন্তর্ভূক্ত হয়। হায়ারোগ্লিফিক ধরনের লেখার প্রচুর নমুনাও এখানে ছিল। রোমান সম্রাট

---

[২৯] *তদেব*।
[৩০] *তদেব*।
[৩১] মোহাম্মদ সা'দাত আলী,*প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫।

জাস্টিনিয়ানের আমলে সংকিলত ও প্রণীত সকল আইনের বই, বহুল আলোচিত ও কয়েক শতক ধরে আইনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত 'জাস্টিনিয়ান কোড' প্রায় সকল মুসলিম গ্রন্থাগারেই রাখা হত। মৌল দৃষ্টিকোণে মুসলিম আইনের সাথে পার্থক্য থাকলেও জাস্টিনিয়ান কোডের প্রতি কোনো মুসলমান পন্ডিত কখনো অসম্মান দেখাননি।[৩২]

হাজার হাজার সাহিত্য গ্রন্থ, বিশেষ করে কবিতার বই, গ্রন্থাগারের একটা উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে রেখেছিল সেকালে। কালজয়ী রচনা *আরব্য উপন্যাস* এর মতো অনেক সাহিত্যই ঐসব লাইব্রেরীতে স্থান পেতো। ভূগোল ও ইতিহাস ছিল তাদের প্রিয় বিষয়। আবিষ্কারের গল্প কাহিনী, বিভিন্ন শাসক এর শৌর্য বীর্যের গল্প গাঁথা, যুদ্ধের ইতিহাস, বিজ্ঞান বিষয়কগ্রন্থ, বিশেষ করে চিকিৎসাবিজ্ঞান, এইসব লাইব্রেরীর উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে থাকত। ফাতেমীয়রা চিকিৎসাবিজ্ঞান, দর্শনশাস্ত্র, রসায়ন, জ্যোতিষবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করতেন।[৩৩]

জনপ্রিয় লাইব্রেরীগুলোতে অভিধান, ব্যাকরণ, আজকের আদর্শ লিপির মত সাধারণ পাঠ, উপদেশমূলক অনুরূপ বই, টেক্সট বই, কারুকার্যময় হস্তলিপি ইত্যাদি ও যত্নসহকারে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হত। ব্যবসা কেন্দ্রের কাছাকাছি স্থাপিত লাইব্রেরীতে 'হিসাব সংরক্ষণ' ও 'মুদ্রা বিনিময়ে' এর উপর বইপত্র রাখা হত। ভ্রমণ গাইড, বিশেষ করে আন্ত:ইসলামী জগতের প্রত্যেকটি দেশের ম্যাপ ও ভ্রমণের দিক নির্দেশক গাইড রাখা মোটামুটি এসব লাইব্রেরীর জন্য ছিল নিয়মিত রুটিন।[৩৪]

১০৬৮ খ্রিস্টাব্দে বেতন বাকি থাকার কারণে তুর্কি সৈন্যরা ফাতেমীয় লাইব্রেরীতে তান্ডবলীলা চালায়। তারা অনেক মূল্যবান পুস্তক লুট করে নিয়ে গেয়ে বিক্রি করেছেন। এক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ অনুযায়ী ২৫টি উটের পিঠে চাপিয়ে লাইব্রেরীর বই নিয়ে যাওয়া হয়।[৩৫] কেবল হারেসের ব্যক্তিগত পুস্তকালয়ই এই ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। যে সকল দুর্লভ গ্রন্থ থেকে পণ্ডিতেরা তাঁদের সর্বস্বজ্ঞান দানে প্রস্তুত হতেন, তা পুড়িয়ে দেওয়া হয়। পুস্তক বাঁধাইর চামড়া দিয়ে তারা জুতা মেরামত করে বহু পুস্তক ছিন্নভিন্ন ও দূরে নিক্ষিপ্ত হয়ে বালুর নিচে চাপা পড়ে। আবিয়াবের নিকট একটি স্থান দীর্ঘকাল যাবৎ '*পুস্তকের পাহাড়*' নামে পরিচিত ছিল।[৩৬]

---

[৩২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭।
[৩৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮।
[৩৪] মোহাম্মদ সা'দাত আলী,*প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮।
[৩৫] ড. গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ৬৫।
[৩৬] খন্দকার মাশহুদ-উল-হাছান,*প্রাগুক্ত*,পৃ. ৪৬৭।

যে সকল পুস্তক বিদেশে চালান যায়, সেগুলোই সর্বাপেক্ষা উৎসাহের সাথে নতুন কুতুবখানা বা লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন। আল মুস্তানসিরের বংশধরেরা লাইব্রেরীর জন্য নতুন বই সংগ্রহ করেছিলেন। এক শতক পর সালাহ্উদ্দিন সেই নতুন কুতুব খানায় ১,২০,০০০ পুস্তক দেখতে পান।[৩৭] কারো কারো মতে বইয়ের সংখ্যা ছিল ২৬ লক্ষ। ফাতেমীয়দের জ্ঞানতৃষ্ণা ও বিদ্যোৎসাহিতা বাস্তবিকই শ্রদ্ধার উদ্রেক করে।

শিক্ষাক্ষেত্রে বিফল হলেও মিসরের শিল্প ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ যথাযথ প্রকাশ পায়। প্রথম দুই ফাতেমীয় খলিফা এবং পরবর্তীতে দুই আর্মেনিয় উজিরের আমলে শিল্পক্ষেত্রে মিসরের সমৃদ্ধি একমাত্র ফারাও বা আলেকজান্দ্রিয়ার যুগের সমৃদ্ধির সঙ্গেই তুলনীয়।[৩৮]

ফাতেমীয় যুগের স্থাপত্যের যেসব নিদর্শন আজও রয়েছে তার মধ্যে প্রাচীনতম হল আজহার মসজিদ। ৯৭২ খ্রিস্টাব্দে এই মসজিদ তৈরি করেন জওহর। পরে মসজিদটি মেরামত করা হলেও মূল মসজিদটিকে অবিকৃত রাখা হয়। যেটি একেবারে কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত।[৩৯]

আজহার মসজিদ এখন অনেকটা আধুনিক রূপ লাভ করেছে। তবুও পুরাতন সৌধের যেটুকু বর্তমান রয়েছে, ফাতেমীয় স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনের পক্ষে তা-ই যথেষ্ট। সাধারণত পারস্যে অশ্বনলাকৃতি খিলানের উদ্ভব বলে অনুমিত হয়। মিসরীয় মুসলমানেরা এর উৎকর্ষ সাধন করে। কিন্তু এটি প্রথমে নীলনদের জলমাপার যন্ত্রে ও পরে ইবনে তুলুনের মসজিদে ব্যবহৃত হয়। মিসরে ব্যবহারের পূর্বে পারস্যে এটা প্রবর্তিত হয়নি, অন্তত আল আজহারের পরে ভিন্ন কোনো ইমারতে এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। ফাতেমীয় পদ্ধতির অশ্বানলাকৃতি খিলান উচ্চ impost এর সাথে সংমিশ্রিত কায়রোয়ানে জিয়াদাতুল্লাহর মসজিদেও (৮১৬ খ্রিস্টাব্দ) এটি দেখতে পাওয়া যায়।[৪০]

জওহর কেবল বিখ্যাত সেনাপতি নন, তিনি একজন বিদ্বান ও সুপন্ডিত লোক ছিলেন। তিনি কোনো খ্রিস্টান স্থপতিকে এই পদ্ধতির আভাস দেন, এরূপ অনুমান করা অস্বাভাবিক নয়। মসজিদের নক্শা অঙ্কনকারী একে নতুন বংশের সিংহাসনারোহণ সূচক কোনো বৈশিষ্ট্যদানের উদ্দেশ্যে ইবনে তুলুনের সময়ের কৌণিক খিলানের পরিবর্তন সাধন করেন। নক্শা, নির্মাণ পদ্ধতি ও খিলানের অবলম্বনের ব্যবহার প্রভৃতি ব্যাপারে জামে আল আজহারে মোটামুটি ইবনে তুলনের মসজিদের আদর্শ অনুসৃত

---

৩৭ *প্রাগুক্ত*,পৃ. ৪৬৮।

৩৮ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ৬৭।

৩৯ *তদেব*।

৪০ ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ২৯১।

হয়েছে। কাজেই এটা মিসরীয়দের দেশী রুচির বিকাশ। মিনার বর্গাকৃতি, এর সিঁড়ি বাইরে পাশ্চাত্যের মুসলমানদের এটাই চিরন্তন প্রিয় প্রথা। ফাতেমীয় শিল্পীদের সর্বাপেক্ষা অভিনব প্রবর্তন হল Stalactite pendentive বা নিভৃত কোণের উপর দোদুল্যামান চন্দ্রের চূড়া গঠনকারী খিলান। আল হাকিমের মসজিদের মেহরাবের গম্বুজের অভ্যন্তরে এটা স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়।[৪১]

৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে আরম্ভ হলে ১০১২ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে এই বড় মসজিদ (৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ-৭৬ খ্রিস্টাব্দ) থেকে গৃহীত, কাজেই ফাতেমীয় স্থাপত্যকে পারস্যের সাথে সংযুক্ত করা যায়না। স্পষ্টত এটা পাশ্চাত্য ও ইউরোপীয় অর্থ্যাৎ ইতালীয় গ্রিক আদর্শের প্রচীনতম মিসরীয় মুসলমান পদ্ধতি থেকে পরিবর্ধিত। মূলে পারসিক হলে ও প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী বলে ফাতেমীয়রা এশিয়া থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। শিল্প, সাহিত্য ও দর্শনে তাঁদের পাশ্চাত্যমুখী হওয়ার এটাই হেতু বা কারণ।[৪২] ফাতেমীয় যুগে স্থাপত্যের ক্ষেত্রে ইটের পরিবর্তে পাথরের ব্যবহার হয়েছে অনেক পরে। ১১২৫ খ্রিস্টাব্দে তৈরি আল আকমার মসজিদের বাইরের অংশই তার প্রমাণ।[৪৩] আল সালে, ইবনে রাজ্জাক প্রভৃতির ক্ষুদ্রতম মসজিদগুলোর ধ্বংসাবশেষের ইষ্টফলক নক্শা ও গম্ভীর কুফিক শিলালিপি এখনও লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফাতেমীয় শিল্প এজন্য বিখ্যাত।

আল আকমার মসজিদ আর্মেনিয়া খ্রিস্টান স্থপতি তৈরি করেছিলেন বলে অনুমান করা হয়। এ মসজিদেই ইসলামী স্থাপত্যের একটি বিশেষ নিদর্শন লক্ষ্য করা গিয়েছিল। পরবর্তীতে যা সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। তা হল দেয়ালের গায়ে ভার রক্ষার জন্য প্রলম্বিত পাথর বা তক্তা এবং কুলঙ্গি (মুকারনাস) ব্যবহার। এই মসজিদে স্তম্ভ ছিল। ধীরে ধীরে ফাতেমীয় শিল্পিদের হাতে অন্যান্য কিছু বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠে। যেমন ঝুলন্ত কৌণিক খিলান বা নির্মিত ভবনের বহির্ভাগে গভীর কুলুঙ্গি। পরে আয়্যুবিয় এবং মামলুক যুগের এই শিল্পশৈলী আরো উন্নত হয়ে উঠে। তেমনই কাঠ অথবা পাথরের উপর খোদাই করা লিপিই পরবর্তী যুগের গৌরবোজ্জ্বল শিল্পের পূর্বাভাস দিয়েছিল। মসজিদের সঙ্গে তার প্রতিষ্ঠাতার কবর তৈরির রেওয়াজ শুরু হয় ১০৮৫ খ্রিস্টাব্দে। মুকাত্তাসে বদর আল জামালি প্রতিষ্ঠিত মসজিদ সমাধি স্মৃতিফলকই এই ধারার প্রথম মসজিদ।[৪৪]

---

[৪১] *তদেব।*

[৪২] *তদেব।*

[৪৩] ড. গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ৬৭।

[৪৪] ড. গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ৬৭।

এডেসার শিল্পিদের নির্মিত কায়রোর বাবুল নাসরু, বাবুল ফুতুহ (১০৮৭ খ্রিস্টাব্দ) ও বাবুল জুবায়লা (১০৯১ খ্রিস্টাব্দ) নামক তিনটি বিরাট তোরণ ফাতেমীয়দের সর্বাপেক্ষা স্থায়ী নিদর্শন রাজির অন্যতম। তিনজন স্থপতির প্রত্যেকে প্রস্তর দ্বারা এক একটি দ্বার নির্মাণ করেন বলে কথিত আছে। বাইজান্টাইন সামরিক স্থাপত্যের সাথে তাঁদের পরিচয় ছিল বলে এগুলো বাইজান্টাইন আকৃতি প্রাপ্ত হয়। আল আজিজের সময় কায়রো স্থপতিদের নিবাস হয়ে দাঁড়ায়। এটা রাজধানীর চতুর্দিকে একটি নতুন ইস্টক প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ও প্রস্তর দ্বারা নির্মিত হয়। বাবুল ফুতুহের উপর মোস্তানসিরের আমলে কুফিতে হরফে শিয়ামতের মূলমন্ত্র খোদিত হয়। আটশত বৎসরের সুন্নি শাসনের পরেও তা অদ্যপি অক্ষুন্ন আছে। কিন্তু পূর্ব প্রাসাদ ও পশ্চিম প্রাসাদ'ই ছিল ফাতেমীয়দের শ্রেষ্ঠ সৌধ। পশ্চিম প্রাসাদকে ক্ষুদ্রতর প্রাসাদ বা সুখনিবাসও বলা হয়। এতে সুবিস্তৃত 'কাফুরের বাগান'। তাতে সভাসদদের ব্যায়ামের জন্য একটি ময়দান বা ঘোড় দৌড় চক্র ছিল। দুই প্রাসাদের মধ্যবর্তী স্থান 'বায়নুল-কাসরায়ন' নামে অভিহিত হত। এখানে ১০,০০০ সৈন্য কুচকাওয়াজ করতে পারত। 'সুকুন নাহ হাসিন' বা তাম্র কার বাজারে একাংশ অদ্যপি এই নামে সংরক্ষিত আছে। উভয় প্রাসাদ ভূগর্ভস্থ পথ দ্বারা সংযুক্ত ছিল; খলিফা এই পথেই এক প্রাসাদ থেকে অন্য প্রাসাদে গমনাগমন করতেন।[৪৫]

বৃহত্তর প্রাসাদের আকার ও আড়ম্বরের কথা শুনলে বিস্মিত হতে হয়। তাতে সব সুদ্ধ ৪০০০ কক্ষ ছিল; একটি কক্ষ স্বর্ণমন্ডিত ছিল বলে একে স্বর্ণকক্ষ বলা হত। এতে প্রবেশদ্বার ও স্বর্ণ খচিত ছিল। সেজন্য এর নাম হয় স্বর্ণদ্বার। এখানে খলিফা সুসজ্জিত প্রহরী ও পাত্রমিশ্র পরিবৃত হয়ে সিংহাসনে উপবেশন করতেন। তাঁর মাথার উপর নানা বর্ণে রঞ্জিত চন্দ্রাতপ শোভা পেত। সম্মুখে মনিমুক্তা কারুকার্যময় বহুমূল্য পতাকা পতপত করে উড়তে থাকত। আমলরিক ও তাঁর দূতেরা এখানেই খলিফার দর্শন লাভ করেন। এতদ্ব্যতিত এই অপরূপ প্রাসাদে 'মরকত কক্ষ' ও 'দেওয়ান খানা' বা রাজসভার চতুর্দিকে মর্মর প্রস্তরের খিলানে সুশোভিত ছিল। এর ছাদ ছিল স্বর্ণ মন্ডিত, কারুকার্য খচিত ও বিবিধ উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত। এর মেঝে নানা বর্ণের প্রস্তরে নির্মিত হয়। অনভ্যস্ত ও অসভ্য নাইটেরাও এর বিচিত্র আড়ম্বরময় কক্ষ দর্শন করে মিসরীয়দের সুরুচি, উচ্চমানের সভ্যতা ও সৌন্দর্য প্রীতিতে অবাক হয়ে যায়। প্রাসাদের একটি গম্বুজের নিচে জানালার পাশে বসে খলিফা প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার রাজকার্য নির্বাহ করতেন। এ ছাড়া আর এটি প্রকোষ্ঠ ছিল। বিচার প্রার্থীরা প্রত্যহ এর

[৪৫] *প্রাগুক্ত*,পৃ. ২৯২।

নিচে এসে সমবেত হত; সন্ধ্যা হলেই খলিফা সেখানে তাদের অভিযোগ শ্রবণ করে প্রতিকারের ব্যবস্থা করতেন।[৪৬]

ফাতেমীয়দের প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধিতা শিক্ষা ও সাহিত্যের অগ্রগতি না করলেও এটা শিল্পচর্চায় প্রেরণা দেয়। সুন্নি শিল্পিরা সাধারণত জীবন্ত প্রাণীর চিত্র অঙ্কন করতেন না। কিন্তু শিয়ারা তাতে কুণ্ঠিত হতেন না। আল কাসির ও ইবনে আজিজ নামক দু'জন প্রতিদ্বন্দ্বী ইরানি চিত্রকর উজির আল আজুরির অধীনে কাজ করতেন। তাঁদের প্রথম জন তার জন্য কৃষ্ণবর্ণ খিলানের ও দ্বিতীয়জন পার্শ্ববর্তী পীতবর্ণের খিলানের মধ্যে থেকে বহির্গমনোম্মুখে লোহিত বস্ত্র পরিহিতা একটি কিশোরীর চিত্র অঙ্কন করেন। কোনো আব্বাসীয় খলিফা এরূপ চিত্র বরদাস্ত করতে পারতেন কিনা সন্দেহ।[৪৭]

ফাতেমীয় শিল্পিরা রেশমি কাপড়, বুটিদার বস্ত্র, মখমল ও অন্যান্য কাপড়ের মধ্যে লোহিত বুটিদার কিংখাবে স্বর্ণসূত্র দ্বারা ভ্রমণরত হস্তীমুখ সহ প্রমোদোদ্যানে ভ্রমণ করতেন। সোনার কিংখাব ও রেশমি পটমন্ডপে সময় সময় মনুষ্য মূর্তি ও পশু পক্ষীর ছবি বোনা হত; এদের দাঁত গুলো ছিল সুবর্ণমন্ডিত। কয়েকখানা রেশমি বস্ত্রে বিখ্যাত লোকদের চিত্র বোনা হয়। বিখ্যাত গজদন্তের পেটিকায় পেটাই রৌপ্যে তোতা ও অন্যান্য পক্ষীর চিত্র খোদিত আছে। মোস্তানসিরের সম্পত্তির তালিকায় পান্না ও চুনির কাজে বিশিষ্টি সোনার ময়ূর, চুনির শিখা ও চুক্ষবিশিষ্ট সোনার কুক্কুট ও মুক্তাবৃত হরিণের নাম পাওয়া যায়। ফাতেমীয় আমলেও যে মিসর ও সিসিলিতে অত্যাধিক যে গজ দন্তের বাক্স দেখতে পাওয়া যায় তাও সম্ভবত ফাতেমীয় কারিগরদের কাজ। ভেনিসের সেন্ট মার্কের কোষাগারের একটি স্ফটিক পাত্রে খলিফা আল আজিজের নাম পাওয়া যায়। কাঁচ ও ধাতব ঔজ্জ্বল্যবিশিষ্ট মৃন্ময় পাত্র প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হত। নীল নদের নৌ-মিছিলে ৩৮ খানা শাহি বজরা ব্যবহৃত হত; তার মধ্যে একখানা ছিল আবু সায়েদ কর্তৃক কাফ্রি রাণীকে প্রদত্ত 'রৌপ্য নৌকা' এর একখানা ছিল উজির গর গরাইয়ের আদেশে খলিফার জন্য ১৩০০০ দিনার ব্যয়ে নির্মিত হয়।[৪৮]

মিসরের তাঁতের বস্ত্র বেশ বিখ্যাত ছিল। কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়ায় এত সুষম রেশমি বস্ত্র প্রস্তুত হত যে একটি গোটা পরিচ্ছদ আংটির ছিদ্রের ভেতর ঢোকাতে পারা যেত। আযয়ুত পাগড়ির পশমি কাপড়ের, দেবিক রেশমি ও সাদা পশমি এবং দামিয়েতা দো'সুতি কাপড়ের জন্য বিখ্যাত ছিল। এই

---

[৪৬] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ২৯২।
[৪৭] *তদেব*।
[৪৮] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ২৯৩।

দামিয়েতা থেকে divity (দো-সুতি কাপড়) শব্দের উৎপত্তি। রাজপরিবারের লোকদের ব্যবহার্য বস্ত্র বয়নের জন্য একটি শাহি কারখানা ছিল। এখানে শুভ্র কাপড় ছাড়া খলিফাকে ঘোড়ার জিন ও '*বুকালামুন*' নামক এক প্রকার সুন্দর বিচিত্র বর্ণের কাপড় প্রস্তুত হত; এ থেকেই Chamelion বা বহুরূপী শব্দের উদ্ভব। কয়েকখানা রেশমি বস্ত্র বুটি তুলে প্রাচ্যের রাজবংশগুলোর ইতিহাস এবং সন তারিখসহ বিখ্যাত লোকদের কার্যাবলি লিখিত হয়। ৩০,০০০ দিনার ব্যয়ে য়্যাজুরির জন্য নির্মিত নক্‌শাকৃত তাঁবুর বেড়া ছিল ৫০০ হাত ও উচ্চতা ৬৫ হাত; আসবাবপত্রসহ এটা স্থানান্তরে নিয়ে যেতে ১০০ উট লাগত, এটা নির্মাণ করতে ৫০ জন কারিগরের ৯ বৎসর সময় দরকার হয়। খলিফা জহিরের তাঁবু বিশুদ্ধ স্বর্ণসূত্রে নির্মিত হয়। এটা স্থায়ী রৌপ্যস্তম্ভের উপর স্থাপিত ছিল। ৩০,০০০ দিনার ব্যয়ে নির্মিত আর একটি তাঁবু ভেনেসীয় জাহাজের দীর্ঘতম মাস্তুলের সাহায্যে খাটানো হত। আর একটি তাঁবু এত বৃহদাকার ছিল যে, এটা খাটাতে দুই একজন লোকের মৃত্যু অবধারিত ছিল, এজন্য এটার নাম ছিল 'জল্লাদ'।[৪৯]

মাকরিজী মোস্তানসিরের মূল্যবান দ্রব্যাদির যে তালিকা দিয়েছেন, তা থেকে সেকালের শিল্প ও বিলাসদ্রব্যের চিত্তাকর্ষক বিবরণ পাওয়া যায়। তাতে হাজার হাজার বৃহৎ স্ফটিক পাত্র; অভ্যন্তরে খচিত বিভিন্ন রঙের মিনা করা সোনার বাসন, হারুনুর রশিদের নাম খোদিত baxour এর পেয়ালা, ভিতরে শোভিত মনিমুক্তা খচিত স্বর্ণ, রৌপ্য গজদন্ত, মুসাব্বর, আবলুস ও অন্যান্য কাঠের দোয়াত, কায়সুরের কর্পূরপূর্ণ চীনামাটির বৃহৎ কলস; কস্তুরীর শিশি, বৌজের পেয়ালা, জন্তুর আকারে তেপায়ার উপর স্থাপিত সহস্র মুদ্রা মূল্যের বৃহৎ টব; খলিফা মামুনের সোনার তোশক, রোমান সম্রাট কর্তৃক আজিজকে প্রদত্ত বিচিত্র বাসন; ইস্পাতের আয়না, অসংখ্য কাঁচ ও মৃন্ময় পাত্র; স্বর্ণরোপ্যের বাঁট-ওয়ালা ছাতা, অভ্যন্তরে খচিত সর্বপ্রকারের রৌপ্যপাত্র, স্বর্ণরৌপ্য, গজদন্ত ও আবলুস কাঠের গুটিসহ সতরঞ্চ ও দাবা খেলার সোনার বুটিদার রেশমি ছক, বিভিন্ন রঙের নার্সিসাস বা কন্দধার ফুল গাছের জন্য ৪০০০ স্বর্ণপাত্র; রজত ও কর্পূরের কৃত্রিম ফুল ও খেলনা; সাড়ে আট সের মনিমুক্তা খচিত ১৩০০০ দিনার মূল্যের পাগড়ির মূল্যবান প্রস্তরে নির্মিত খর্জুরসহ দু'বর্ণের খর্জুরবৃক্ষ , চীন, দাবিক ও দামেস্ক প্রভৃতি স্থানের অসংখ্য অমূল্য বস্ত্র; মনিমুক্তা খচিত বিপুল পরিমাণ ছোরা, তরবারি, বর্শা, বল্লম ও সর্বপ্রকারের অন্যান্য অস্ত্র প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। অস্ত্রের মধ্যে মুইজ, কায়েম প্রভৃতির তরবারি, হযরত আলির (রা:) '*জুলফিকার*', '*হামজার ঢাল*' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।[৫০]

---

[৪৯] *তদেব*।

[৫০] খন্দকার মাশহুদ-উল-হাছান,*প্রাগুক্ত*,পৃ. ৪৬৯।

ইসলামের ইতিহাসে বই বাঁধাইয়ের প্রাচীনতম নমুনা পাওয়া গেছে মিসরে। সম্ভবত এগুলি অষ্টম অথবা নবম শতকের কাজ। বাঁধাই সংক্রান্ত প্রযুক্তি এবং অলঙ্করণের ক্ষেত্রে খ্রিস্টানদের প্রাচীনতম নমুনা পাওয়া গেছে মিসরে। বাঁধাই সংক্রান্ত প্রযুক্তি এবং অলঙ্করণের ক্ষেত্রে আরো আগের খ্রিস্টানদের বাঁধাইয়ের প্রভাব রয়েছে। মিসরে এই শিল্পের বিকাশের পরে মুসলিম চর্মশিল্পিরা যন্ত্র মুদ্রণ ও অলঙ্করণের প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ হয়ে উঠেন।[৫১]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এই প্রতীয়মান হয় যে, ফাতেমীয় শাসনামলে মিসরে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের ব্যাপক অগ্রগতি দেখা না গেলেও একেবারে নিস্ফলা ছিলনা। এসময়ও বিভিন্ন শাসকবর্গ বিশেষ করে, খলিফা আল মুইজ, আল আজিজ, আল হাকিমের সময় বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপক প্রসারতা লাভ করে। এসময়েই জ্ঞান-বিজ্ঞানের গৃহ দার- আল-হিকমা প্রতিষ্ঠিত হয় যেখানে বিভিন্ন অঞ্চল হতে জ্ঞান পিপাসুরা জ্ঞান অর্জনের জন্য ছুটে আসতেন। এসময় গণিতশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, প্রকৃতিবিজ্ঞান, ভেষজবিজ্ঞান, ইতিহাস, জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শনশাস্ত্র, রসায়ন, সাহিত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। ফাতেমীয় আমলের জ্ঞান বিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে পরবর্তীতে আয়্যুবিয় ও মামলুক আমলে তা কলেবরে বৃদ্ধি পায়। যদিও প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধিতা করাই ছিল ফাতেমীয় খলিফাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাই রক্ষনশীল বিজ্ঞানী বা সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রবল অনীহা দেখা গিয়েছিল। তবুও জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চায় ব্যাপক উন্নতি দেখা না গেলেও পিছিয়েও ছিলনা।

[৫১] পি.কে.হিট্টি, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ৬২২।

সপ্তম অধ্যায়
আয়্যুবিয়দের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা

আয়্যুবিয়দের শাসনামলে ভূ-পতিদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নূর আল দীন এবং সালাহ্উদ্দিন এর নাম।[১] এদের আমলের স্থাপত্য এবং শিক্ষা বিস্তারের নিদর্শন রাজধানী দামেস্কে আজও বর্তমান। নূর আল দীন দামেস্কে তাঁর শাসন কালে সীমানার প্রাচীর, তার মিনার ও প্রবেশদ্বারগুলি মেরামত করেন। তাঁর তৈরি প্রশাসনিক ভবনগুলি কিছুদিন আগেও ব্যবহার করা হত। শুধু তাই নয়, দামেস্কের প্রাচীনতম ইলম-হাদীস শিক্ষাকেন্দ্র তাঁরই তৈরি। নূরের পরবর্তী যুগে সিরিয়ায় এই মাদ্রাসাগুলি যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠে। নিজের নামে একটি হাসপাতাল তৈরি করেন নূর আল দীন। আল ওয়ালীদের হাসাপাতালের পর এই নূরী হাসপাতালই দামেস্কে দ্বিতীয় হাসাপাতাল। পরে এটি চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষাকেন্দ্র হয়।[২]

নূরের তৈরি করা মাদ্রাসাগুলো ছিল মসজিদ সংলগ্ন। তবে এই বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়গুলো ছিল আবাসিক এবং এখানে নিজামীয়াহ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা অনুযায়ী ছাত্রদের তালিম দেওয়া হত। শাফিঈ ধারার এই মাদ্রাসা আলেপ্পো, হিম্স, হামা এবং বা'লাবাকে তৈরি করেন নূর। তাঁর আমলের এইসব শিক্ষাকেন্দ্র এবং অন্যান্য স্মৃতি স্তম্ভে যেসব লেখা খোদাই করা হয়েছে তার হরফ প্রাচীন আরব হস্তলিপিবিদদের কাছে বিশেষ আগ্রহের বিষয়। কারণ এর আগে পর্যন্ত স্থাপত্য লিপির আদল ছিল কৌণিক কুফির। তখনই প্রথম গোলাকার 'নসখি' শৈলী হরফে লেখা ও নক্শা খোদাই করা হয়। আলেপ্পোর নগর দূর্গের পশ্চিম মিনারে এই শৈলীতে খোদাই করা হরফে লেখা আজও পড়া যায়। এই দূর্গের যে রূপ আজ আমরা দেখতে পাই, তা সংরক্ষণের কৃতিত্ব কিন্তু নূর আল দীনেরই।[৩] প্রাচীন সামরিক স্থাপত্যের এক অনন্য নিদর্শন হিসেবে পরিচিত এই দূর্গের কথা অ্যাসিরিয় এবং হিট্টির নথিকাতে পাওয়া যায়। নূর আল দীন মারা যাওয়ার পর তাঁকে কবর দেওয়া হয় দামেস্কে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা আল-নূরীয়াতে। সিরিয়াতে সেই মাদ্রাসা নূরের সমাধি ও মসজিদের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করেছে। নূরের স্মৃতিস্তম্ভ আজও যথাযথভাবে সংরক্ষিত আছে।[৪]

---

১ পি.কে.হিট্টি, *আরব জাতির ইতিহাস* (অনুবাদঃ জয়ন্ত সিং, সেঁজুতি ভট্টাচার্য, সৌমিত্র সেন গুপ্ত) (কলকাতা: মল্লিক ব্রার্দাস, ২০০৫), পৃ. ৬৫২।

২ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া, *উত্তর আফ্রিকা ও মিসরে মুসলিম শাসনের ইতিহাস* (ঢাকা:খান ব্রাদার্স এন্ড কোং, বাংলাবাজার, ২০০৬),পৃ. ৯২।

৩ পি.কে.হিট্টি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫২।

৪ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ৯২।

স্থাপত্য শিল্প এবং শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে তাঁর পূর্বসূরিকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন সালাহ্‌উদ্দিন। শিক্ষার সাহায্যে শীয়া বিরোধী এবং ফাতেমী পন্থী হওয়াকে রোখাই ছিল তার নীতি। মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরির ক্ষেত্রে নিযাম উল মুলকের পরেই তাঁর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর শাসনকালে বিদ্যালয় নগরী হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠে দামেস্ক।[৫] ১১৮৪ খ্রিস্টাব্দে দামেস্কে এসেছিলেন ইবনে জুবাইর। তাঁর বর্ণনা থেকে জানা যায়, শহরে ২০টি মাদ্রাসা, দুটি দাতব্য চিকিৎসালয় এবং মুসলিম ফকির ও দরবেশের অসংখ্য খানকাহ্ ছিল। দরবেশদের জন্য এই ধরনের খানকাহ্ মিসরে প্রথম তৈরি করেন সালাহ্‌উদ্দিন।[৬]

আয়্যুবিয় বংশের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে গাজী সালাহ্‌উদ্দিন ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন। তিনি ১১৭১ খ্রিস্টাব্দে মিসরে ফাতেমীয় বংশের শেষ খলিফা আল আদিদের মৃত্যুর পর ফাতেমীয় বংশের উপর আয়্যুবিয় বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। ১১৭১ খ্রিস্টাব্দ হতে ১২৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এ বংশের স্থায়ীত্বকাল হওয়ায় জ্ঞান বিজ্ঞানের তেমন প্রসারতা না দেখা দিলেও জ্ঞান বিজ্ঞানের বিকাশ থেমে থাকেনি। গৃহযুদ্ধ এবং ধর্মযুদ্ধ সত্ত্বেও আয়্যুবিয়দের আমলে সিরিয়া ও মিসর সুদিনের মুখ দেখেছিল। উমাইয়া যুগকে বাদ দিলে এটিই ছিল মুসলিম ইতিহাসে স্বর্ণোজ্জ্বল যুগ।[৭]

সালাহ্‌উদ্দিন আয়্যুবিয় সর্বপ্রথম জেরুজালেম ও মিসরে মাদ্রাসার মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রথম চালু করেন। তাঁর শাসনামলে আল হিজাজেও এই ধরণের প্রতিষ্ঠান প্রথম চালু হয়। মিসরে তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল তাঁরই নামাঙ্কিত কায়রোর আল সালাহিয়া প্রতিষ্ঠানটি।[৮] ইবন জুবাইর আলেকজান্দ্রিয়াতেও একাধিক মাদ্রাসার কথা বলেছেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে মিসরীয় মাদ্রাসা গুলো বেশি দিন টেকেনি। কিন্তু পরবর্তী কালের মিসরের স্থাপত্য শৈলীতে এদের প্রভাব স্পষ্ট। মিসরে আরবি শিল্পকর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসাবেই উত্তরকালে তা চিহ্নিত হয়। এগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কায়ারোতে সুলতান হাসানের গড়া মসজিদ সংলগ্ন মহাবিদ্যালয়। চতুষ্কোণে এক চত্তরের (সাহন) চারপাশে ছিল চারটি দেওয়াল দিয়ে চারটি বিশাল কক্ষ। চত্তরের মাথা ছিল খোলা চতুষ্কোণ এই চত্তরটি চিহ্নিত করা হয়েছিল দরদালান (একবচনে-লিয়ান) দিয়ে। এক একটি কাজে এক একটি মাযহাবের রীতি শিক্ষা দেওয়া হত। পুরো স্থাপত্যটি এক নজরে দেখলে মনে হবে একটি ক্রুশচিহ্ন।[৯]

---

[৫] পি.কে.হিট্টি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫৩।

[৬] খন্দকার মাশহুদ-উল-হাছান, *আরবের ইতিহাস* (ঢাকা: জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, বাংলা বাজার, ২০০৩), পৃ. ৪৯০।

[৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮৯।

[৮] পি.কে.হিট্টি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫৩।

[৯] খন্দকার মাশহুদ-উল-হাছান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯০-৪৯১।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও সালাহ্উদ্দিন কায়রোতে দুটি হাসপাতাল চালাতেন। হাসপাতালগুলো সম্ভবত নির্মাণ করা হয়েছিল দামাস্কাসের নূরী হাসপাতালের আদলে। তাঁর আগে ইবনে তুলুন এবং কাফুর আল ইকশিদিও এই ধরনের দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র মিসরে তৈরি করেছিলেন।[১০] হাসাপাতালের ক্ষেত্রে ও মসজিদের স্থাপত্য শৈলীই অনুসরণ করা হয়েছিল। কিন্তু সেইসব স্থাপত্যের কোন নিদর্শনই আজ আর নেই।[১১]

জনকল্যাণমূলক স্থাপত্য নিদর্শনের অস্তিত্ব না থাকলেও যুদ্ধ বিগ্রহের জন্য নির্মিত দুর্গের নির্দশন কিন্তু আজও আছে। কায়রোর নগর দূর্গই তার উদাহরণ। এই দূর্গের স্থাপত্যশৈলী থেকে বোঝা যায়, সালাহ্উদ্দিন তাঁর দূর্গ নির্মাণের বিদ্যা অনেকটাই রপ্ত করেছিলেন নরম্যানদের স্থাপত্য থেকে। সেই সময় প্যালেস্টাইনে এই ধরনের প্রাসাদ তৈরি হয়ে গেছে। তিনি সম্ভবত কায়রোর নগর দূর্গ তৈরি করতে খ্রিস্টান বন্দিদের কাজে লাগিয়েছিলেন। কায়রোতে থাকার সময় সালাহ্উদ্দিনের বাসভবনও এই দূর্গেই ছিল। তবে দূর্গে থাকলেও কেবল যুদ্ধেই মনোনিবেশ করেননি তিনি। তাঁর দরবারে উজ্জ্বল নক্ষত্রদের সমাবেশ ঘটে।[১২] ক্ষুরধার বুদ্ধি সম্পন্ন উজিররা ছাড়াও সেখানে ছিলেন বিশিষ্ট ইহুদি চিকিৎসক ইবনে মায়মুন এবং বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ইরাকি শিক্ষাবিদ আব্দুল লতীফ আল বাগদাদী (১২৬১ খ্রিস্টাব্দ-১২৩১ খ্রিস্টাব্দ)। মিসর সম্পর্কে তাঁর সংক্ষিপ্ত বিবরণ মধ্যযুগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক বিবরণ।[১৩] তের শতক থেকে আয়্যুবিয় এবং তাদের উত্তরাধিকারী মামলুকদের শাসনের গোড়ার দিকে তৈরি দামেস্ক এবং আলেপ্পোর স্থাপত্যই প্রাচ্যের ধ্রুপদী আরব শিল্পের নিদর্শন।

মামলুকদের শাসনামলে যে স্থাপত্য শৈলী মিসরে অনুসরণ করা হয়েছিল, তার জন্ম কিন্তু সিরিয়ায়, আয়্যুবিয় স্থপতিদের হাতে। এই সময়কার মিসরীয় স্থাপত্যের কিছু নিদর্শন যা আরব মুলুকেই গর্বের বস্তু। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল মজবুত এবং শক্তপোক্ত গঠন। উচ্চমানের পাথরের উপর সাধারণ শিল্প কর্মই হয়ে উঠত অসাধারণ। কিন্তু আন্দালুসিয়ার স্থাপত্য শৈলীর মতো এখানেও শোভাবর্ধনের জন্য মাত্রাতিরিক্ত অলংকরণের উপর জোর দেওয়া হত। শিল্পকলার ক্ষেত্রে আয়্যুবিয় ধারণাকেই অনুসরণ

---

১০ পি.কে.হিট্টি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫৪।
১১ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৩।
১২ পি.কে.হিট্টি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫৪।
১৩ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৩।

করেছেন মামলুকরা। তাদের আমলে মসজিদ সংলগ্ন মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতাদের গোল গম্বুজের (কুব্বাহ) নিচে কবর দেওয়ার রেওয়াজ চালু হয়ে যায়।[১৪]

বুদ্ধিবৃত্তিক এবং শিক্ষাজগতের ঔজ্জ্বল্য ধর্মযুদ্ধ পর্বে প্রাচ্যে ইসলামি সংস্কৃতির মহিমা ক্রমশই অস্তমিত হয়ে আসছিল। ধর্মযুদ্ধের পর্বের কিছু আগে থেকে ইসলামি সংস্কৃতির বন্ধ্যা অধ্যায় শুরু হয়। দর্শন, চিকিৎসাশাস্ত্র, সঙ্গীতসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে যেসব বিরল প্রতিভার সমাবেশ ঘটেছিল, তাদের যোগ্য উত্তরসূরির দেখা মেলেনি।[১৫]

এ কারণেই বারো এবং তের শতক জুড়ে ইসলাম ও পশ্চিমী খ্রিস্টানদের পারস্পরিক আদান প্রদানের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল সিরিয়া। কিন্তু আরব সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে স্পেন, সিসিলি, উত্তর আফ্রিকা এমন কি বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের তুলনায় সিরিয়ার ভূমিকা ছিল নেহাতই নগণ্য।[১৬] ইউরোপের খ্রিস্টানদের উপর ইসলামি প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে সিরিয়ার একটা বড় ভূমিকা ছিল। ধর্ম যোদ্ধাদের উপর সরাসরি প্রভাব ফেলেছিল সিরিয়া। এই প্রভাবই পরোক্ষ ছাপ ফেলেছিল পশ্চিমি দুনিয়ার উপর। তাছাড়াও বাণিজ্যিক আদান প্রদানের মাধ্যমে এই প্রভাব আরো গভীর হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আধ্যাত্মিক ও বৌদ্ধিক জগতে সিরিয়ার প্রভাব কোনোভাবেই উল্লেখযোগ্য নয়। এরই সঙ্গে আরেকটা কথাও মনে রাখা দরকার। সিরিয়া দখলকারী ফ্রাঙ্করা রুচির দিক থেকে মুসলিমদের চেয়ে নিম্নমানের ছিল। কিন্তু প্রাসাদ, দূর্গ আর ছাউনির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার ফলে কৃষক, কুম্ভকারের মত তৃণমূল স্তরে মুসলিমদের সাথে তাদের যোগাযোগ ছিল বেশি। বুদ্ধিজীবী মহলের সাথে মোলাকাতের সুযোগেই তাদের হয়নি। তার উপর দেশ ও ধর্মের সাথে জড়ানো কুসংস্কার বা ভয় দুতরফের মাঝে গড়ে তুলেছিল দুরত্বের প্রাচীর। বিজ্ঞান এবং শিল্পকলার ক্ষেত্রে মুসলিমদের শেখাবার মত কোনো বিদ্যাই প্রায় ফ্রাঙ্কদের ঝুলিতে ছিলনা। চিকিৎসার ক্ষেত্রে দু'পক্ষের পাণ্ডিত্যের যেকোন তুলনাই চলতনা তার প্রমাণ পাওয়া যায় উসামাহর টীকায়। ফ্রাঙ্কদের বিচার ব্যবস্থাকেও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি তিনি।[১৭]

---

[১৪] পি.কে.হিট্টি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫৩।

[১৫] পি.কে.হিট্টি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫৪।

[১৬] *তদেব*।

[১৭] খন্দকার মাশহুদ-উল-হাছান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯১।

বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ক্ষেত্রে ভাব বিনিময়ের সুদৃঢ় প্রমাণ একেবারে অলভ্য নয়। ব্যাথের আডেলার্ড বারো শতকের গোড়ার দিকে অ্যান্টিয়োক এবং টার সাথে আসেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং জ্যামিতি সংক্রান্ত আরবি রচনা ল্যাটিনে অনুবাদ করার কৃতিত্ব তাঁরই।[১৮] এর প্রায় এক শতক পরে প্রথম ইউরোপীয় বীজগণিত বিশেষজ্ঞ লিওনার্দো ফাইবো নাবিক মিসর ও সিরিয়াতে আসেন। বর্গসংক্রান্ত একটি তত্ত্ব তিনি দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের নামে উৎসর্গ করেন। ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্মের মধ্যে মৈত্রীর ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন ফ্রেডারিক। আরবি থেকে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদকারীরা তাঁর কাছে থেকে যথেষ্ট সাহায্য পেত। স্টিফেন নামে এক পিসাবাসী **১১২৭** খ্রিস্টাব্দে অ্যান্টিয়োকে আল মাজুসীর চিকিৎসা সংক্রান্ত বিখ্যাত গ্রন্থটি অনুবাদ করেন। ফ্রাঙ্কেরা এই একটি মাত্র আরবি গ্রন্থই নিজেদের সাথে নিয়ে গিয়েছিল বলে জানা যায়।[১৯]

বারো শতকে গোটা ইউরোপ জুড়ে বহু অতিথিশালা, হাসপাতাল এবং কুষ্ঠরোগ চিকিৎসা কেন্দ্র গড়ে উঠে। অনুমান করা হয়, হাসপাতালের মাধ্যমে সুচিকিৎসার ব্যবস্থাটি মুসলিম প্রাচ্যের কাছে থেকেই নেওয়া। প্রাচ্যের প্রভাবেই ইউরোপে আবার জনসাধারণের জন্য স্নানাগার চালু হয়। রোমানরা এই ব্যবস্থার সপক্ষে থাকলেও খ্রিস্টানরা এর বিরোধী ছিল। **১২৪৭** খ্রিস্টাব্দে এ্যান্টিরোকে ত্রিপোলির ফিলিপ সির আল আসরার এর আরবি পাণ্ডুলিপি খুঁজে পান। এ্যারিস্টটলের নাম ভাঁড়িয়ে লেখা এই রচনার উদ্দেশ্য ছিল তাঁর যোগ্য শিষ্য আলেকজান্ডারকে সাহায্য করা। ফিলিপই এটিকে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। নাম দেন *সেক্রেটাম সেক্রোটোরাস*। ব্যবহারিক জ্ঞান এবং আলোক বিজ্ঞান সংক্রান্ত এই বইটি ছিল মধ্যযুগের পরবর্তী পর্বের অন্যতম জনপ্রিয় গ্রন্থ।[২০]

সাহিত্যের ক্ষেত্রে ইসলামের প্রভাব ছিল আরো পরিব্যপ্ত। যীশু খ্রিস্টের '*শেষ ভোজ্যকালীনথালা*' (Last Supper) সংক্রান্ত যেসব কাহিনী আছে তার বেশির ভাগ জন্ম সিরিয়ায়। অনুমান করা হয় ধর্ম যোদ্ধারা আরব দেশ থেকে *কালিলাহ ওয়া দিমনা* এবং *আরব্য রজনীর* কাহিনী শুনেছিলেন এবং স্বদেশ ফেরার পরও তার স্মৃতি ছিল অম্লান। চসারের স্কোয়ারিজ টেল আসলে আরব্য রজনীরই গল্প। লোকসম্মুখে শোনা প্র্যাচ্যের বিভিন্ন গল্প দিয়েই বোকাচ্চি ও তাঁর *ডেকোমেরন* গ্রন্থটি সাজিয়েছিলেন। আরবি এবং অন্যান্য ইসলামি ভাষার প্রতি খিস্টান ধর্ম প্রচারকদের আগ্রহ ও কিন্তু ধর্ম যুদ্ধেরই অবদান। রেমন্ড লুলের (মৃ.**১৩১৫** খ্রিস্টাব্দ) মতো অনেকেই মনে করতেন, মুসলিমদের বিরুদ্ধে শুধু

---

১৮ পি.কে.হিট্টি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫৫।

১৯ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৪।

২০ খন্দকার মাশহুদ-উল-হাছান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯২।

মাত্র সামরিক সংঘর্ষে লিপ্ত থেকেই ধর্ম যোদ্ধারা তাঁদের পতন ডেকে আনেন। ক্যাটালান রেমন্ড লুলই প্রথম ইউরোপীয় যিনি প্রাচ্যের শিক্ষার মাধ্যমেই শান্তিপূর্ণ ধর্মযুদ্ধের উপর জোর দেন। তাঁর মত ছিল হিংসা নয় মুসলিমদের আস্থা অর্জন করেই লক্ষ্যে পৌছাতে হবে।[২১]

১২৭৬ খ্রিস্টাব্দে রেমন্ড লুল মিরামারে খ্রিস্টানদের আরবি শিক্ষার জন্য একটি মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। সম্ভবত তাঁর এই প্রয়াসের প্রভাবেই কাউন্সিল অব ভিয়েনা ১৩১১ খ্রিস্টাব্দে প্যারিস, লুভেন এবং সালামাঙ্কায় আরবি এবং তাতার শিক্ষণের দুটি পদ তৈরির সিদ্ধান্ত নেন।[২২]

ইতালি ও নরম্যান্ডির ধর্মযোদ্ধারা দূর্গ তৈরিতে দক্ষ ছিল। তাদের কাছে থেকেই এই বিদ্যা যে কিছুটা রপ্ত করেছিল আরবরা তার প্রমাণ কায়রোর নগর দূর্গ। ফ্রাঙ্কদের স্থাপত্য বিদ্যা দেখা যায় মূলত প্রাসাদ ও গির্জায়। এর মধ্যে *হিসন আল আকরাদ*, *আল মারকার* এবং *আল শাকিক* (বেলফোর্ট)সহ অধিকাংশ প্রাসাদই আজও বর্তমান। জেরুজালেমে পবিত্র সেপালকার গির্জার কিছু অংশ, আকসা মসজিদের কাছে সলোমনস স্টেবলস এবং বেশ কয়েকটি ধনুকাকৃতি ছাদ বা খিলান বিশিষ্ট বাজার তাদেরই তৈরি। সেপালকার গির্জা এবং ডোম অব দ্যা রকের অনুকরণে গোল মন্দির ধাঁচের অনেক গির্জাই তৈরি হয়েছিল। এর মধ্যে চারটি ইংল্যান্ডে এবং বাকিগুলি ফ্রান্স, স্পেন ও জার্মানিতে তৈরি হয়। বৈরুতের তথাকথিত উমারি মসজিদটি ১১১০ খ্রিস্টাব্দে সেন্ট জন গির্জা হিসেবে তৈরি করেন প্রথম বল্ডউইন।[২৩]

ধর্মযুদ্ধ পর্বের স্থাপত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যই ছিল কৌণিক মিনার এবং সাদামাটা কৌণিক ছাদ। কায়রোতে ফ্রাঙ্ক স্থাপত্য শিল্পের সবচেয়ে সুন্দর নিদর্শন হল আল নাসিরের মসজিদের তোরণদ্বার। ১২৯১ খ্রিস্টাব্দে আক্কার গির্জা থেকে এই তোরণদ্বার নিয়ে মসজিদে বসানো হয়।[২৪]

১১৮০ খ্রিস্টাব্দে নরম্যান্ডিতে প্রথম বায়ুচালিত কল ব্যবহৃত হলেও ধর্মযুদ্ধের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। এই সময়ের আগে থেকেই ইউরোপে জলচালিত চাকা (নোবিয়া, আরবি না'উরাহ্ থেকে) দেখা যেত। তবে আরবমুলুক থেকে শেখা বিদ্যা দিয়ে ধর্ম যোদ্ধারা একে আরো কার্যকর উন্নত করে ফেলে। সিরিয়ার ধাঁচের চাকা আজও জার্মানিতে, বা বেরিউথের নিকটবর্তী অঞ্চলে দেখা যায়। সিরিয়ায় সেই রোমান যুগ থেকেই জলচালিত চাকা ব্যবহার করা হয়। কিন্তু স্থানীয় যন্ত্রবিদদের দক্ষতায় তা আরো উন্নত হয়ে উঠে। এদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন মিসরীয় যন্ত্রবিদ কায়সার ইবনে মুসাফির তায়াসিফ (মৃ. ১২৫১

২১ *তদেব*।
২২ পি.কে.হিট্টি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫৫।
২৩ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৪।
২৪ খন্দকার মাশহুদ-উল-হাছান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯৪।

খ্রিস্টাব্দ)। হামার রাজকর্মচারী এই বৈজ্ঞানিকই আরবে মহাকাশ সংক্রান্ত প্রথম গোলক তৈরি করেন। এই গোলকটি এখনও পর্যন্ত অক্ষত আছে। ইয়াকুত (মৃ. ১২২৯ খ্রিস্টাব্দ) এবং আবু আল ফিদার (মৃ. ১৩৩১ খ্রিস্টাব্দ) সময় থেকেই হামার অন্যতম গর্বের বস্তু এই চাকা। কেবল রসনাতেই নয় প্রাচ্যের প্রভাব পড়েছিল প্রতীচ্যের পোশাক পরিচ্ছদ, গৃহসজ্জা এমন কী প্রসাধনেও। রুচি এবং সেই সাথে চাহিদারও পরিবর্তন ঘটতে শুরু হয়। তখন থেকে দাড়ি রাখার চল শুরু হয় ইউরোপে। আবার ফেরত ধর্মযোদ্ধারা পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার নিজস্ব কম্বল, গালিচা এবং পর্দা দিয়ে গৃহসজ্জার নতুন রূপকে জনপ্রিয় করে তোলে। মসলিন, বালদাচিন, দামেস্কের ভেলভেট সাটিন, রেশমি কাপড়ের কদর বুঝতে শেখে ইউরোপীয়রা।[২৫]

দামেস্ক ও কায়রোর ইহুদিদের তৈরি অলংকার ও প্রসাধন সামগ্রী প্রতীচ্যের মহিলাদের মন কেড়ে নেয়। সহজেই আয়নায় ইস্পাতের পরিবর্তে অন্য ধাতুর পাতলা আস্তরণ দেওয়া শুরু হয়। নিছক আরামের জন্যই নয়, সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যও প্রাচ্যের তৈরি রেশম ও পশমের কাপড় (কামলাহ) উটের লোম এবং নরম পশুর চর্মের পোশাক প্রতীচ্যে দেখা যেতে লাগল প্রায়শই। মুসলিমদের তসবি দানার অনুকরণে পুঁতি দিয়ে গাঁথা মালার আবির্ভাব ঘটল ইউরোপে। ধর্মীয় স্মারক ইত্যাদি রাখার জন্য বিশেষ পাত্র তৈরি হত আরবে। ইউরোপীয় তীর্থযাত্রীরা সেইসব পাত্র দেশে নিয়ে যেতেন।

মনো লেভো কাপড় এবং ধাতুর তৈরি নানা সামগ্রীর সাথে ইউরোপের পরিচয় হয় আরব দুনিয়ার মাধ্যমেই। শুধু তাই নয়, এ পর্যন্ত অব্যবহৃত যে সব রং, তাতে নিজেদের রাঙিয়ে নিতে শুরু করে প্রতীচ্যের মানুষ। যেমন- গোলাপি ও বেগুনির সংমিশ্রণে তৈরি লাইলাক ফুলের রং (ফ্রেঞ্চ, আরবি লাইল্যাক মূলত পারসিক), উজ্জ্বল লাল রং (ফ্রেঞ্চ আরবি কিরমিজ মূলত শব্দটি সংস্কৃত)। ধীরে ধীরে প্রাচ্যের অনুকরণে কাপড়, পোশাক, কম্বল ইত্যাদি তৈরি শুরু হয় খোদ ইউরোপেই। অ্যারাস ছিল এই রকমই একটি উৎপাদন কেন্দ্র; এখানকার কাপড় বিক্রি হত চড়া দামে। ফ্রাঙ্ক শাসিত অ্যান্টিয়োকে গিয়েছিলেন টুডেলার বেঞ্জামিন, তাঁর লেখায় সেখানকার রঙিন কাঁচ তৈরির কথা জানা যায়। কাঁচ, মাটি, সোনা, রূপা এবং মিনার কাজে আরব শিল্পিদের দক্ষতাই প্রেরণা যুগিয়েছে ইউরোপীয়দের।[২৬]

ধর্মযুদ্ধ পর্বে জলপথ পরিবহনের এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল দিক নির্ণয় যন্ত্র। চুম্বককে দিক নির্ণয়ের কাজে লাগানোর উপযোগিতা সম্ভবত চীনাদেরই প্রথম চোখে পড়ে। কিন্তু প্রাচীন কাল থেকে পারস্য

---

[২৫] ড. গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৮।

[২৬] খন্দকার মাশহুদ-উল-হাছান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯৬।

উপসাগর ও সূদুর প্রাচ্যের জলপথে বাণিজ্য করে মুসলিমরা এই বিদ্যা রপ্ত করে এবং তাকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করে। জলপথে দিক নির্ণয়ের জন্য চুম্বক ব্যবহার করতে শুরু করে তারা । সম্ভবত ১১ শতক নাগাদই এই যন্ত্রের ব্যবহার শুরু হয়ে যায় মুসলমানদের মধ্যে। কিন্তু বাণিজ্যিক কারণে তা গোপন রাখা হয়। ইউরোপে ইতালিয় নাবিকরাই প্রথম দিক নির্ণয় যন্ত্র ব্যবহার করে। আর এই ব্যবহারের পরে সাহিত্যেও তার উল্লেখ হতে থাকে।[২৭]

মুসলিম সাহিত্যে এই যন্ত্রে প্রথম উল্লেখ্য আছে পারস্যের একটা গল্প সংকলনে। *জাওয়ানি আল হিদায়াত ওয়া লাওয়ামি আল রিয়াইয়াত* নামে এই সংকলন রচিত হয় ১২৩০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। মুহম্মদ আল আওফি এটি রচনা করেন। একটি গল্পে লেখক নিজেকে নাবিক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। সেই সাথে চৌম্বক শক্তি সম্পন্ন একটা মাছ তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। ল্যাটিন সাহিত্যে অবশ্য ১২ শতকেই দিক নির্ণয় যন্ত্রের উল্লেখ করা হয়েছে। তাই ব্যবহারের দিক থেকে নাহলেও সাহিত্যে উল্লেখ্যের ক্ষেত্রে মুসলিমদের থেকে লাতিনরা এগিয়ে ছিল।[২৮]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এই প্রতীয়মান হয় যে, আয়্যুবিয়দের শাসনামলে ধর্মযুদ্ধ পর্ব চলছিল। তবুও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় এটি ছিল স্বর্ণোজ্জ্বল যুগ। কেননা ধর্মযুদ্ধের মধ্যেও আয়্যুবিয় শাসকবর্গ বিজ্ঞান, দর্শন, চিকিৎসাশাস্ত্র, সাহিত্য, স্থাপত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রাখেন। এ সময়কে ইসলামের ইতিহাসে বন্ধ্যাযুগ বলা হলেও এসময়ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রথা মুসলমানরা তাদের মধ্যে জিইয়ে রেখেছিল নিভু নিভু মোমবাতির ন্যায়। তাইতো মুসলমানদের মধ্য থেকে বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের চর্চা একেবারেই নিস্তেজ হয়ে যায়নি। ধর্মযুদ্ধে এসে খ্রিস্টানরা মুসলমানদের জ্ঞান বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি গ্রহণ করে ইউরোপে ফিরে গিয়ে তার পরিপূর্ণ ব্যবহার করেছে।

---

[২৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯৭।

[২৮] ড. গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০০।

অষ্টম অধ্যায়
মামলুকদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সৃজনশীল কর্মকান্ড

মামলুক শব্দের অর্থ ক্রীতদাস।[১] আব্বাসিয় খলিফা ও সেলজুক সুলতানদের আমলে তুর্কি দাসদের দেহরক্ষী হিসেবে নিয়োগ করা হত। ক্রীতদাস থেকে সুলতানের সর্বোচ্চ শিরোপা পাওয়া এই মামলুকদের ইতিহাস গোটা বিশ্বে সত্যিই নজিরবিহীন। এই মামলুকগণ সিরিয়া ও মিসরের মাটি থেকে যুদ্ধ বিধ্বস্ত ধর্মযোদ্ধাদের নিশ্চিহ্ন করতে সক্ষম হয়।[২] সালাহ্উদ্দিন আয়্যুবিয় এর সময় মামলুকগণ প্রশাসনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং ক্রমে এরা ক্ষমতা হরণ করে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করে। সুলতান সালাহ্উদ্দিন আয়্যুবিয় এর মৃত্যুর পর (১২৪৯ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর স্ত্রী (মামলুক) সাজারুদ্দারকে মামলুকগণ রাণী হিসেবে ঘোষণা করেন। প্রকৃতপক্ষে রাণী সাজারুদ্দারকেই মামলুক বংশের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। ২৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে (১২৫০ খ্রিস্টাব্দ-১৫১৭ খ্রিস্টাব্দ) মামলুকদের দখলে ছিল বিশ্বের অন্যতম উপদ্রুত অঞ্চল।[৩]

সামগ্রিকভাবে মামলুক শাসনামল মিসরের ইতিহাসে একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করে। ইসলামের ইতিহাসে মামুলক বংশের অবদান অনস্বীকার্য। তাঁরা মোঙ্গলদের আক্রমণ প্রতিহত করে সিরিয়া ও মিসরকে শুধু ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষাই করেননি; বরং সংস্কৃতি ও সভ্যতা অব্যাহত রাখেন।[৪]

ক্রুসেডারদের বিতাড়িত করে ইসলামের আধিপত্য পুন:প্রতিষ্ঠা করা হয়। সামরিক ও প্রশাসনিক সাফল্য দিয়ে সূচনা হলেও মামলুক পর্বের শেষ দিকে নানা অরাজকতা ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয় মিসর এবং সিরিয়াকে। মামলুকদের সামরিক শক্তি যেমন হ্রাস পেয়েছিল, তেমনই মাথা চাড়া দিয়েছিল জাতিদ্বন্দ্ব, বিদ্রোহ। মুদ্রার অবমূল্যায়ন, চড়া করের বোঝা এবং ঘনঘন খরা ও মহামারী সাধারণ মানুষের জীবনে ঘোর অনিশ্চয়তা ডেকে এনেছিল। প্রাচীন কুসংস্কার এবং তুকতাক ও জাদুবিদ্যার চল অন্যত্র তেমন না থাকলেও নীলনদের উপত্যকায় তা যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। সেই সাথে সংস্কার বিরোধী রক্ষণশীলতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল। এই অবস্থায়

---

১ ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *স্পেন ও উত্তর আফ্রিকার মুসলিম শাসনের ইতিহাস* (ঢাকা: উত্তরণ প্রকাশন, বাংলা বাজার, ২০০৫), পৃ. ২৪৪।

২ খন্দকার মাশহুদ-উল-হাছান, *আরবের ইতিহাস* (ঢাকা: জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, বাংলা বাজার, ২০০৩), পৃ:৪৯৮।

৩ পি.কে.হিট্টি, *আরব জাতির ইতিহাস* (অনুবাদ: জয়ন্ত সিং, সেঁজুতি ভট্টাচার্য, সৌমিত্র সেন গুপ্ত) (কলকাতা: মল্লিক ব্রার্দাস, ২০০৫), পৃ. ৬৬৪।

৪ ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৯।

উচ্চমানের বৌদ্ধিক অবদানের প্রত্যাশাও করা যায়না।[৫] তবুও এরই মধ্যে শান্তি ও শৃংখলা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক উৎকর্ষতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা, শিল্পকলা, সাহিত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়।

আট থেকে তের শতক পর্যন্ত আব্বাসিয় যুগে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা, শিল্পকলা, সাহিত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে প্রাধান্য বিস্তার করে তা মামলুকদের রাজত্বে স্থিমিত হয়ে আসে। শুধুই সম্পদ ও ক্ষমতা কুক্ষিগত করার অবিরাম প্রয়াস একের পর এক প্রজন্মের মানসিক ও নৈতিক অবসাদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই অবসাদের চিহ্ন ছিল সর্বত্র। তবুও ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে আরবগণ জ্যোতিষশাস্ত্র, অঙ্কশাস্ত্র (ত্রিকোণমিতিসহ) এবং চিকিৎসা শাস্ত্র, বিশেষ করে চক্ষুচিকিৎসার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দান করে।

আরবি ভাষায় দক্ষ পারস্য বৈজ্ঞানিকগণ ইসলামি আমলে মারাঘায় নাসিরউদ্দিন তুসির নেতৃত্বে জ্যোতির্বিজ্ঞানে অবদান রাখেন। এদের রচনা সবই আরবি ভাষায় ছিল। মারাঘা ব্যতীত অন্যতম প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল ইল-খানিদ মানমন্দির।[৬] সিরিয়ার ঐতিহাসিক আবু আল ফারাজ ইবন আল ইবরিকে সিরীয় সাহিত্যের শেষ ধ্রুপদী লেখক হিসেবে গণ্য করা হয়। আশ্চর্যের বিষয় হল, সিরিয়ার জ্যাকোবাইট ক্যাথেলিক (বার হেব্রিয়াস ১২২৬ খ্রিস্টাব্দ-৮৬ খ্রিস্টাব্দ) এই ঐতিহাসিক মারাঘা গ্রন্থাগারে ইউক্লিডের উপর (১২৬৮ খ্রিস্টাব্দ) এবং টলেমির উপর (১২৭২ খ্রিস্টাব্দ-৭৩ খ্রিস্টাব্দ) ভাষণ দেন।[৭]

চিকিৎসাবিজ্ঞানে মামলুক রাজবংশের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। সিরীয় মিসরীয় মামলুক রাজ্যে চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রভূত উৎকর্ষ সাধিত হয়। চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতির ব্যাপারে মিসরীয় সুলতানরা অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। সুলতান কালাউন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রখ্যাত হাসপাতাল চিকিৎসা শাস্ত্রের অগ্রগতির ইঙ্গিত দান করে। দামেস্কে কালাউন অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী থাকাকালীন আরোগ্য লাভের পর নুরুদ্দিনের হাসপাতালের অনুকরণে কায়রোতে একটি 'মারিস্তান' (হাসপাতাল) নির্মাণের পরিকল্পনা করেন।[৮] ১২৮৪ খ্রিস্টাব্দে এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয় এবং এতে তিনটি পৃথক ইমারাত ছিল; হাসপাতাল ছাড়াও একটি মসজিদ ও সমাধি ছিল। এ হাসপাতালের অধ্যক্ষ ছিলেন আবুল হাসান ইবনে আল নাফিস। তিনি ফুসফুসের রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে *সারহ তাশরীহ আল কানুন*

---

[৫] পি.কে.হিট্টি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭৬।

[৬] *তদেব*।

[৭] ড. গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া, *উত্তর আফ্রিকা ও মিসরে মুসলিম শাসনের ইতিহাস* (ঢাকা:খান ব্রাদার্স এন্ড কোং, বাংলাবাজার, ২০০৬),পৃ. ১১৪।

[৮] পি.কে.হিট্টি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭৮।

নামক একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।[৯] অথচ এই আবিষ্কারের কৃতিত্ব দেওয়া হয় পর্তুগিজ বিজ্ঞানী সারভিটীয় (Servetus) কে। উল্লেখযোগ্য যে, এ বিষয়ে মুসলমানগণ তিন শতক পূর্বে অবদান রাখেন। কেননা সারভেটোদের তত্ত্ব রচিত হয় আলী ইবন আল নাফিসের ২৫০ বছর পরে। কালাউনের শাসনকালের এই চিকিৎসকদের মৃত্যু হয় দামাস্কাসে (১২৮৮ খ্রিস্টাব্দ-৮৯ খ্রিস্টাব্দ)।

কালাউনের সুযোগ্য পুত্র আল নাসিরের রাজত্বকালে রাজকীয় অশ্বশালার অধ্যক্ষ আবু বকর ইবনে আল মুনজির আল বাইতার পশু চিকিৎসার উপর একটি তথ্য সম্বলিত গ্রন্থ রচনা করেন। উল্লেখ্য, সে সময় পশু চিকিৎসককে আল বাইতার বলা হয়। গ্রিক শব্দ *হিপ্পিয়াটুস* থেকে বাইতার শব্দটি নেওয়া। গ্রন্থটি *কামিল ডস সিনা আতাইন আল বায়তারা ওয়া আল জারতাকা* নামে পরিচিত ছিল। এর থেকেই বোঝা যায়, যাযাবর থাকার সময় থেকেই আরবরা উট এবং ঘোড়ার রোগ সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে জানলে ও পশু চিকিৎসায় আরো সুসংহত জ্ঞান এবং উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার সম্ভবত বাইজান্টাইন বিশেষজ্ঞদের কাছে থেকেই তারা শেখে।[১০] কালাউন এবং বারকুক সহ বেশ কয়েকজন মামলুক সুলতানের আস্তাবলেই ঘোড়ার সংগ্রহ ছিল দেখার মত। ঘোড়াকে কেন্দ্র করে ইসলামী ঐতিহ্য সংক্রান্ত নানা গ্রন্থ লেখাও শুরু হয় এই সময় থেকে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কালাউনের মানসুরিয়াহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক আবদ আল মুমিন আল দিমিয়াতির লেখা (মৃ. ১৩০৬ খ্রিস্টাব্দ) *ফসল আল খাইল* (অশ্বের উৎকর্ষ) নামক গ্রন্থটি।[১১]

আয়্যুবিয়দের সময় থেকেই ইহুদি চিকিৎসকগণ মিসরীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানে অবদান রাখতে সক্ষম হন।[১২] বিশিষ্ট চিকিৎসক ইবনে মায়মুনের খ্যাতি ও কৃতিত্বের ধারাকে অক্ষুন্ন রেখেছিলেন এই ইহুদিরা। কিন্তু ইহুদি চিকিৎসকই হোন বা মুসলিম, একটা ক্ষেত্রে এরা পিছিয়ে ছিলেন। আর তা হল চিকিৎসাশাস্ত্রে নতুন কোন পথ বা পন্থার সন্ধান পাননি তাঁরা।[১৩] তবে এ পর্যন্ত যা চর্চিত হয়েছে তা লিপিবদ্ধ হতে থাকে এই সময়েই। ইহুদি ও মিসরীয় ভেষজজ্ঞ আল কুহিন (প্রধান) আল আত্তার (ভেষজী) ১২৬০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ আরবিতে ভেষজ সংক্রান্ত একটি গ্রন্থ লেখেন। মূল্যবান গ্রন্থটির

[৯] ড. গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৪।
[১০] পি.কে.হিট্টি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭৮।
[১১] ড. গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৫।
[১২] পি.কে.হিট্টি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭৮।
[১৩] ড. গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৫।

নাম *মিনহাজ উদ দুককান আল দুসতুর আল আইয়্যান* (ভেষজ ব্যবহার প্রয়োগের বিধি ও তালিকা)। মুসলিম প্রাচ্যে আজও এই গ্রন্থটি হারায়নি তার উপযোগিতা।[১৪]

মামলুক যুগে স্ত্রীরোগ সম্পর্কে প্রামাণ্য গ্রন্থ রচিত হয় এবং এক্ষেত্রে মিসরের আল তিফাসি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। আপাতদৃষ্টিতে স্ত্রীরোগ সংক্রান্ত হলেও এর মধ্যে অনেকটাই ছিল কামোদ্দীপক। আজকের ভাষায় এইগুলোকেই আমরা *আদির রসাত্মক বই* হিসাবে চিহ্নিত করি।[১৫] আরবি সাহিত্য সবযুগেই মূলত পুরুষ পাঠ্য। এর টীকা টিপ্পনীতে থাকা সরস মন্তব্য আজকের পাঠকের কাছে অশ্লীল মনে হতে পারে। পেশাগতভাবে আল তিফাসি ছিলেন জহুরি। তেরো শতকের মধ্যভাগেই তাঁর জনপ্রিয়তার শুরু।[১৬] এই সময়ে মিসরে আল ফাজির অনুকরণে মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আল-রাযী প্রথম এর নাম দেন *তিব্ব রুহানী* (ইলাজ নাফসানি, ঝাড়ফুঁক)। এই মানসিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ ছিলেন সালাহ্উদ্দিনের ইহুদি চিকিৎসক হিবাতুল্লাহ ইবন জুবাঈ (জামি)। তাঁর প্রধান গ্রন্থটির নাম *আল ইরশাদ লি মাসালিহ আল আনাফাস ওয়া আল আজযাদ* (শরীর ও মনকে সুস্থ রাখার পদ্ধতি)। চিকিৎসক হিসাবে ইবনে জুমাঈ'র দক্ষতা ছিল প্রশ্নাতীত। একবার, এক শবযাত্রার 'শব' কে দেখেই তিনি বুঝেছিলেন, সে জীবিত। কারণ মৃত মানুষের মত তার দুটি পায়ের পাতা নিস্তেজ হয়ে পড়ে ছিলনা। পা দুটি সোজা ছিল।[১৭]

চক্ষু চিকিৎসায় আরবদের দক্ষতা সুবিদিত। মামলুক শাসনের আগে থেকেই আরবরা এই চিকিৎসার চর্চা শুর করে।[১৮] কিন্তু বারো এবং তের শতকে সিরিয়া ও মিসরে চক্ষু চিকিৎসা হতে থাকে অত্যন্ত বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে। সিরিয়া ও মিসরের চিকিৎসকগণ চক্ষু শাস্ত্রে যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জন করেন। বিশ্বের অন্য কোন প্রান্তেই তখন এই চিকিৎসা এতটা বিজ্ঞান সম্মত ছিলনা।[১৯] বারো শতকে আরবিতে লেখা হয় চক্ষু চিকিৎসার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থটি। কায়রোর ইহুদি চক্ষুচিকিৎসক আবু আল ফাযাইল ইবন আল নাকিদের (মৃ. ১১৮৮ খ্রিস্টাব্দ-৮৯ খ্রিস্টাব্দ) লেখা এই গ্রন্থটির নাম

---

১৪ খন্দকার মাশহুদ-উল-হাছান,*প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০৮।

১৫ পি.কে.হিট্টি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭৮।

১৬ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৫।

১৭ খন্দকার মাশহুদ-উল-হাছান,*প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০৯।

১৮ পি.কে.হিট্টি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭৯।

১৯ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৫।

মুজাররাবাত (পরীক্ষিত চিকিৎসা)। চিকিৎসা শাস্ত্রে এটা সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য গ্রন্থ বলে স্বীকৃতি লাভ করে।[২০]

এগারো শতকের পরে সিরীয় চিকিৎসকগণ চিকিৎসাশাস্ত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। আলেপ্পোর চিকিৎসক খলিফা ইবনে আবি আল মাহাসিন *আল কাফি ফি আল কুহল* (ভেষজ অঞ্জনের বিশদ বিবরণ) নামক একটি পুস্তক রচনা করেন। ত্রয়োদশ শতকের শেষার্ধে হামার চিকিৎসায় সালাহ্উদ্দিন ইবনে ইউসুফ *নুর আল উয়ুন ওয়া জামিউল ফুনুন* (চোখের জ্যোতি এবং বিদ্যা বিভাগের সংক্ষিপ্তসার) শীর্ষক একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এটি ১২৯৬ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ রচনা করেন।[২১] শল্য চিকিৎসায় নিজের দক্ষতা সম্পর্কে খলিফা ইবনে আবি আল মাহাসিন এতটাই আত্মবিশ্বাসী ছিলেন যে, একচক্ষু ব্যক্তির ছানি কাটতেও তাঁর কোন দ্বিধা হয়নি।[২২] মামলুক পর্বে সিরিয়ার পন্ডিতদের উত্থানের কথা বলতে গেলে একটি বিশেষ তথ্য জানা প্রয়োজন। সিরিয়ার সব পন্ডিতদের সাফল্যই ছিল দেশের অভ্যন্তরীণ শহরগুলিতে। কারণ উপকূলবর্তী অঞ্চল ছিল ক্রুসেডারদের দ্বারা যুদ্ধ বিধ্বস্থ। পরবর্তীতে কালাউন ও তাঁর বংশধরদের পাল্টা আক্রমণে শান্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল সিরীয় উপকূলে।[২৩]

আরবগণ জগতের সর্বাপেক্ষা খ্যাতি সম্পন্ন চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস রচয়িতা মুয়াফফাকউদ্দিন আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে আবি উসাইবিয়া (১২০৩ খ্রিস্টাব্দ-১২৭০ খ্রিস্টাব্দ) মামলুক রাজত্বের প্রথম ভাগে দামেস্কে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা করেন।[২৪] দামেস্কের এক চক্ষু চিকিৎসকের পুত্র ইবনে আবি উসাইবিয়া নিজেও ছিলেন একজন চিকিৎসক। দামেস্ক ছাড়াও তিনি কায়রোতে পড়াশোনা করেছিলেন। বিশিষ্ট চিকিৎসক ইবন আল বাইতারের সাথে তিনি ভেষজ নিয়ে গবেষণা করেন। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও চিকিৎসক আবদ আল লতীফ আল বাগদাদী'র সাথেও নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। তিনি *উইয়ুন উল আনবা ফি তাবাকাত উল আতিব্বা* (বিভিন্ন চিকিৎসকের সম্পর্কে তথ্যের ঝর্ণাধার) নামক একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন।[২৫] সুবিশাল তথ্যবহুল এ গ্রন্থে প্রায় ৪০০ গ্রিক ও আরবি চিকিৎসকের জীবন বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে। চিকিৎসক হওয়ার সাথে সাথে দর্শন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা এবং গণিতেও এরা পন্ডিত ছিলেন। তাই ইবনে আবি উসাইবিয়ার এই গ্রন্থটি আরবের বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাসে এক অমূল্য

---

২০ খন্দকার মাশহুদ-উল-হাছান,*প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০৯।
২১ পি.কে.হিট্টি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭৯।
২২ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৬।
২৩ খন্দকার মাশহুদ-উল-হাছান,*প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০৯।
২৪ পি.কে.হিট্টি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭৯।
২৫ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৬।

তথ্যভান্ডার। সাহিত্য সৃষ্টির দিক থেকেও গ্রন্থটির মূল্য কম নয়। তাছাড়া এই রকম গ্রন্থ আরবি সাহিত্যে বিশেষ লেখা হয়নি।[২৬]

অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা শাস্ত্রের ইতিহাস ছিল ইবনে ইউসুফ উল কিফতি (১১৭২ খ্রিস্টাব্দ- ১২৪৮ খ্রিস্টাব্দ) প্রণীত *ইখবার আল উলামা বিন আখবার আল হুকামা* (দার্শনিক ও চিকিৎসকদের কাহিনীর মাধ্যমে এই পন্ডিতদের জানা) গ্রন্থটির নাম এক্ষেত্রে উল্লেখ করা গেলেও এটি নিছকই সংক্ষিপ্তসার। পদবি থেকেই বোঝা যায় আল ইবন ইউসুফ আল কিফতির জন্ম উচ্চতর মিসরে। তবে জীবনের অধিকাংশ সময়ই তিনি কাটিয়েছিলেন আলেপ্পোতে। ১২৪৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি সেখানে আয়্যুবিয় শাসকদের উজির ছিলেন।[২৭]

মামুলক রাজত্বকালে বিজ্ঞান ছাড়াও ইতিহাস, ধর্মশাস্ত্র, জীবনী প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হয়। এ সময় ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনী রচয়িতার আবির্ভাব হয় দামেস্কে। এ সময়ে সাহিত্যের বিশিষ্ট জীবনীকার শামস ইবন দীন (বিশ্বাসের সূর্য) আহমদ ইবনে মুহম্মদ ইবনে খাল্লিকান-এর উত্থান হয় দামেস্কে। ইয়াহিয়া ইবনে খালিদ আল বারমেকীর বংশধর এই জীবনীকারের জন্ম ১২১১ খ্রিস্টাব্দে।[২৮] তাঁকে সিরিয়ার প্রধান কাজী নিযুক্ত করা হয়। তাঁর সদর দফতর ছিল দামেস্কে। মাঝে ৭ বছর বাদ দিলে ১২৮২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি এই পদেই আসীন ছিলেন। তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ *ওফাইয়াত উল আইন ওয়া আবনা উজ জামান* (সম্প্রতি বিশিষ্ট মৃত ব্যক্তিদের জীবনী এবং সমকালীন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের ইতিহাস) রচনা করে যশস্বী লাভ করেন। এই মূল্যবান গ্রন্থে ইসলামের ইতিহাসের ৮৬৫ জন বিশিষ্ট মানুষের জীবন গাঁথা রয়েছে। যা শুধু নির্ভূলই নয়, রচনা শৈলীতেও অসাধারণ। আরবি ভাষায় জীবনী গ্রন্থের এত তথ্য নির্ভর ও নিখুঁত গ্রন্থ সেই প্রথম লেখা হয়। একে *আরবি ভাষায় জাতীয় জীবনীমূলক প্রথম অভিধান গ্রন্থ* বলে অভিহিত করা হয়। এ প্রামাণ্য জীবনী গ্রন্থের প্রত্যেকটি ব্যক্তির শুদ্ধ নাম।[২৯] যথাযথ তারিখে, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বংশ পরিচয় সহ অন্যান্য তথ্যকে নিখুঁত ভাবে পরিবেশন করে ঐতিহাসিক উপাদানে সমৃদ্ধ ছিল। এছাড়া সেই সাথে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত দিকগুলো তুলে ধরেছেন। আর সমকালীন উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি জীবন্ত করে

---

[২৬] খন্দকার মাশহুদ-উল-হাছান,*প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১০।
[২৭] পি.কে.হিট্টি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৮০।
[২৮] পি.কে.হিট্টি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৮০।
[২৯] খন্দকার মাশহুদ-উল-হাছান,*প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১০।

তুলেছেন কবিতা ও টীকার মাধ্যমে। তাই অনেকের মতেই এটি *সর্বকালের সেরা ও সর্বোৎকৃষ্ট লিখিত জীবনীগ্রন্থ*।[৩০]

ইতিহাস রচনায় মামলুক যুগ খুবই প্রসিদ্ধ ছিল; আবু আল ফিদা, ইবনে তাগরিবিরদি, আল সুয়ূতি, এবং আল মাকরিজির মত ঐতিহাসিকরা মামলুক যুগেরই ফসল। সুলতান বারকুকের শাসনামলের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক *ইবনে খালদুন* (মৃ.১৪০৬ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর পূর্ব পরিচয় এবং সাহিত্য কর্মের সূত্রে স্পেন এবং আল মাগরিবের সাথে যুক্ত ছিলেন। সুলতান বারকুকের অধীনে অধ্যাপক ও বিচারকের পদ অলংকৃত করেন তিনি। সেই সাথে দামেস্কে তাইমুরের সাথে শান্তি আলোচনায় সুলতান ফারাজের এক প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বও দেন।[৩১]

ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদ আবু আল ফিদা (১২৭৩ খ্রিস্টাব্দ-১৩৩২ খ্রিস্টাব্দ) ছিলেন সালাহ্উদ্দিনের এক ভ্রাতার বংশধর এবং সুলতান আল নাসিরের অধীনে হামাহ্ এর রাজ্যপাল। তাঁর রচিত গ্রন্থ *মুখতাসার তারিখ আল বাশার* (মানব ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ) এ তিনি ইবনে আল আশীরের বিশাল ইতিহাসকে আমাদের পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন। শুধু তাই নয়, এই ঐতিহাসিক বিবরণকে নিজের সময়কাল পর্যন্ত (১৪১১ খ্রিস্টাব্দ-৬৯ খ্রিস্টাব্দ) ব্যাপ্ত করে ইতিহাস রচনায় এক নবদিগন্তের সূচনা করেন।[৩২]

আবু আল মাহাসিন ইবনে তাগরিবিরদি'র পিতা ছিলেন মামলুক রাজদরবারের এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং মাতা সুলতান বারকুকের এক তুর্কি ক্রীতদাসী। তবে শুধু পিতৃ পরিচয়েই নয়, নিজগুণে একাধিক সুলতানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল ইবনে তাগরিবিরদির। তিনি আরবদের মিসর বিজয় থেকে ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘকালের মিসরের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন *আল নুযুম উল জাহিরা ফি মুলুক মিসর ওয়াল কাহিরা* (মিসর ও কায়রোর রাজন্যবর্গের উজ্জ্বল নক্ষত্রাবলি) শীর্ষক গ্রন্থে।[৩৩]

জালালউদ্দিন আল সুয়ূতি (১৪৪৫ খ্রিস্টাব্দ-১৫০৫ খ্রিস্টাব্দ) ইবনে যাওজী, ইবনে হাজম এবং আল তাবারীর মতো ইসলামের একজন সৃজনশীল লেখক ছিলেন; কিন্তু তাঁর রচনাবলিতে তিনি একজন সুবিদিত সাহিত্যিক ছিলেন। পনের শতকের সাহিত্যের এই উজ্জ্বল নক্ষত্রের রচনা আরবের

---

৩০ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৭।
৩১ পি.কে.হিট্টি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৮০।
৩২ খন্দকার মাশহুদ-উল-হাছান,*প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১১।
৩৩ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৭।

শিক্ষাজগতে সকল বিষয়েই সমৃদ্ধ ছিল। তিনি একাধারে আল কুরআন, আল-হাদিস, আইন, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে নাম পাওয়া গেছে। তাঁর একটি রচনায় আলোচ্য বিষয় বিচিত্র। হযরত মুহম্মদ (সা.) পাতলুন পরতেন কিনা, তাঁর পাগড়ি কেমন দেখতে ছিল অথবা তাঁর পিতামাতা স্বর্গে যাবেন না নরকে ইত্যাদি। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ হস্ত রেখাবিদ। তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থাবলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য *আল ইকতান ফি ইলম আল কুরআন, হুমেন আল মুহাদ্দারাহ ফি আখবার মিসর ও আল কাহিরাহ*। প্রথম গ্রন্থটি ছিল আল কোরআনের আলোচনা ও টীকা সংবলিত। আর দ্বিতীয় গ্রন্থটি মিসরের ইতিহাস সংক্রান্ত।[৩৪]

কায়রোতে জন্ম তাকি আল দীন আহম্মদ আল মাকরিজি'র (১৩৬৪ খ্রিস্টাব্দ-১৪৪২ খ্রিস্টাব্দ) মধ্যে আমরা মুসলিম ঐতিহাসিকদের মধ্যে অন্যতম যশস্বী ব্যক্তির সন্ধান পাই। তিনি নি:সন্দেহে মামলুক যুগের সর্বাধিক খ্যাতি সম্পন্ন ঐতিহাসিক ছিলেন। তিনি বা'লাবাক্কান বংশে জন্ম নিয়েছিলেন। কায়রো এবং দামেস্কে সহকারী কাজী এবং শিক্ষক হিসাবে বহু উচ্চ পদে কাজ করেছেন তিনি। তাঁর খ্যাতির প্রধান উৎস *আল মাওয়াইজ ওয়া আল ইতবার ফি যিকর আল খিতাত ওয়া আল আসার* (দৃষ্টান্ত সহযোগে ধর্মোপদে ও শিক্ষামূলক নতুন ব্যবস্থা ও ধ্বংসাবশেষের বর্ণনা) গ্রন্থটি। এ গ্রন্থে মিসরের ভৌগোলিক পরিবেশ, ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায়। তাঁর সমসাময়িক ঐতিহাসিক আল সাখাবী অভিযোগ করেছিলেন; এই গ্রন্থটি রচনায় আল মাকরিজি অন্যান্য ঐতিহাসিকদের ভাব ও রচনা চুরি করেছেন। এই অভিযোগ যে ভিত্তিহীন ছিল তা নয়। কিন্তু সেই সময়কার অধিকাংশ রচনাই ছিল এই দোষে দুষ্ট।[৩৫] অপর একজন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ছিলেন ইবনে দুকমাক (১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ-১৪০৬ খ্রিস্টাব্দ)। তাঁর মিসরের ইতিহাস (*নুযহাত আল আনাত*) এবং মিসরীয় শাসক বর্গের ইতিহাস (*আল জায়হার আল কামিল*) বিশেষভাবে তথ্যহুল গ্রন্থ হিসেবে সমধিক পরিচিত ছিল। মাকরিজির মত দুকমাক মুসলিম পুরাকীর্তি সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য বর্ণনা দেন।

বিশ্বকোষ রচনায় মামলুক যুগ উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। এ সময়ের দু'জন খ্যাতনামা বিশ্ব কোষ প্রণেতা ছিলেন। আহমাদ আল নুওয়াইরি (মৃ. ১৩৩২ খ্রিস্টাব্দ) এবং আহমদ আল কালকাশান্দি (মৃ. ১৪১৮ খ্রিস্টাব্দ)। নুওয়াইরি *নিহায়ত আল আরব ফি ফুনুন আল আদব* এবং আল কালকাশান্দি *সুবহ আল আ'শা* গ্রন্থের প্রণেতা। সরকারি শাসন বিভাগের কর্মীদের ব্যবহারের জন্য লেখা হলেও এই গ্রন্থগুলি মূলত মিসর ও সিরিয়া সংক্রান্ত ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্যে সমৃদ্ধ। মামলুক যুগের

---

[৩৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৮।
[৩৫] পি.কে.হিট্টি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৮১।

অবশিষ্ট লেখকরা ইসলামি শিক্ষা এবং ভাষাবিদ্যার উপর গ্রন্থ রচনা করেছেন। মামলুক যুগের এক উল্লেখযোগ্য এবং অসাধারণ গ্রন্থ হল নৌ-চালনার তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক দিক নিয়ে এক সংক্ষিপ্ত সার। রচয়িতা নাজাদি বংশের আহমদ ইবনে মাজীদ। তিনি ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগিজ নাবিক ও পর্যটক ভাস্কো দা গামার আফ্রিকা থেকে ভারতবর্ষে অভিযানের অগ্রদূতের কাজ করেন।[৩৬]

ধর্মশাস্ত্র ও ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রেও মামলুক যুগে উৎকর্ষ সাধিত হয়।[৩৭] মামলুক যুগে ধর্মতত্ত্বের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অবদান তাকি আল দীন আহমাদ ইবনে তাসমিয়া'র (১৩৬৩ খ্রিস্টাব্দ-১৩২৮ খ্রিস্টাব্দ)।[৩৮] অত্যন্ত নীতিপরায়ণ ও রক্ষণশীল এই পণ্ডিতের জন্ম হাররানে। তবে তাঁকে খ্যাতি এনে দেয় দামেস্ক শহর। তিনি আল কুরআন, হাদীস, ইজমা ব্যতীত অপর কোন কর্তৃত্বের বশ্যতা স্বীকার করেননি এমনকি ইসলাম ধর্মে প্রচলিত নতুন প্রথা বা বিদআতেরও কট্টর বিরোধী ছিলেন তিনি। যেমন: বিদ'আত, ফকির দরবেশের আরাধনা, দরগায় তীর্থযাত্রা বা মানত। মনে প্রাণে তিনি ইবনে হাম্বলের অনুগামী ছিলেন। তিনি আল কুরআন, হাদিস ও ফিকাহ্ শাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জন করেন এবং পরবর্তীকালে নেজদে ওয়াহাবিগণ তাঁর মতবাদ গ্রহণ করেন।[৩৯]

হাদিস শাস্ত্রের আরেকজন উল্লেখযোগ্য পন্ডিত ছিলেন কায়রোর প্রধান কাজী ইবনে হাজার আল আসকালিন (১৩৭২ খ্রিস্টাব্দ-১৪৪৯ খ্রিস্টাব্দ)। মাত্র নয় বছর বয়সেই আল কুরআন কণ্ঠস্থ করে ফেলেছিলেন তিনি। তিনি কায়রোতে প্রধান কাজির দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। মামলুক যুদ্ধের কবিদের মধ্যে সম্ভবত একমাত্র উল্লেখযোগ্য নামই হল শরীফ আল দীন মুহম্মদ আল বুসিবি (১২১৩ খ্রিস্টাব্দ-১২৯৬ খ্রিস্টাব্দ)। তিনি কবিতা রচনায় সমধিক প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। বার্বার বংশোদ্ভুত এই কবিই রচনা করেছিলেন বিখ্যাত গীতি কাব্য *আল বুরদাহ* (পয়গাম্বরের আবরণ)। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর স্মরণে রচিত এই কাব্যের অনুপ্রেরণা ছিল তাঁরই জীবনের এক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। একবার পক্ষাঘাতে পঙ্গু কবি পয়গম্বরকে স্বপ্নে দর্শন লাভ করেছিলেন। সেই শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতাই প্রতিফলিত হয়েছে আল বুরদাহ গীতিকাব্যে। আরবিতে এর থেকে জনপ্রিয় গীতিকাব্য আর নেই। আরবি, তুর্কি, ফারসি এবং বার্বারদের ভাষায় এই গীতিকাব্যের নব্বইয়ের বেশি ভাষ্য লেখা হয়েছে। আল-বুরদাহ অনুদিত হয়েছে ফারসি, তুর্কি, জার্মান, ফ্রেঞ্চ, ইংরেজি এবং ইতালিয় ভাষায়। আজও এই গীতিকাব্যের

---

৩৬ ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০২।
৩৭ *তদেব*।
৩৮ পি.কে.হিট্টি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৮২।
৩৯ খন্দকার মাশহুদ-উল-হাছান,*প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১২।

বিভিন্ন পঙক্তি আবৃত্তি করা হয়। দ্রুজারা তাদের অন্তেষ্টি অনুষ্ঠানে মৃত মানুষের আত্মার শান্তি কামনায় আল বুরদাহ পাঠ করেন।

আরব মুলুকের গল্পগাঁথা আজও গোটা বিশ্বের কাছে সুখ পাঠ্য। কিন্তু এগুলির জনপ্রিয়তার সূচনা কিন্তু মামলুক যুগ থেকে। *আন্তারা ও বায়বার্সে'র* যে দুটি প্রেমকাহিনী আজও মুসলিম প্রাচ্যের মনে গাঁথা রয়েছে, তা পরিমার্জিত হয়েছে মামলুক যুগেই।[৪০] বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদের দৌলতে যে *আলিফ লায়লা* আজ এত জনপ্রিয় তা কিন্তু মামলুক যুগের আগে ততটা জনপ্রিয় ছিল না। বিশ্বসাহিত্যে স্থান পাওয়ার উপযুক্ত করে তাকে ঘষামাজা করা হয় মামলুক যুগে। কবিতার এ যুগে আলিফ লায়লার পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয়া হয় এবং এতে মামলুক যুগের সামাজিক অবস্থা প্রতিফলিত হয়।[৪১]

মামলুক সুলতানরা ছিলেন ক্রীড়াপ্রেমী। বিশেষ করে ধর্মযুদ্ধ পর্বের সুলতানরা। ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বিশেষ করে তীরন্দাজি, মল্লক্রীড়া, শিকার এবং ঘোড় সওয়ারি ইত্যাদিতে উৎসাহ পূর্বের তুলনায় মামলুক যুগের বীরদেরই বন্দনা করেছেন সমকালীন রচয়িতারা। আরব্য রজনীর গল্পেও তারই প্রতিফলন ঘটেছে। এমন কী মামলুক শাসিত কায়রোর প্রতি রেওয়াজই তাদের কলমে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।[৪২]

তেরো শতকের শেষভাগে আরবি সাহিত্যে ছায়ানাট্যের (Shado play) আবির্ভাব ঘটে। এ সময় এটি জনপ্রিয়তার সর্বোচ্চ শিখরে উপনীত হয়। মুহম্মদ ইবনে দানিয়াল আল খুজাই আল মাওসিলি (মৃ. ১৩১০ খ্রিস্টাব্দ) রচিত *তাইফ আল খায়াল ফি মারিফা খায়াল আল জিল* শীর্ষক গ্রন্থে মধ্যযুগীয় ইসলামি সাহিত্যে সর্বপ্রথম ছায়ানাট্য এর অবতারনা করেন।[৪৩] এ জাতীয় নাট্যের উদ্ভব হয় পূর্ব প্রাচ্যে এবং মুসলমানগণ ভারতবর্ষ ও পারস্য থেকে এটা গ্রহণ করেন। এমনই একটি সাহিত্য সৃষ্টি যার রচনাশৈলীও যথেষ্ট উচুঁদরের। রচনাকার ছিলেন একজন মুসলিম চিকিৎসক। তবে ইহুদি না খ্রিস্টান বংশোদ্ভূত তা নিয়ে দ্বিমত আছে। বাইবার্সের শাসনকালে তাঁর উত্থান। তাঁর এই রচনায় মধ্যযুগের ইসলামে ছায়ানাট্যের একমাত্র নির্দশন যা আজও পাওয়া যায়।[৪৪]

---

[৪০] পি.কে.হিট্টি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৮২।
[৪১] খন্দকার মাশহুদ-উল-হাছান,*প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১৩।
[৪২] পি.কে.হিট্টি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৮২।
[৪৩] পি.কে.হিট্টি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৮৩।
[৪৪] ড. গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০।

নয় শতকের শেষের দিকে আরবি গল্প কারেরা তাঁদের কাহিনীতে জাতীয় বৈশিষ্ট্য আনতে শুরু করেন। সেই সঙ্গে প্রাধান্য দিতে থাকেন হাস্যরসকেও। বারো শতক নাগাদ পুতুল নাচেরও প্রচলন শুরু হয়ে যায়। এগার শতকে স্পেনে বাক্যালঙ্কারের ক্ষেত্রে খায়াল আল জিলের কথা উল্লেখ করেন ইবনে হাজম। পশ্চিম এশিয়া এবং মিসর থেকে এই নাট্যধারা প্রবাহিত হয় কনস্টান্টিনোপলে। এখানে প্রধান চরিত্রকে কারাগজ (কালো চক্ষা) সাজানো হত। এখান থেকে পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলোতেও এই নাট্যধারা জনপ্রিয় হয়। তুর্কি পুতুল নাচের অনেক উপকরণই আরব্য রজনীর থেকে ধার নেওয়া। অনুমান করা হয় চার্লি চ্যাপলিনের মত আধুনিক কালের অভিনেতাদের উপর তুর্কি কারাগজদের প্রভাব রয়েছে।[৪৫]

মামুলক শাসনামল যুদ্ধ বিগ্রহে পরিপূর্ণ হলেও অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার হল, গুণমানে অসাধারণ স্থাপত্যশিল্প ও চারুকলার একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা ঘটে।[৪৬] মিসরের ইতিহাসে টলেমী এবং ফেরাউনদের যুগের পর মিসরের ইতিহাসে স্থাপত্যকীর্তি ও চারুশিল্পের গুণগত বৈশিষ্ট্য উৎকর্ষের দিক থেকে আর কোনো নজর নেই। এত উচ্চদরের শিল্প সৃষ্টি আর হয়নি।[৪৭] বাহ্রি এবং বুরুজি মামলুকগণ স্থাপত্যকলার পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং তাঁদের আমলে কায়রোতে অনিন্দ্যসুন্দর ইমারত নির্মিত হয়। বাইবার্স, কালাউন, আল নাসির এবং আল হাসানের মসজিদ এবং হাসপাতাল, স্কুল ও সমাধি নির্মাণ করে মামলুক ললিতকলার উৎকর্ষ সাধন করেন। অপরদিকে বুরুজি মামলুকগণ; যেমন- বারকুক, কায়েতবাই এবং কানসুল ঘোরি বিভিন্ন ধরনের অলংকারে সুশোভিত ইমরাত তৈরি করেন। তারপর থেকে আরব মুলকে যার আর কোন উল্লেখযোগ্য অট্টালিকা বা প্রাসাদ তৈরি হয়নি।[৪৮]

বায়বার্স ১২৩১ খ্রিস্টাব্দে একটি জামে মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণ করেন। ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দ-৯৯ খ্রিস্টাব্দে নেপোলিয়ন কায়রো অধিকার করে বায়বার্সের মসজিদকে দূর্গে রূপান্তরিত করেন। কালাউনের '*মারিস্তান*' অর্থ্যাৎ হাসপাতালে তৎকালীন যুগে একটি অপূর্ব সুন্দর স্থাপত্যকীর্তি ছিল এবং সে সময় কালাউনের মসজিদ অপেক্ষা হাসপাতাল অধিকতর আকষর্ণীয় ছিল।[৪৯] এছাড়া মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণ করে কালাউন যশস্বী হন।

---

৪৫ খন্দকার মাশহুদ-উল-হাছান,*প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১৩।
৪৬ পি.কে.হিট্টি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৮৩।
৪৭ খন্দকার মাশহুদ-উল-হাছান,*প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১৩।
৪৮ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০।
৪৯ ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৩।

সুলতান আল নাসির স্থাপত্যকলার একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি ১৩০৪ খ্রিস্টাব্দে কায়রোতে নাসিরিয়া বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কথিত আছে যে, তাঁর আমলে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ৩০টি মসজিদ নির্মিত হয়। ১৩১৮ খ্রিস্টাব্দে কায়রোর দূর্গে তিনি যে মসজিদ নির্মাণ করেন তা খুবই আকর্ষণীয়। ১৩১৬ খ্রিস্টাব্দে ৫০ কোটি দিরহাম ব্যয়ে কাসার আল আবলাক অর্থ্যাৎ বিভিন্ন রঙে অলংকৃত হর্ম্য নির্মাণ করা হয়। তাছাড়া তিনি দরবেশদের আস্তানা, দূর্গ, বাঁধ, ফোয়ারা, মাদ্রাসা নির্মাণ করে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। কথিত আছে যে, তিনি নির্মাণ কার্যে প্রতিদিন গড়ে ৮০১০ দিরহাম ব্যয় করেন। বাহ্‌রী মামলুকদের অন্যতম খ্যাতিমান সুলতান আল হাসান (১৩৪৭ খ্রিস্টাব্দ-১৩৬১ খ্রিস্টাব্দ) কায়রোতে একটি অপূর্ব স্থাপত্য কীর্তির নিদর্শন স্বরূপ একটি মাদ্রাসা নির্মাণ করেন। বিশাল চত্বরের প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে এর বিশাল আয়তন, উজ্জ্বল এবং সীমিত অলংকরণ, স্থাপত্যশৈলীর সৌকর্য ও অনাড়ম্বরতা, ভল্টগুলোর উচ্চতা ও গভীরতা এবং দক্ষিণ কোনার মিনারের খাঁজকাটা ব্যালকনি দেখে স্বীকার করতে হয় যে, এ মাদ্রাসাটি পৃথিবীর মহৎ সৃষ্টির অন্যতম।[৫০]

বুরুজি মামলুকদের রাজত্বকালে মিসরীয় স্থাপত্য কীর্তি অব্যাহত থাকে। যা বারকুকের দুই গম্বুজ বিশিষ্ট সমাধি মসজিদ তাঁর পুত্র ফারাজ কর্তৃক নির্মিত হয়। কিন্তু বায়ন আল-কাসরিনে তাঁর সৌন্দর্যমন্ডিত মাদ্রাসা তাঁর রাজ্যের প্রথম ভাগের কীর্তি এবং শিল্পকলায় ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি তাঁর অনুরাগের পরিচায়ক। মিসরীয় মুসলিম স্থাপত্যের উপর একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ রচনা করেন এবং এতে মামলুক ইমারতের গঠন-প্রণালী, অলংকার ও বিভিন্ন উপাদানের ভূয়সী প্রশংসা করেন। কায়রো, মিসর, সিরিয়া এবং আরবে অসংখ্য ইমরাত নির্মাণ করেন। কায়রোতে অবস্থিত তাঁর দু'টি মসজিদ। তাঁর সরাইখানা অবিমিশ্র সারাসেনিক স্থাপত্যে ব্যবহৃত ব্যাপক জ্যামিতিক নক্‌শার (আরাবেস্ক) জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। তা ছাড়া তাঁর রাজত্বের অসংখ্য শিলালিপি থেকে জানা যায়, তিনি বহু ধ্বংস প্রাপ্ত ইমারতের সংস্কার করেন, মসজিদ, মাদ্রাসা, দূর্গ নির্মাণ করেন। পূর্ববর্তী সুলতানদের স্থাপত্য কীর্তির ধারা কায়রোতে অব্যাহত রেখে কানসুল ঘোরি মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণ করেন। এটা সাধারণভাবে ঘোরিয়া নামে পরিচিত। আলেকজান্দ্রিয়া ও রোজেন্টায় তিনি দূর্গ নির্মাণ করেন।[৫১]

মামলুক স্থাপত্য শৈলী গড়ে উঠে নুরিদ ও আয়ুবিয় স্থাপত্যের আদলে। তেরো শতকে তা সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ার প্রত্যক্ষ প্রভাবে নতুন মাত্রা পায়। কারণ এই তেরো শতকে মোঙ্গল আক্রমণের ভয়ে হাজার হাজার মুসলিম শিল্পী ও কারিগর আল মাওসিল, বাগদাদ, দামেস্ক থেকে পালিয়ে এসে মিসরে আশ্রয় নেয়। ধর্মযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর মিসরের উত্তরাঞ্চলে প্রস্তর নির্মিত স্থাপত্যের ক্ষেত্রে আর কোন

[৫০] *তদেব*।

[৫১] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৩।

বাধা ছিলনা। তাছাড়া এই সময় থেকে অট্টালিকা বা স্মৃতিসৌধ নির্মাণের ক্ষেত্রে ইটের স্থান নেয় পাথর। তাছাড়া এ মসজিদ সংলগ্ন বিদ্যালয় তৈরির ক্রুশ থাকার কাঠামোকে গড়ে তোলা হয় আরো নিখুঁতভাবে।[৫২]

মামলুক আমলে একাধিক গম্বুজ তৈরি হয়েছিল। প্রত্যেকটিই ছিল আশ্চর্য সুষমামন্ডিত। রোমানরা বাইজান্টাইন শিল্পধারার আদলে বিভিন্ন বর্ণ ও আকারের পাথর পরপর সাজিয়ে অসাধারণ নক্‌শা (আবলাক) তৈরি করা হত। মামলুক পর্বে ঝুলন্ত খিলান ছাড়াও মসজিদ স্থাপত্যের দুটি পরিচিত বৈশিষ্ট্য আরো উন্নত হয়ে উঠে। এই দুই বৈশিষ্ট্য হল, জ্যামিতিক নক্‌শা ও কুফিকলিপি খোদাই। এছাড়া ছিল লতাপাতার নক্‌শা।[৫৩] তবে মুসলিম স্থাপত্য শৈলীর মধ্যে থেকেই মিসরের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। মুসলিম শাসনের সব পর্বেই স্পেন ও পারস্যের তুলনায় মিসর ও সিরিয়ার স্থাপত্য পশু পাখির নক্‌শায় ব্যবহার ছিল অনেক কম। সবচেয়ে সুখের কথা, মামলুক স্থাপত্যের অসাধারণ নির্দশন গুলি আজও অক্ষত আছে। এত শতক পরেও আজকের পর্যটক ও গবেষকদের কাছে তা বিশেষ আগ্রহের বস্তু।[৫৪]

বায়বার্স আইন ই জালুতের যুদ্ধে মোঙ্গলদের পরাজিত করেন। এর ফলে সিরিয়া ও মিসর ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে সিরীয় ও মেসোপটেমীয় চিত্রকলার ধারা মিসরে অনুপ্রবেশ করে মোঙ্গল বিপর্যয়ের অব্যবহিত পরে। এর ফলে অবলুপ্ত প্রাচীন মেসোপটেমীয় চিত্ররীতি সিরিয়ায় পূর্ণমাত্রায় উৎকর্ষ সাধিত হয় এবং এর ঐতিহ্যের প্রভাব মিসরে অনুপ্রবেশ করলে মামলুক সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতা চৌদ্দ শতকের শেষার্ধ পর্যন্ত পান্ডুলিপি চিত্রায়িত হয়। অবশ্য একথা সত্য যে, মেসোপটেমীয় স্কুলের মতো মামলুক চিত্রাবলিতে রং ও রেখার যথেষ্ট উৎকর্ষ ছিল না। প্রতিকৃতিগুলো ছিল অনড় ও পুতুলের মতো নিস্পৃহ। কিন্তু উজ্জ্বল রঙের ব্যবহারে এর চিত্রাবলি *মাতিসের নক্‌শা পরিকল্পনা*কে স্মরণ করিয়ে দেয়। আল-জাজিরার অটমেটার চিত্রাবলি তের শতকের শেষার্ধে চিত্রিত হয়। তাছাড়া ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত হারিরীয় '*মাকামাত*' এর দুটি কপি ১২৩৭ খ্রিস্টাব্দে ও ১২৭১ খ্রিস্টাব্দে চিত্রায়িত হয়। ভিয়েনায় রক্ষিত ১৩৩২ খ্রিস্টাব্দে চিত্রিত মাকামাতের একাধিক পান্ডুলিপির চিত্রাবলি। এক কথায়, মামলুক স্কুলে অঙ্কিত মিনিয়েচারসমূহের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ।[৫৫]

---

[৫২] পি.কে.হিট্টি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৮৩।

[৫৩] ড. গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২১।

[৫৪] খন্দকার মাশহুদ-উল-হাছান,*প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১৪।

[৫৫] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৪।

কারুশিল্পে মামলুক কারিগরগণ অসামান্য কৃতিত্ব অর্জন করেন। মসজিদের উপকরণ হিসেবে ধাতব দ্রব্যাদি ব্যবহৃত হত। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ব্রোঞ্জের ঝাড়বাতি এবং নক্শাকৃত ব্রোঞ্জের নির্মিত দরজা। প্যারিসের লুভ্য মিউজিয়ামে রক্ষিত তথাকাথিত সেন্ট লুই-এর খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ বিষয়ে খোদিত তামার আরেকটি মামলুকদের রাজত্বে (১২৯০ খ্রিস্টাব্দ-১৩১০ খ্রিস্টাব্দ) মিসরে নির্মিত হয়। তাছাড়া নাসিরের আমলে ব্রোঞ্জের নির্মিত পাত্র ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। কেবল কাষ্ঠ খোদিত কুরশি, মিহরাবের মোসাইক, সোনা ও রত্নখচিত আল কুরআন পাঠের জন্য ব্যবহৃত রেহেল, মিম্বারে অতুলনীয় কাষ্ঠখোদাই মামলুক কারুশিল্পের জ্বলন্ত নিদর্শন বহন করে। মসজিদের দরজাগুলিতে দামেস্কের ধাতব শিল্পের ঐতিহ্য লক্ষ করা যায়। তাছাড়া মসজিদের বাতি এবং জানালার মোসাইকে মৃৎপাত্রের ব্যবহার রয়েছে। গ্রাফিয়াতো রীতিতে নির্মিত এবং কায়রো থেকে সংগৃহীত একটি আকর্ষণীয় মৃৎপাত্রে ব্যবহৃত নক্শাবলি নি:সন্দেহে মামলুক শিল্পকে স্মরণ করিয়ে দেয়।[৫৬]

ফলিত শিল্পের প্রায় সব শাখাই ছিল নির্মাণের সাথে যুক্ত। বিশেষ করে ধর্ম সংক্রান্ত নির্মাণ। এইসব শিল্প নিদর্শন আজও রয়েছে। যেমন ব্রোঞ্জের অসাধারণ নক্শা করা মসজিদ দুয়ার সুন্দর আরবীয় নক্শা করা ব্রোঞ্জের ঝাড়লণ্ঠন, আল-কুরআন রাখার জন্য সোনার উপর রত্নখচিত বাক্স। এছাড়া মসজিদের কুলুঙ্গিতে নানা বর্ণের কাঁচের নক্শা, মসজিদের প্রচারমঞ্চ ও প্রচারবেদীতে কাঠের সুক্ষ্ম নক্শা মামলুক যুগের শিল্প সমৃদ্ধিরই প্রকাশ। মসজিদের বিশাল দরজাগুলির অধিকাংশতেই ছিল দামেস্কের ধাতুর কাজ। মসজিদের বাতিদান এবং জানালা তৈরি হত রঙ্গ বাহারি কাঁচ দিয়ে। কাঁচের উপর ফুল-লতাপাতার নক্শা এবং আরবি লিপি খোদাই করা থাকত। মসজিদের ভেতরের দেওয়াল অলঙ্কণের জন্য ব্যবহৃত হত নক্শাদার উজ্জ্বল টালি। আল নাসিরের নগর দূর্গের (১৩১৮ খ্রিস্টাব্দ) মসজিদের তোরণে কাঁচ ও চিনেমাটির উপর নক্শা দেখা যায়।[৫৭]

স্থাপত্য শৈলীতে কাঁচ ও চিনেমাটির উজ্জ্বল নক্শা ছিল মামলুক যুগের প্রথম পর্বের স্থাপত্যের এক বৈশিষ্ট্য। পরবর্তী বুরুজি পর্বে রত্নখচিত নক্শার প্রচলন হয়। কায়রোতে মসজিদের দরজা বা প্রচারমঞ্চে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বহু বর্ণের কাঁচ জোড়া লাগিয়ে নক্শা, হাতির দাঁতের কাজ বা কলাই করা পাত্রের ব্যাপারে অবশ্য ইসলামি পর্বের আগে থেকেই মিসরে খ্রিস্টানদের আধিপত্য রয়েছে।[৫৮]

---

[৫৬] *তদেব*।

[৫৭] খন্দকার মাশহুদ-উল-হাছান,*প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১৪।

[৫৮] ড. গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২১।

কারুশিল্পের মধ্যে হস্তশিল্প শিল্প বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। দক্ষ লিপিকার অসীম ধৈর্য ও শৈল্পিক চাতুর্যের পরাকাষ্ঠ দেখিয়ে ধর্মীয় অনুভূতির প্রকাশ স্বরূপ পবিত্র আল কুরআন এর নকল করতেন। এ কারণে হস্তলিপি শিল্প মুসলিম শিল্পকলার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। শাহজাদা এবং শাসকবর্গ সুন্দর নাসখি রীতিতে মসৃণ পার্চমেন্টে আল কুরআন কপি করার জন্য দক্ষ শিল্পীদের অজস্র অর্থদান করতেন। মামলুক সুলতানের জন্য লিখিত এরূপ অসংখ্য আল-কুরআন এর বিরাট ও সুন্দর সংগ্রহ কায়রোর জাতীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। অটোমান তুর্কিদের দ্বারা মিসর ও সিরিয়া অধিকৃত হলে মামলুক শিল্পকলার অবনতি হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এই প্রতীয়মান হয় যে, মামলুক মিসরের যাত্রা শুরু হয় বিজয় গৌরবে গর্বীয়ান সুলতানদের হাত ধরে। মামলুকরা একদিকে যেমন সিরিয়ার বুক থেকে ফ্রাঙ্ক আধিপতের শেষ চিহ্নটুকু ও মুছে ফেলেছিল, তেমনই থামিয়ে দিতে পেরেছিল মোঙ্গলদের বিজয়রথও। সামরিক ও প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখে মামলুক মিসরে শুরু হয়েছিল বুদ্ধিবৃত্তিক ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের। এ সময় সুলতানদের প্রাসাদ ষড়যন্ত্র বা ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, পারস্পরিক অবিশ্বাস, ভ্রাতৃঘাতী দ্বন্দ্ব ও অন্তর্কলহ চরম সীমায় পৌঁছে যায়। যুদ্ধবিগ্রহে পরিপূর্ণ হলেও এসময়ও মুসলমানগণ তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ড চর্চার ক্ষেত্রে নতুন অধ্যায় সংযোজন করেন। বিশেষ করে চিকিৎসাবিজ্ঞানে মামলুক শাসকবর্গ বিশেষ নজর রেখেছিলেন। এসময় অত্যাধুনিক হাসপাতাল গড়ে উঠেছিল। চক্ষু চিকিৎসা, স্ত্রীরোগ চিকিৎসা, পশু চিকিৎসা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি দেখা যায় যা অন্য সময় পরিলক্ষিত হয়নি। এছাড়া ইতিহাস রচনায়, বিশ্বকোষ রচনায়, ধর্মশাস্ত্র, ভাষাতত্ত্ব, হাদিসশাস্ত্র রচনায়, জীবনী রচনায় ব্যাপক উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। এ সময় চমৎকার স্থাপত্য ও শিল্পকলার কীর্তির জন্য মামলুকরা বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। সংক্ষিপ্ত রাজত্বেও ঘোর অনিশ্চয়তার মধ্যে কীভাবে যে তাঁরা অধিক উৎকৃষ্ট অট্টালিকাদি নির্মান করে যান, তা বাস্তবিকই বিস্ময়ের বিষয়। মামলুকদের শিল্প বোধের পরিচয়ও ছিল রুচিসম্মত।

নবম অধ্যায়
উপসংহার

আট শতক থেকে তের শতক পর্যন্ত মুসলিম স্পেনে জ্ঞান বিজ্ঞানচর্চা, বুদ্ধিবৃত্তিক ও সৃজনশীল কর্মকান্ডের যে বিকাশ ঘটেছিল তা বর্তমান সময়ের সর্বোন্নত শিক্ষা প্রণালী অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিলনা। তৎকালিন সময়ে স্পেনকে ইউরোপের বাতিঘর হিসেবে আখ্যায়িত করা হত। মহানবীর (স.) নীতি, আদর্শ ও শিক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করে ক্রমান্বয়ে খুলাফায়ে রাশিদুন, উমাইয়া, আব্বাসিয়, স্পেনীয়-উমাইয়া, ফাতেমীয়, আয়্যুবিয়, মামলুক শাসনামল পর্যন্ত আরব জাতি জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে মৌলিক গবেষণা, বুদ্ধিবৃত্তিক ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের যে আলোকবর্তিকা প্রজ্জ্বলিত করেছিল তার তুলনা সমকালীন বিশ্বে ছিল না। পরবর্তীতে টলেডো হতে পিরেনীজের মধ্য দিয়ে ফ্রান্স, জার্মানি, মধ্য ইউরোপ এবং ইংল্যান্ডে এ জ্ঞানের আলোচ্ছটা ছড়িয়ে পড়ে।

মধ্যযুগীয় ইউরোপের বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাসে মুসলিম স্পেন একটি গৌরাবোজ্জ্বল অধ্যায় সংযোজন করে, যার প্রমাণ পাওয়া যায় শিক্ষা-দীক্ষা, বিভিন্ন ক্ষেত্রে গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, উদ্ভিদবিজ্ঞান, রসায়ন, ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, চারু ও কারুকলা, ভাষা ও সাহিত্য, সঙ্গীত, স্থাপত্য প্রভৃতিতে। মানসিক ও প্রাকৃতিক জগতে আরবদের সফলতা ছিল অভূতপূর্ব উন্নতমানের জীবন যাত্রা। মার্জিত রুচি সম্পন্ন পরিবেশ অপরিসীম মননশীলতা ও জ্ঞানার্জনের প্রতি অপরিসীম নিষ্ঠা স্পেনের আরব শাসকবর্গকে জ্ঞান সাধনার উচ্চমার্গে পৌঁছে দেয়।

মুসলিম স্পেনে কি ধরণের জ্ঞান চর্চা ও সাধনা হয়েছিল তার সামান্যতম খতিয়ান পাওয়া যাবে বিভিন্ন বিষয়ের উপর রচিত গ্রন্থাবলিতে। মুসলিম বুদ্ধিজীবীগণ তাদের প্রতিভার সাক্ষর রেখে গেছেন তাদের রচিত অসংখ্য গ্রন্থে। মুহাম্মদ (স:) এর মৃত্যুর পাঁচ শতক পর তার অনুসারীরা যে সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল তা তদানীন্তন ইউরোপ অপেক্ষা অধিক উৎকৃষ্ট ছিল। জ্ঞান চর্চা ও তার সম্প্রচারে স্পেনীয় মুসলমানদের অবদান ছিল অপরিসীম। মুদ্রণযন্ত্রের অভাবে মূল্যবান পাণ্ডুলিপি সমূহের অনুলিপি তৈরির সংস্থা ছিল এবং হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির সংখ্যা দেখে জ্ঞানচর্চা, গবেষণা, শিক্ষা দীক্ষার সম্প্রচার সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়।

আইবেরীয় উপদ্বীপের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োগে যে সমস্ত শিক্ষায়তন নিয়োজিত ছিল যা পরবর্তী কালে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয় তা আধুনিক যুগের মতো শ্রেণি বিভক্ত ছিল। ইউরোপে মধ্যযুগে গির্জা ও মঠ ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল। অপরদিকে মুসলিম স্পেনে আধুনিককালের মত স্কুল, কলেজ

ও জগৎবিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। কর্ডোভা, সেভিল, মালাগা ও গ্রানাডার মত সুবৃহৎ নগরীতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তরুণ ও প্রতিভাবান মুসলিম শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ করত এবং সেখানে সুকুমার বৃত্তি ও জ্ঞানার্জনের প্রকৃত পরিবেশ বিরাজ করত। এ সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে আল-কুরআন, শরিয়ত ও ধর্মতত্ত্ব ছাড়াও গ্রিক, হিব্রু, ল্যাটিন প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা, বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র, কবিতা, সঙ্গীত ও শিল্প বিদ্যা শিক্ষা দান করা হত। মুসলিম স্পেনের শিক্ষানীতি উদার ও নমনীয় ছিল। কোনো প্রকার ধর্মান্ধতা শিক্ষার পরিবেশকে কলুষিত করেনি। অথবা শিক্ষার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিলনা।

মুসলিম স্পেনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে খ্রিস্টান ও ইহুদি অধ্যাপকগণ নির্বিঘ্নে যোগ্যতা ও মেধার ভিত্তিতে অধ্যাপনা করতেন। কেবলমাত্র মুসলিম শিক্ষার্থীগণই জ্ঞানার্জন করতে পারত তা নয়, বিধর্মীদের কর্মকাণ্ডে মুসলিম স্পেনের অবদান ছিল অপরিসীম। ইউরোপে সে সময় গোসলকে পাপ বলা হতো। সে সময় মুসলিম স্পেনে ৩০০টি স্নানাগার ছিল। আবার যখন মুসলিম স্পেনে রাতে বাতি জ্বলতো, তারও ৭০০ বছর পরও লন্ডনের রাস্তায় বাতি দেখা যায়নি।

S. P. Scott বলেন, "আব্দুর রহমান (তৃতীয়) ব্যতিত পশ্চিমে উমাইয়া বংশের অস্তিত্ব বিঘ্নিত হত এবং উক্ত বংশের শাসনামল ব্যতিরেকে প্রাচীন (গ্রিক) জগতের জ্ঞান ভাণ্ডার সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হত। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার স্পৃহা ধর্মীয় কুসংস্কার ও অনুদার মনোভাবে ধুলিসাৎ হয়ে যেত। এর ফলে, ইউরোপের বুদ্ধিবৃত্তির স্বাধীনতা ও সভ্যতার আশা চিরতরে বিলুপ্ত থাকত এবং বহু শতক পর্যন্ত পশ্চাৎ পদ হয়ে থাকতো।"[১] ("Without Abdur Rahmans the Ommyad Dynasty of the west would never have existed; treasures of ancient learning would have been forever lost; the spirit of scientific inquiry would have been crushed by the ecclesiastic intoferanec , the hopes of intellectual freedom suppressed and the civilization of Europe retarded for many centuries.")

মধ্যযুগে মূরগণ যে জ্ঞান সাধনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে তা সকল ইউরোপীয় ঐতিহাসিক স্বীকার করেছেন। সে সময় খ্রিষ্টান জগত অন্ধকারাচ্ছন্ন, বাকবিতন্ডা পূর্ণ ধর্মতত্ত্ব ও অসার আধ্যাত্মবিদ্যা ব্যতিত সর্বাধিক জ্ঞান লোকের হৃদয় থেকে নির্বাসিত, দিনেমার ও নর্মাণ আক্রমণে ইংল্যান্ড ব্যতিব্যস্ত, সন্ন্যাসীরা রাজ-সম্মান ও রাজ ক্ষমতার বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামে রত, শার্লিমেনের নিষ্ঠুর ও ব্যাপক

১ Samuel Parsons Scott, *History of the Moorish Empire in Europe*, Vol.I (Philadelphia and London: J.B. Lippincott Co., 1904).

নির্বাসনে জার্মানির প্রদেশসমূহ বিধ্বস্ত, রোমের লোকেরা নারী পোপের কলঙ্ক কাহিনী নিয়ে আমোদে মত্ত; খ্রিষ্টান ধর্মযাজকেরা চির কৌমার্যের মহিমা ও মূর্তির পবিত্রতা বর্ণনায় ব্যাপৃত।

বলাই বাহুল্য যে, মধ্যযুগীয় ইউরোপের বুদ্ধিবৃত্তির ইতিহাসে মুসলিম স্পেন একটি গৌরবোজ্জল অধ্যায় সংযোজন করে, যার প্রমাণ পাওয়া যায় শিক্ষা দীক্ষা, বিভিন্ন ক্ষেত্রে গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, রসায়ন, ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, চারু ও কারুকলা। ভাষা ও সাহিত্য, সঙ্গীত প্রভৃতিতে।

এই স্পেনের মাধ্যমেই ইউরোপে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে পড়ে। ফলে সেখানে রেনেসাঁ বা নবজাগরণের সূচনা করতে সাহায্য করে। রেনেসাঁ যুগের পূর্ব পর্যন্ত খ্রিস্টান পণ্ডিতদের মানসিক বিকাশের জন্য স্পেন ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। আট শতকের মধ্যভাগ থেকে পনের শতক পর্যন্ত মুসলিম স্পেনই ছিল সমগ্র বিশ্বের জ্ঞান বিজ্ঞানের মশালবাহী সৈনিক। খ্রিস্টান প্রতীচ্য মুসলিম বিজ্ঞানকে শুধু গ্রহনই করেনি, বরং এর প্রসারতা ও উৎকর্ষতায় অবদান ফাতেমীয়গণ মিসরের সংস্কৃতি চর্চা, স্থাপত্য বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, আলোকবিদ্যা ও শিল্পকলা প্রভৃতি শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। এ রাজ্যের উদ্ভব হয় প্রচারনার ফলে এবং সুন্নি খিলাফতের প্রতি চরম বিরোধিতার ফলে।

স্পেনের ন্যায় মুসলমানদের মিসরের ফাতেমীয়, আয়্যুবিয় ও মামলুক আমলেও তথায় মুসলিম শাসকদের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান মনীষীদের জ্ঞান বিজ্ঞান, সুকুমার শিল্পী সাহিত্য ও বৌদ্ধিক কর্মকাণ্ডে অবদান রাখেন। ফাতেমীয় শাসনামলে খলিফাগণ খিলাফত নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও খলিফা আল মুঈজ, খলিফা আল আযিয ও খলিফা হাকাম এর সময় জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতা লাভ করে। খলিফা আল হাকিমের সময়েই বায়তুল হিকমার ন্যায় দারুল হিকমা প্রতিষ্ঠিত হয় যা ফাতেমীয় আমলের বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ড বিকাশের প্রধান কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। আয়্যুবিয় শাসনামল ধর্মযুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও ভূ-পতি নূর আল দীন এবং সালাহ্উদ্দিনের শাসনামলে মিসরে মুসলমানদের বৃদ্ধিবৃত্তিক কর্মকান্ডের যথেষ্ট বিকাশ লাভ করে। এ সময় চিকিৎসাবিজ্ঞান, দর্শনশাস্ত্র, সাহিত্য, সঙ্গীত ও স্থাপত্যবিদ্যার যথেষ্ট উৎকর্ষতা দেখা যায়।

ধর্মযুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ মিসরে মামলুক শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় অসংখ্য মনীষী ও জ্ঞান তাপস তাঁদের নিরলস সাধনা ও গভীর অনুসন্ধিৎসার মাধ্যমে বিজ্ঞান, সুকুমার শিল্প ও সৃজনশীল সাহত্যের বিভিন্ন শাখায় যে কীর্তি রেখে গেছেন তা পরবর্তী কালে আধুনিক বিশ্বের পণ্ডিত বর্গের গবেষণায় প্রচুর তথ্য ও উপাত্ত যুগিয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি

আরবি উৎস

ইব্‌ন আল ফারদী, আল-হাফিয আবূ আল-ওয়ালীদ	:	তারিখ-*আল-উমামা-ওয়া-আল রুয়াহা লি আল ইলম বি আল-আন্দালুস*, ১ম খন্ড, কায়রো : আল সায়্যিদ ইযমাত আল আত্তার, ১৯৫৪।
আল হুমায়দী , আবূ-আবদ আল্লাহ মুহম্মদ	:	*জাযওয়াহ আল মুকতাবিস*, সম্পাদিত, ড. মাহমুদ মক্কী বৈরুত।
আল রিকাবী , ড. জওদাত	:	*ফী-আল-আদব আল-আন্দালুসী*, কায়রো : দার আল - মা'আরিফ, ১৯৭৫।
আল-আন্দালুনী , সাউদ	:	*তাবাকাত আল-উমাম, বৈরুত : আল-মাতবা'আহ আলকাছুলিয়্যাহ*, ১৯১২।
আল্লামা মাক্কারী	:	*নাফহু আল তীব*, ৪র্থ খন্ড, সম্পাদিত মুহাঃ মুহয়ী আল-দ্বীন আব্দ আল হাযীম, মিসর : মাতবাআহ আল সা'আদাহ, ১৯৪৯।

ইংরেজি উৎস

Papadopoulo, Alexandre	:	*Islam and Muslim Art*, New York: Harry N Abrams Inc, 1994.
Ali, Syeed Ameer	:	*A Short History of the Saracens*, London: Macmillion & Co. Ltd., 1961.
Pope, Arthur Uphan	:	*Persian Architecture*, New York: Oxford University Press, 1969.
Rice, D.T.	:	*Islamic Art*, New York: Thames and Hudson, 1965.
Herzfeld, E.	:	*Encyclopedia of Islam*, Vol.I, Netherlands: Leiden University Press, 1960.
Hole, E.	:	*Andalus : Spain Under the Muslims*, London: 1958.
Gibbon, Edward	:	*Decline and Fall of the Roman Empire*, Vol.VII, London: Strahan and Cadell, 1776.
Geates, Jean Key	:	*Introduction to Librarianship*, New York : Neal schuman publication, 1976.
Draper, John William	:	*Intellectual Development in Europe*, Vol. II, London: G. Bell and Son,1910.
Hartpole, Lecky William Edward	:	*History of European Morals*, New York: D. Appleton and Co., 1955.
Bertrand, Louis	:	*The History of Spain*, London: Eyre and Spottis woode, 1956.
Briggs, Martin Shaw	:	*The Legacy of Islam*, Germany: Leipzig University Press, 1913.

O' Leary, De Lacy : *A Short History of the Fatimid Caliphat,* London: Trubner & Co., Ltd., 1923.

Oliver J. Thatcher and schwill F. : *General History of Europe,* Vol.I, New York: John Murray, 1912.

Mamour, P.H. *Politics On the Origins of the Fatimid Caliphs,* London: Luzac & Co., Ltd., 1896.

Hitti, P.K. : *History of the Arabs*, London: Macmillan and Co. Ltd., 1970.

Bamborough, Philip : *Treasures of Islam,* London: Bland ford, 1976.

Myers, Philip Van ness : *Medival and Modern History,* Boston: Ginnand Co., 1902.

Dozy, R., : *Spanish Islam: A History of the Moslems in Spain,* Trans. Francis Griffin Stokes), (London: Chatto and Windless, 1919.

Fhoy, R.A. Jairaz : *Oriental influences in western Art,* New York: Asia Publising House, 1965.

Nicholson, R.A. : *Literary History of the Arabs,* London: T.Fisher Unwin, 1914.

Imamuddin, S.M. : *A Political History of Muslim Spain,* Dacca: Najmah Sons, 1969.

——— : *Some Aspeects of Socio-Economic and Cultural History of Muslim Spain (711-1492),* London: 1965.

——— : *The Influence of Spanish Muslim civilization in Europe in Islamic Literature,* London: 1956.

Scott, Samuel Parsons : *History of the Moorish Empire in Europe*, Vol. I, Philadelphia and London: J.B. Lippincott Co., 1904.

Lanepoole, Stanely : *A history of Egypt in the Middle Ages*, Now York: Charsles scribners's snons, 1901.

——— : *The Moors in Spain*, London: United Limited, 1912.

Thomson, James westfall (ed.) : *The medieval library,* New York : Hafner Publishing co., 1957.

Ivanhow, W. : *Rise of the Fatimids*, London: Oxford University Press, 1942.

Muir, W. : *Mamluk or Slave Dynesty of Egypt* (1260-1517), London: Smith, Elder& Co., 1934.

বাংলা উৎস

হালিম, মো: আব্দুল : *মুসলিম : চেতনা ও প্রবাহ*, ঢাকা : দিব্য প্রকাশ, ২০০২।

হোসেন, মো: শাওকত : *ইমাম গাযাল ও ইবনে রুশদ এর দর্শন*, ঢাকা : তিথি পাবলিকেশন্স : ২০০৬।

কবীর, ড. মফীজুল্লাহ : *ইসলাম ও খিলাফত*, ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ২০০১।

রহীম , মাওলানা মুহম্মদ আব্দুর : *ইসলামের ইতিহাস দর্শন*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন , ২০০৩ ।

ইবনে খালদুন : *আল-মুকাদ্দামা*, ১ম খন্ড, বাংলা অনুবাদ গোলাম সামদানী কোরায়শী, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮২।

আলী, এম . আকবর : *বিজ্ঞানে মুসলমাদের অবদান*, ১২শ খন্ড, ঢাকা : মালিক লাইব্রেরী , ১ম প্রকাশ, ১৯৯৪।

আলী, মোহাম্মদ সা'দাত : *মধ্যযুগের লাইব্রেরী মুসলিমদের অবদান*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ডিসেম্বর, ১৯৯০।

কাদের, ড. এম.আব্দুল, ও হাসান, ড. সৈয়দ মাহমুদুল : *উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনের মুসলমানদের ইতিহাস*, ঢাকা : জাহানারা বুক হাউস, ১৯৯৭।

আহমদ, অধ্যাপক নাজির ও আমিন, মুহম্মদ রুহুল : *মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস*, ঢাকা : আরাফাত পাবলিকেশন্স, ১৯৯২।

রহমান, এ. এইচ. এম. শামসুর : *স্পেনে মুসলমানদের ইতিহাস*, ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৮৬।

ইসলাম, সরকার শরীফুল : *মুসলিম স্পেন*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৭।

আহমেদ, আশরাফ উদ্দিন : *মধ্যযুগের মুসলিম ইতিহাস* (১২৫৮-১৮০০), ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৬।

খান, মো. আলী আসগর ও রহমান, শেখ মুহম্মদ লুৎফর : *মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস* (১২৫৮-১৯১৪ খ্রি.), ঢাকা : সুমন প্রকাশনী, ৫ম সংস্করণ, ১৯৮০।

রহমান, শেখ মুহম্মদ লুৎফর : *আরব জাতির ইতিহাস*, ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, ৩য় সংস্করণ, ১৯৭৬।

ভূঁইয়া, ড. গোলাম কিবরিয়া : *উত্তর আফ্রিকা ও মিসরে মুসলিম শাসনের ইতিহাস*, ঢাকা: খান ব্রার্দাস, ২০০৬।

খাঁ, প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম : *আরব জাতির ইতিকথা*, ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশক, ২০১০।

ডোযী, রেইন হার্ট (বাংলা অনুবাদ-আব্দুর রাকিব) : *স্পেনের মুসলিম ইতিহাস*, কলকাতা : মল্লিক ব্রার্দাস, ২০০২।

আলী , অধ্যাপক কে : *মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস*, ঢাকা : আলী পাবলিকেশন, ১৯৭৫।

হাসান, ড. সৈয়দ মাহমুদুল : *স্পেন ও উত্তর আফ্রিকায় মুসলিম শাসনের ইতিহাস*, ঢাকা :

উত্তরণ, ২০০৫।

রহমান, মাহবুবুর : *স্পেনে মুসলমানদের ইতিহাস*, ঢাকা : চয়নিকা প্রকাশনা, ২০১২।

________ : *উত্তর আফ্রিকা ও মিসরের মুসলিম শাসনের ইতিহাস*, ঢাকা : এশিয়া পাবলিকেশন্স, ২০১১।

আলী, মুজাফফর : *বিশ্ব সভ্যতায় মুসলিমদের দান*, ঢাকাঃ মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ১৯৫৫।

তাহের, মোঃ আবু : *স্পেনে ইসলাম ও মুসলমানদের অবদান*, ঢাকা:২০০৮।

ইসলাম, আমিনুল : *মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি*, ঢাকাঃ মাওলা ব্রার্দাস,১৯৯১।

যোশেফ হেল, (অনূদিতঃ মোজাম্মেল হক) : *আরব সভ্যতা*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, বর্ধমান হাউস, চৈত্র, ১৩৭৫।

কুহনেল, আর্নেস্ট : *ইসলামী শিল্পকলা ও স্থাপত্য*, মূলঃ *Islamic Art and Architecture*, By E. Kuhnel, (New York: Cornell University Press, 1967), বঙ্গানুবাদঃ বুলবন উসমান, চট্টগ্রাম, ১৯৭৮।

আলী, সৈয়দ আমীর, (অনুঃ শেখ রেয়াজউদ্দিন আহম্মদ) : *আরব জাতির ইতিহাস*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, বর্ধমান হাউস, ১৯১০।

বাংলা পত্রিকা

ফাখরুদ্দিন, এ.টি.এম ও কাদির, মো. আব্দুল : "*ভূগোলবিদ্যায় মুসলিম অবদান*", ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ১৯৯৭।